বাংলাদেশের
কারাব্যবস্থা
মোঃ খোসবর আলী

বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা

একটি তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ

মোঃ খোসবর আলী

বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা
একটি তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ

প্রকাশ কাল-
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন- ২০০১

প্রকাশনায়-
স্বাগতম নস্কার
রাজশাহী।

বর্ণ বিন্যাস
বেসিক কম্পিউটার সিস্‌টেম
ও
মাইক্রোটেক সিস্টেম, রাজশাহী

মুদ্রণে-
স্বাগতম অফসেট প্রসেস এন্ড প্রিন্টিং,
১৬ নং হকার্স মার্কেট,রাজশাহী-৬১০০।

প্রচ্ছদ
মোঃ আজিজুল আনাম
রাজশাহী।

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র

Prison System in Bangladesh
An Analysis of Reality
By
Mohammad Khoshbor Ali
First Edition- June, 2001
Price Tk.100.00

উৎসর্গ
আমার মমতাময়ী
মা'কে

মুখবন্ধ
(Preface)

সভ্য দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রেই কারাগার নামক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে, সুদূর অতীতে প্রধানতঃ প্রতিপক্ষ বা যুদ্ধ বন্দিদের আটক রেখে তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য কারাগারের উন্মেষ ঘটে বলে ধারণা করা যায়। মহাকালের পরিক্রমায় সময়ের চাকা যত বেশী সামনের দিকে এগিয়েছে; ততো বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। তাই আমরা যুগে যুগে দেখতে পাই প্রদত্ত শাস্তির রূপান্তর, তবে সে সময়ের শাস্তির প্রকৃতি ছিল বর্বর, নৃশংস ও প্রতিশোধমূলক।

অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর মোঘলদের রেখে যাওয়া কারাগারসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে এবং পর্যায়ক্রমে জেলা ও মহকুমা সদরে নতুন কারাগার নির্মাণের কাজ শুর করে। এরপর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে শাসনের প্রকৃতি অনুযায়ী তৎকালীন অপরাধ দমন এবং ইংরেজ বিরোধী ভারতীয়দের আটক রেখে শাস্তি প্রদানের মনোভাব নিয়ে কারাগারের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নিজ স্থান দখল করে নেয়। পরাধীনতার শিকলমুক্ত হয়ে ভৌগলিক সীমারেখা পাল্টালেও সুদীর্ঘ ৩০ বছরে বাংলাদেশের কারাগারের নিয়ম-নীতি পাল্টায়নি। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত বিধি-বিধান বর্তমানেও প্রয়োগের কারণে কারাব্যবস্থার সবক্ষেত্রেই শাস্তির নির্দয়তা ও কাঠোরতা কমেনি। প্রায় দুই যুগ কাল সম্পৃক্ত থেকেও কারাবিভাগে প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান ক্ষণিকের জন্যও মানসিকভাবে মেনে নিতে পারিনি। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি প্রচলিত কারাব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন দাবী করে। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বাংলাদেশের কারাগারে মানুষের প্রতি মানুষের যে নির্দয় ও নির্যাতনমূলক আচরণ করা হয়; তা আমাকে সার্বক্ষণিক পীড়া দেয়। বর্তমান যুগের চাহিদা ও আধুনিক ধ্যান-ধারণায় কারাব্যবস্থার নিগ্রহমূলক বলয় থেকে উত্তরণের উপায় বের করার মানসিক তাগিদে এ গবেষণা কর্মের সূচনা। এ বিষয়ে আমি সফল হয়েছি কিনা সে বিচার করবেন পাঠক।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয়দের বিভিন্নভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার মানসে প্রণীত আইন-কানুন এখনো বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় প্রয়োগের কারণে কারাবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারগণ ঐ আইন দ্বারা সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। ফলে ঐ আইনের প্রভাব তাদের ওপর প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে কারাকর্তৃপক্ষ ও কারাবন্দিদের মধ্যে প্রভু ও দাস সুলভ মনোভাব আজও বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে কারাবন্দি কর্তৃক হাঁটুগেড়ে বসে কুর্নিশ করা, চুন থেকে পান খসলেই অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ, কারা অপরাধের দমনমূলক নীতিতে বিচার, শারীরিক নির্যাতন, দাস সুলভ নীতিতে বেগার খাটুনি, সব ধরনের বন্দিদের একই পরিবেশে রাখা, সব ক্ষেত্রেই মানবিক আবেদন অগ্রাহ্য, মধ্যযুগীয় কায়দায় বন্দিদের পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো ইত্যাদি এখনো বাংলাদেশের কারাগারে আইনগতভাবে প্রচলিত আছে। এছাড়াও বন্দিদের খাদ্য সরবরাহে অনিয়ম, আবাসিক সমস্যা প্রকট, চিকিৎসা সংকট, দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব, নিম্নকর্মচারীদের প্রতি নির্যাতন ও জুলুম এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। আমাদের দেশের কারাগারগুলোকে নিতান্তই মানুষ আটক রাখার খোয়াড় ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। কারাগারের পরিবেশ অসুস্থ হলে এবং বন্দিরা কারা-অভ্যন্তরে নির্যাতিত হতে থাকলে পূর্বের চেয়ে আরও বড় ধরনের অপরাধ প্রবণ মানসিকতা নিয়ে তারা কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের কারাব্যবস্থাকে শাস্তিদানের পদ্ধতি থেকে সংশোধন পদ্ধতির আলোকে আধুনিকায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

সামাজিক বিবর্তন, যুগের চাহিদা ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের কারাব্যবস্থাকে শাস্তিদানের পদ্ধতি থেকে সংশোধন পদ্ধতির আলোকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে প্রধান ১৭টি সমস্যা চিহ্নিত করে গবেষণা চালানো হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ ও গৌণ উৎসসমূহ (Primary and secondary Sources) দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই ও পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের কারাব্যবস্থার সার্বিক সমস্যা নিরসন কল্পে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক কঠিন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি অনেক সময় চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন বেশে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। দেখা গেছে

অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সত্য ঘটনা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিংবা ঐ ঘটনাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। আবার অনেক সময় বন্দিরা শারীরিক নির্যাতন ও কর্মচারীরা চাকরী যাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে সাহসী হয়ে উঠেনি। এ ছাড়াও আমাদের দেশে যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কারাগার/মানবাধিকারের উপর কাজ করে; তাদের মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চেয়ে লিখার পরও অনেকের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

বাংলাদেশের কারা-ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ম কানুন, আচার-ব্যবহার সবই বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে কারাগারে আটক রাখলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। শাস্তি সর্বস্ব কারা-আইন বলবৎ থাকায় অপরাধীরা সংশোধিত না হয়ে ঘাঘু অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। এদের সংস্পর্শে যারা অবস্থান করছে, তাদের উপরও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ছে। ফলে সমাজে সহিংসতা, অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রচলিত কারা-আইনে ন্যূনতম মানবাধিকারের সুযোগ রাখা হয়নি। প্রতি বছর কারাবিভাগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও অমানবিক ও নিপীড়নমূলক কারাবিধি তথা কারাব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ অপরাধী তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়েছে।

কারাগার সম্পর্কে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের অপরাধ প্রবণতার প্রতিকূল প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ভারসাম্যহীনতা প্রতিরোধের জন্য কারাগারের ভূমিকা অপরিসীম এবং সার্বজনীন। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেই ''দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'' এ মূলনীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। দুষ্টের দমনের প্রয়োজনে কারাগার শুধুমাত্র আটক রাখার প্রতিষ্ঠান নয় বরং কারাবাসকালে দুষ্টের নিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চায় চারিত্রিক সংশোধন করে তাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও কারা-প্রশাসনের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের কারাগার এর ব্যতিক্রম। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মানবাধিকারের প্রশ্নে আজকের পৃথিবী অত্যন্ত সোচ্চার। সে দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারাগার এখন আর শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কারাগার তথা কারাকর্তৃপক্ষের মৌলিক দায়িত্ব হলো, মানবাধিকার লংঘন না করে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ বন্দিদের হেফাজতে রাখা এবং অপরাধীদের আইন মান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো।

আমাদের দেশের কারাব্যবস্থায় এখনো আধুনিকতার ছাপ পড়েনি। আমরা চাই অপরাধমুক্ত পরিচ্ছন্ন সমাজ। অপরাধীরা সু-নাগরিক হিসেবে সমাজে ফিরে আসুক এটাই আমাদের কাম্য। দমননীতি বা অমানবিক পন্থায় কারাগার পরিচালনা করায় পৃথিবীর কোন দেশেই সুফল পাওয়া যায়নি। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দমননীতির স্থলে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি অত্যধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের প্রকৃতি ও ধরন পাল্টে গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত কারাবিধির আওতায় অপরাধীর কারাবাস জীবনে তার অপরাধ প্রবণতাকে সংশোধন এবং অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ নিপীড়নমূলক সেকেলে আইনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। বন্দিরাও আমাদের মত সমাজের মানুষ। "মানবাধিকার লংঘনের সবচেয়ে দুর্বিষহ চিত্র দেখা যায় কারাগারগুলোতে।"[১] বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার ৩য় অনুচ্ছেদে সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার অঙ্গিকার করা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের (৫) উপ-অনুচ্ছেদে কারাবন্দিদের মানবাধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া কিংবা অনুরূপ কোন আচরণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। কারাবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শনের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও শাস্তি সর্বস্ব অমানবিক কারা-আইন বলবৎ থাকায় অপরাধীরা সংশোধিত না হয়ে বরং পরিপক্ক অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে।

---

[১]. **Training Guide, Good prison Management for prison personnel of Bangladesh, 2000, P-72.**

মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের কারাগারে আটক অতিরিক্ত বন্দি-চাপ কমানোর লক্ষ্যে বিচারাধীন স্তূপীকৃত মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তিসহ কারাগারের বিকল্প পন্থা অবলম্বনের কথা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও দু'শতাধিক বছরের পুরানো, বুড়ো কারাবিধি ও কারা প্রশাসনের সংস্কার করতঃ যোগ্য ও দক্ষ লোকবলের মাধ্যমে পরিচালিত কারাব্যবস্থায় বিপথগামী মানব সন্তানদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধন করে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। এর পাশাপাশি বন্দি শ্রমের সদ্ব্যবহার করে কারাব্যবস্থাকে "সরকারের মাথা ভারী লোকসানী প্রতিষ্ঠান" থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের কারা-প্রশাসন সম্পর্কে মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা বর্জন করে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় কারাগারগুলোকে সংস্কারধর্মী ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করতঃ পুরাতন বিধির সংশোধন করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বর্তমান কারাব্যবস্থা অমানবিক ও নিপীড়নমূলক বলে মনে করা হয়। এ প্রচলিত ধারণার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি সমাজের অন্যদের কাছে অনেকটা অজানা। তাই আলোচিত গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে কারাগারের বিগত দিনের যৎসামান্য রেখাপাত, বর্তমান অবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষীণ আলোকপাত এবং বিভিন্ন বাস্তব তথ্যের সন্নিবেশ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বর্তমান কারাপরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষ অবহিত হবে এবং আশা কারা যায় কারাপরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যদিও এ বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নির্ধারক। তবুও বাংলাদেশের কারাব্যবস্থার সমস্যা সমাধান, উন্নয়ন ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি সামান্য কোন অবদান রাখতে পারলে, আমি আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করব।

আমাদের দেশে স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত কারাগার সংক্রান্ত মানসম্মত রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। তবুও আগ্রহী ও কৌতূহলী পাঠকের সংখ্যা কম নয়। কাজেই বাংলা ভাষায় এ ধরনের বইয়ের অভাব পূরণে "বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা" গ্রন্থটি কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সেই ১৯৭৬ সনের কথা। তৎকালীন ডেপুটি জেলার সৈয়দ রফিকুল আলমের সহযোগিতায় কারাবিভাগে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ ঘটেছিল। ঐ সুবাদে দীর্ঘ ২৩ বছর কারাবিভাগের শিরায়, উপ-শিরায় বিচরণ করে নাড়ি-নক্ষত্র জানার সুযোগ হয়েছে। তাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণা কর্মে বহির্বিশ্বের নিম্ন বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছে উৎসাহ এবং তথ্যগত সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে হয়তো আমার এ গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখতে পেত না।

- Council of Europe, Legal Affaires, Division of Crime Problems, France.
- National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), USA.
- Ms Roslyn West, Secretary General, LAWASIA, Australia.
- Human Rights Standing Committee, Philippines.
- Professor Peter Burns QC, President, The Society for The Reform of Criminal Law, British Columbia, Canada.
- The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Sentencing and Corrections Program, British Columbia, Canada.
- Correctional Service of Canada, Canada.
- Bureau of Jail Management and Penology, Philippines.

পাণ্ডুলিপি রচনাকালে আমার ছোট ভাই মোঃ আবুল কালাম ও জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমানের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়েছি। পক্ষান্তরে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। এঁদের সঙ্গে গ্রন্থটির পরিকল্পনা, বিষয় বিন্যাস ও বিভিন্ন আঙ্গিকে আমার দীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছে। আলোচনাকালে তাঁদের

মূল্যবান মতামত ও পরামর্শতে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। এজন্য আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থের প্রথম খসড়াটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সবাই বইটির উন্নতির জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়াও মোঃ আরিফ উদ্দীন (মোহন), মোঃ হামিদুল হক মিয়া (লিটন), জনাব আমিরুল ইসলাম নূরউজ্জামান সাহেব, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব, আমার এক সময়ের সহকর্মী মোঃ রেজাউল হক (বুলু), মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মিলন, ঠাকুরগাঁও জেলার আর,ডি,আর,এস-এর লাইব্রেরীয়ান, ঠাকুরগাঁও-এর মহসীনুল হক, আমার বন্ধুবর রাজশাহীস্থ WATSAN Partnership Project-I.D.E অফিসের সহকারী ম্যানেজার জনাব মোঃ রেজাউল হক, কারাঅধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কারাগারের স্টাফ এবং আরো অনেকের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের আন্তরিকতার কাছে আমি ঋণি। এ গবেষণা কর্ম পরিচালনার কাজে যাঁরা উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। এ গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থ রচনার ব্যাপরে আমার স্ত্রী মোছাঃ মমতাজ বেগম সব সময় ছায়ার মত আমার পাশে পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। তার সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হত না। তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র।

ঢাকাস্থ ডি,এস,এল-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব অচিন্ত দাস গুপ্ত এবং জি,কে,টি-এর Marketing Executive জনাব আনছারুল হক পলাশ গ্রন্থটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। বেসিক কম্পিউটারের মোঃ ঈমান-উল-হক (ইমন) ও মোঃ আনিসুজ্জামান (সান্টু) অত্যধিক পরিশ্রম করে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করেছেন। তাঁদের ঋণ স্বীকার করতে চাই।

কোন গ্রন্থই সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভুল নয়। এ গ্রন্থটি তার ব্যতিক্রম বলেও আমি মনে করি না। এই গ্রন্থটি রচনার কাজ হাতে নেয়া আমার প্রথম প্রয়াস। কাজেই এতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আগামীতে গ্রন্থটির মান উন্নয়ন কল্পে যে কোন পাঠকের পরামর্শ, সুচিন্তিত মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করি।

মোঃ খোসবর আলী

নতুন বিলসিমলা
বাসা নং-৩৮৬/এ
(লোন পট্টির উত্তর পার্শ্বে)
রাজশাহী - ৬০০০।
জুন,২০০১খ্রি:
মোবাইল # ০১৭১১-৩১৮৫৭৪

সচিপত্র

(**Table of Contents**)

৩.২ কারাগারের শ্রেণী বিভাগ

৩.৩ বাংলাদেশের কারাপ্রশাসন

৩.৪ প্রশিক্ষণ

অধ্যায়-৪ঃ মৌলিক বিষয়

৪.১ বন্দিদের খাদ্য

৪.২ কারাবন্দিদের পোশাক পরিচ্ছদ

৪.৩ কারাগারের আবাসিক অবস্থা

৪.৪ বন্দিদের চিকিৎসা

৪.৫ বন্দিদের শিক্ষা

অধ্যায়-৫ ঃ বন্দিদের সংশোধন পদ্ধতি ও ভোকেশনাল ট্রেনিং

৫.১. কারাশিল্প ও বন্দি শ্রম

৫.২. বন্দিমুক্তি ও তাদের পুনর্বাসন

অধ্যায়-৬ ঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক বন্দি

৬. কিশোর বন্দি

অধ্যায়-৭ ঃ বন্দিদের মানবিক অধিকার

৭.১. বন্দিদের দেখা-সাক্ষাৎ

৭.২ বন্দি অধিকার

অধ্যায়-৮ ঃ কারা বিদ্রোহ

৮. কারা বিদ্রোহ

পরিশিষ্টসমূহ ঃ-

গ্রন্থপঞ্জি ঃ-

সারণীসূচী
(Tables)

অধ্যায়-১ঃ পটভূমিকা

১. কারাগারের বিবর্তন
(PRISON EVOLUTION)

১.১ প্রাসঙ্গিক কথা

আদিমকালে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব কখন ঘটেছিল বিজ্ঞানীগণ সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তবে এখন থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর পর্বে ইউরোপে উদ্ভব ঘটে নিয়ানডারথাল (Neanderthal) মানুষের। ফ্রান্সের মেনটর-এর কাছে একটি প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহায় এসব মানুষের দেহাবশেষ ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। এরও হাজার হাজার বছর পর আবির্ভূত হয় ক্রোম্যাগনন (Cro-Magnon) মানুষ। নৃবিজ্ঞানীগণ ক্রোম্যাগননদের অভিহিত করেছেন Homo-Sapiens বা বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে। ক্রোম্যাগননরা নিজেদের আচরণের সাথে অন্যের আচরণের অসংগতি বা পার্থক্য নিরূপণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ যে কোন পরস্থিতিতে সেইসব মানুষ নিজের আচরণ বা অন্যের সম্ভাব্য আচরণের প্রেক্ষিতে কিরূপ আচরণ করা উচিত তা নির্ণয় করতে শিখে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানুষ আদিম বন্য জীবনধারাকে পেছনে ফেলে ক্রমান্বয়ে সভ্যতার সোপান বেয়ে অগ্রসর হয়েছে। ক্রমশঃ তারা আবিষ্কার করেছে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, গড়ে তুলেছে সুশৃংখল সামাজিক জীবন, সৃষ্টি হয়েছে সম্পত্তির ধারণা, পরিবার ব্যবস্থা ও সমাজ জীবন নির্বাহের জন্য নানা সংগঠন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান সামাজিক বিধি-বিধান, অবশ্য পালনীয় আচরণ প্রণালী, হাজারো রীতি-নীতি,নিয়ম-কানুন প্রভৃতি। মানুষের মাঝে এক পর্যায়ে আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মবোধ স্পষ্টতও রূপ লাভ করে। সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজনে মানুষ প্রণয়ন করেছে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও নীতি শাস্ত্র। সে সময় হতেই কতক আচরণের নাম দেয়া হলো-অন্যায়,পাপ বা অপরাধ।[১] কিন্তু এই আচরণ বিধিগুলো তখন কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভিত্তিক প্রচলন হয়েছিল। সার্বজনীন বা নিরপেক্ষভাবে আচরণ বিধিগুলো তখনও রচিত হয়নি। এর মধ্যদিয়েই অস্থায়ী বা আধাস্থায়ী গোষ্ঠী জীবন থেকে উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্রীয় জীবনধারা। রাষ্ট্র তথা শাসক শ্রেণী সমাজে প্রচলিত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও লৌকিক আইন-কানুনকে সুসংগঠিত করে প্রদান করেছে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রাষ্ট্রীয় রূপ। প্রণীত হয়েছে বিধিবদ্ধ আইন-কানুন। মূলতঃ অপরাধের প্রশ্ন আসে আইনের উদ্ভব হওয়ার পর। আর আইন আসে সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কারসমূহ ও ধর্মীয় বিধি-বিধান একত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

সেই আদিমকালে কোন মানুষ অন্য মানুষের দ্বারা ক্ষতিগস্ত হলে প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মানুষ অরাজক ও নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করত। সে সময় কোন মানুষ অন্য মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে নিজেই নিজ ক্ষমতাবলে লড়াই করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করত। সে নিজে না পারলে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় প্রতিশোধ গ্রহণ করত। এতেও সম্ভব না হলে সে নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর লোকদের সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করত। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল একমাত্র প্রতিকারের উপায়। প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা বিচার করার ব্যবস্থা আদিমকাল হতে চলে আসছে।[২]

আদিম সমাজে প্রত্যেক পরিবার বা গোত্র বা গোষ্ঠীর সদস্যগণ প্রয়োজন বোধে পরস্পরকে সাহায্য করত। তারা প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতো। প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও যাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল, তারা স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসার কারণে বিপদে-আপদে একে অন্যকে সাহায্য করত। এভাবে ব্যক্তিগত বা বংশগত বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব বিবাদের সৃষ্টি হত। এর প্রেক্ষিতেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা প্রতিকারের পথ বেছে নিতো। আর প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হলে তারা নিজেদের মান-সম্মানের হানি বলে মনে করত। এভাবে এক গোত্র বা গোষ্ঠীর লোকের সাথে অন্য গোত্রের লোকের ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি প্রায় লেগেই থাকতো। ফলে অনেক দুর্বল গোত্র বা গোষ্ঠী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আবার পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যের কোন ক্ষতি করলে পরিবার প্রধান অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। তেমনি গোত্র বা গোষ্ঠীর কোন সদস্য অন্য সদস্যের কোন ক্ষতি করলে গোত্র বা গোষ্ঠী প্রধান বা গোষ্ঠী পরিষদ অপরাধীকে শাস্তি দিতেন।[৩] এভাবে কয়েক হাজার বছর চলার পর অরাজক ও নৈরাজ্য অবস্থার ধীরে ধীরে অবসান ঘটতে

---

[১] কাজী সামছুর রহমান,অপরাধ বিদ্যা, ১৯৮৯,ঢাকা, পৃঃ-৫৭।
[২] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-২।
[৩] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮ ,পৃঃ -৩।

শুরু করে। মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্য প্রকার শাস্তি প্রদানের ধারণা জন্ম নিতে শুরু করে। ফলে চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক, হত্যার বদলে হত্যা না করে ক্ষতিপূরণ দান করে প্রতিকারের ব্যবস্থার উদ্ভব হতে শুরু করে। তৎকালীন প্রাকৃতিক নিয়ম বা প্রচলিত প্রথার পরিপন্থীমূলক আচরণের জন্য বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দান বা প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানের ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত থাকায় প্রতিপক্ষকে আটক রাখা বা অপরাধীকে বিচারের পূর্ব পর্যন্ত আটক রাখা বা অপরাধীকে আটক রেখে তার প্রতি কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করা হত। সে সময় হতেই "কারাগার" উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মূলতঃ সে সময়ের কারাগার ছিল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক। তাই বলা যায় শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানের উপায় হিসেবে কারাগারের আবির্ভাব ঘটেছিল।

১.২ ঐতিহাসিক পটভূমি

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালে অর্থাৎ ৬০০০ বছর পর্বের পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার বিচার ব্যবস্থায় অপরাধীদের বিচার পূর্ব আটক রাখা বা কারাদণ্ডের মত শাস্তি প্রদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দে প্রাচীন মিশরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় রাজার রাজ্য ও শাসন পরিচালনার স্বার্থে প্রতিপক্ষ বা দোষীদের আটক রাখার জন্য সেই সময় কারাগার স্থাপন করা হয়েছিল। এ ছাড়া সে সময় বিদ্রোহী দাস ও কৃষকদের কারাগারে পুরে অত্যাচার করা হত।[৪] সম্রাট ফেরাউনের শাসনামলে মিশরীয় বিচার ব্যবস্থায় প্রতিশোধমূলক কঠোর শাস্তি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেবিলনীয় বিচার ব্যবস্থায় খ্রিষ্টপূর্ব **১৯৪৮-১৯০৫** সালে হামুরাবীর শাসনামলে দৈব-শাস্তি থেকে ইহলৌকিক শাস্তিবিধান, শাস্তির কঠোরতা হ্রাস ও শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম-৭ম শতকে গ্রীসে মালিক ভিত্তিক বন্দি শিবির স্থাপনের পরিচয় বা উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] জেরুজালেমে ইহুদী সভ্যতা গড়ে ওঠার পর তাদের ধর্মভিত্তিক বিচার ব্যবস্থায় কারাদণ্ড প্রদান এবং যুদ্ধে পরাজিত প্রতিপক্ষকে আটক রাখার নিয়ম ছিল। তবে হত্যার পরিবর্তে হত্যা, চোখের পরিবর্তে চোখ, হাতের পরিবর্তে হাত, পায়ের পরিবর্তে পা ইত্যাদিই ছিল সে সময়ের সাধারণ শাস্তির বিধান। প্রাচীন পারসিক বিচার ব্যবস্থায় কারাদণ্ডের মত শাস্তি প্রদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব **২২১** সালে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণে অসংখ্য চাষী, দাস, সৈনিক ও কারাদণ্ড প্রাপ্ত বন্দিদের সমাবেশ করা হয়েছিল।[৬] সে সময় চীনে আসামীদের নিকট থেকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা হত।[৭] প্রাচীন রোমেও কারাগার ছিল।[৮] প্রাচীন রোমবাসীরা কারাবন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত।[৯] খ্রিষ্টপূব ২য়-**১**ম শতকে দাসেরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদেরকে রাতে কারাগারে পুরে রাখা হত।[১০] এছাড়াও খ্রিষ্টপূর্ব **১**ম শতাব্দীতে কাপুয়া শহরে গ্লাদিয়াতোরদের জন্য একটা বড় বিদ্যালয় কারাগার ছিল।[১১] খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ অব্দে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনৈক রোমবাসী কোন্সুল পদপ্রার্থী হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।[১২] পাওনা ঋণের টাকা আদায়ের জন্য বাদী বিবাদীকে গ্রেপ্তার ও শৃংখলাবদ্ধ করে নিজ হেফাজতে নিয়ে ষাট দিন পর্যন্ত আবদ্ধ করে রাখতে পারতেন।[১৩] এছাড়াও সে সময় কারাদণ্ড প্রদান বা অপরাধীদের কারাগারে আটক রাখার রেওয়াজ রোমে ছিল।[১৪]

পেরিক্লিসের পূর্বে গ্রীক বিচার ব্যবস্থায় শারীরিক শাস্তি বা জরিমানা প্রদানের নিয়ম বলবৎ ছিল এবং সে সময় কারাদণ্ড প্রদান বা অপরাধীদের আটক রাখার নিয়ম ছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে পেরিক্লিসের আমল থেকে নাগরিকদের নির্যাতন করা নিষিদ্ধ করা হয়। দোষী ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত, জরিমানা, ভোটাধিকার হরণ, শরীরে কলংক চিহ্ন দেয়া, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

---

[৪] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ৫৮।**
[৫] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ১৭৮।**
[৬] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ১৩২।**
[৭] **কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-১৫।**
[৮] **আব্দুস শহীদ, কারাস্মৃতি, ১৯৭৭, পৃঃ-২৪৬।**
[৯] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ২৭৮।**
[১০] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ২৮৩।**
[১১] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ২৮৯।**
[১২] **ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃঃ - ৩০১।**
[১৩] **কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৩০।**
[১৪] **কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৩২।**

করা হত। তখন জেল দিয়ে দণ্ডিত করার নিয়ম ছিল না বললেই চলে।[১৫] প্রাচীন ফ্রান্সেও রোমের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। পাক কোরআনে হজরত ইউসুফ (আঃ) কে কারাগারে আটক রেখে কঠোর নির্যাতন করার বর্ণনা দেয়া আছে।[১৬] পবিত্র বাইবেলে যোষেফকে কারাগারে আটক রাখার কথা জানা যায়।[১৭] প্রাচীন ইংল্যান্ডেও কারাগারের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তবে দ্বাদশ শতাব্দী হতে ইংল্যান্ডে কারাগারের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। প্রত্যেক দেশে কারাগার স্থাপন করা উচিত মর্মে রাজা ২য় হেনরি ১১৬৬ সনে আদেশ জারী করেন।[১৮] হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব থেকেই অনুমান করা যায় যে, সে সময়ের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় ও বেবিলনীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রতিপক্ষ বা অপরাধীদের আটক রাখার মত রেওয়াজ তাদের ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালের গোড়ার দিকে আর্যগণ ভারতে আগমনের পর দ্রাবিড় জাতি বা অনার্যদের পরাজিত করে ভারতবর্ষ তাদের দখলে এনেছিল। পরাজিত অনার্যদের মধ্যে যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল; তারা মাঝে মধ্যে আর্যদের উপর হামলা করত। আর্যরা তাদের ধরতে পারলে বন্দি করে রেখে দাসে পরিণত করত। সে সময় সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা ভঙ্গের দায়ে দোষী ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, শারীরিক নির্যাতন, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত।

গৌতমের আমলে (খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০) রাজার আদালত কর্তৃক অপরাধ ও সামাজিক অনাচারের বিচারে শাস্তি প্রদানের কথা জানা যায়।[১৯] ধর্ম শাস্ত্র, বর্ণ ও দেশের প্রথা অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের কথা বুদ্ধায়ন (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০) উল্লেখ করেছেন।[২০] মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতায় ফৌজদারী মামলায় দোষী ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, শারীরিক নির্যাতন, নির্বাসন, খনিতে কাজ করা ও মৃত্যুদণ্ড প্রদানের উল্লেখ করেছেন।[২১] বৈশিষ্ঠ (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০)-এর মতে তখন শুদ্র ব্রাক্ষণকে গালি দিলে তার জিহবা ছিঁড়ে ফেলে তাকে শাস্তি দেয়া হত। অপরপক্ষে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোন ব্রাক্ষণকে গালি দিলে তার শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। অথচ ব্রাক্ষণ শুদ্রকে গালি দিলে কোন অপরাধ হত না। শুদ্র ব্রাক্ষণকে আঘাত করলে যে অঙ্গ দিয়ে আঘাত করত, তার সে অঙ্গচ্ছেদ করে তাকে শাস্তি দেয়া হত। ব্রাক্ষণ ব্যভিচার করলে কোন অপরাধ হত না। অথচ শুদ্র ব্রাক্ষণ কন্যার সাথে ব্যভিচার করলে তার পুরুষাঙ্গ কর্তন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকে শাস্তি দেয়া হত। আর যদি শুদ্র ব্রাক্ষণের আশ্রিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করত, তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। শুদ্র বেদ শ্রবণ করলে তার কানে সীসা ঢেলে কান বন্ধ করে দেয়া হত, বেদ আবৃত্তি করলে তার জিহবা কেটে দেয়া হত, আর যদি সে বেদ স্মরণ করে রাখতো তবে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে শাস্তি দেয়া হত। উচ্চ বর্ণের নারী নিম্নবর্ণের লোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে জনসমক্ষে কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করানো হত। নর হত্যার শাস্তি ছিল বর্ণভেদে বিভিন্ন প্রকার। অর্থাৎ শুদ্রের নর হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল অবধারিত। আর উচ্চবর্ণের লোক নরহত্যা করলে সামান্য শাস্তি ভোগ করত। এ ছাড়া চৌর্য ও অন্যান্য অপরাধে অপরাধীকে দণ্ডিত করা হত।[২২]

বিষ্ণু (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০-৩০০), যাগ্যবল্ক (৩৫০ইং), নারদ (৪০০ ইং), বৃহস্পতি (৪৫০ ইং) বিভিন্ন অপরাধে অপরাধীদের কারাদণ্ডসহ অন্যান্য শাস্তি প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন।[২৩] পূর্ব বন্দিদের সুরক্ষিত অন্ধকার ঘরে রাখা হত মর্মে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জানা যায়। সেকালে বন্দিদের দ্বারা রাস্তা নির্মাণের কাজ করানোর উদ্দেশ্যে তখন রাস্তার পাশে কারাগার নির্মাণ করা হত। তখন অপরাধীরা যাতে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত না হয় এ চিন্তা মাথায় নিয়ে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গহানি, বেত্রাঘাত, নির্দয়ভাবে কষাঘাত, জ্বলন্ত লোহার ছেঁকা দেওয়া বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। সে সময় কারাবন্দিদের উপর অতিশয় কঠোর ও নির্মম আচরণ করা হত। ঐ সময়ের কারাগার মানেই ছিল মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের স্থান।[২৪]

---

[১৫] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-১৭।
[১৬] পবিত্র কোরআনুল করিম, সুরা- ইউসুফ, আয়াত-২৫।
[১৭] পবিত্র বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, আদি পুস্তক, ৩৯ অধ্যায়, পদ-২০।
[18] The New Encyclopedea Britanica, Vol-9, 15th Edition, p-710.
[১৯] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৪১।
[২০] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৪০।
[২১] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৪৭।
[২২] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৪৮-৪৯।
[২৩] কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-৫০-৫১।
[24] Prof. N.V.Paranjape, Criminology and Penology, 10th Ed. p-261-262.

এককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘানি-জাহাজের দাঁড় টানার কাজ ও সম্মুখ যুদ্ধে কারাবন্দিদের নিয়োগ করা হত। এ ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীনকাল হতেই শাস্তিদানের উপায় হিসেবে কারাগার প্রথার প্রচলন হয়ে আসছে।

৭১২ সালে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়তে শুরু করে। তবে ৯৯১ সনের পর মোহাম্মদ ঘুরি ভারত জয় করে খলিফাদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুকরণে এদেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে অপরাধীদের প্রহার, নির্বাসন ও কারারুদ্ধ এ তিন প্রকারের শাস্তি প্রদান করা হত। মোগল আমলে আসামীকে অহেতুক বন্দি করে না রেখে তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও অঙ্গহানির শাস্তি প্রদান না করে কারাগারে আটক রেখে শাস্তি প্রদানের প্রথা চালু করা হয়।[২৫] ১২০৬ সনে কুতুবউদ্দীন আইবকের রাজত্বকাল থেকে ১৫২৬ সনে মোগল বাদশা বাবর কর্তৃক ইব্রাহীম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করা পর্যন্ত সময়কে সুলতানী আমল এবং ১৫২৬ সন থেকে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে মোগল আমল বলা হয়। সে সময়ে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কারাগারগুলো ছিল অত্যন্ত নোংরা, আলো-বাতাসের অভাব, ভ্যাপসা গন্ধময় এবং শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। তখন কারাবন্দিদের উপর অতিশয় কঠোর ও নির্মম আচরণ করা হত। সে সময়ের কারাগার মানেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্থান। তখনো ভারতবর্ষের কারাগার আজকের মত প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করেনি এবং তখন কারাগার পরিচালনার কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল না।

১.৩ ভারতবর্ষের কারাব্যবস্থা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আগমন করতঃ ১৬১২ সনে সুরাট বন্দরে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তারপর ১৬৯০ সনে ভাগীরথী নদীর পর্ব পাড়ে সুতানটি গ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে কলিকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করে। ১৬৯৮ সনে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামের জমিদারি লাভ করায় ১৭০০ সন থেকে গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্য কলিকাতা নগরীর রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন। সে সময় তিনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। বিচারে অপরাধীকে বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, জরিমানা, শৃংখলাবদ্ধ করে রাস্তায় কাজ করানো, নগরী থেকে নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড শাস্তি প্রদান করতেন। ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে এবং ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে। তখন নামেমাত্র মোগল সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করতেন।

মোগলদের রেখে যাওয়া আইন-কানুন ও বাদশাহী ফরমান অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশ চালাতে শুরু করে। কারণ প্রচলিত আইন-কানুন বাতিল করে রাতারাতি ইংরেজদের আইন-কানুন চালু করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। তাই তারা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে তাদের সুবিধামত বিধি-বিধান চালু করতে শুরু করে এবং দেশীয় কায়দায় শাস্তি দানের পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারত বর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। এ ছাড়া কলিকাতা কাউন্সিল বিলুপ্ত করে সুপ্রিম কোর্টের প্রবর্তন করেন। সে সময় অপরাধ দমন বা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান বা ইংরেজ বিরোধী ভারতীয়দের আটক রেখে শাস্তি প্রদানের জন্য তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী কারাগারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মানসে আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র জারী করতে থাকে। ফলে তখন থেকেই মোগলদের ব্যবহৃত রেখে যাওয়া ভারতবর্ষের কারাগারসমূহ ইংরেজদের প্রণীত নিয়ম-নীতি অনুসারে চলতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে গঠনমলক শ্রমনীতি ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা অপরাধীর চরিত্র সংশোধনই কারাগারের লক্ষ্য বিবেচনা করে লন্ডনে কয়েকটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ১৫৫৩ ও ১৭৭৫ সালে স্থাপিত হয়। ১৮ শতকে সারা বিশ্বে মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ঐ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কারাগারকে শাস্তি দানের প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হত। এর ফলশ্রুতিতে ১৭৯০ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়।[২৬] তদুপরিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক

---

[২৫] **কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮, পৃঃ-১৫৮।**

[২৬] **The Joy of Knowledge, USA, Vol-II, p-2639.**

ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিচারের অপেক্ষায় আটক বন্দি বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত বন্দি কিংবা বিনাবিচারে আটক বন্দিদের শাস্তি দানের চিন্তা মাথায় নিয়ে আটক রাখার জন্য প্রতিটি জেলা সদরেই ধীরে ধীরে কারাগার নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করে। তখন প্রতিটি জেলা সদরের রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, জঙ্গল পরিষ্কার ও সরকারী ইমারতাদি নির্মাণের জন্য কারাবন্দিদের নিয়োগ করা হত। সে সময় বন্দিদের অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার পরিবেশনসহ কঠোর শৃংখলা ও অত্যধিক পরিশ্রম করানো হত। এ ছাড়া তখন কারাগারের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও পীড়াদায়ক।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ The Prison Enquiry Committee নামে ১৮৩৬ সনে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি ২ বছর পর তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ দাখিল করেন। ঐ তদন্ত প্রতিবেদনে কারাগারে ব্যাপক দুর্নীতি, বিশৃংখলা এবং বন্দিদের দিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ করানোর সমালোচনা করা হয়। এর প্রেক্ষিতে তখন হতেই বন্দিদের দিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[২৭] তবুও বাংলাদেশের অনেক কারাগারে এখনো কারা এলাকার ভেতরে বন্দিদের দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ করানো হয়ে থাকে। এরপর ঐ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কারাকর্তৃপক্ষের দুর্নীতি রোধ ও কারাগার তদারকির জন্য সর্বপ্রথম ১৮৫৫ সালে মহাকারা পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়।[২৮] এর পরও বাস্তবতার নিরিখে পর্যায়ক্রমে ১৮৬৪, ১৮৭৭, ১৮৮৮-৮৯ ও ১৮৯২ সনে পৃথক পৃথকভাবে Jail Enquiry Committee গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিগুলো যথাসময়ে তাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। উপরিউক্ত রিপোর্ট/সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮৯৪ সনে The Prison Act নামে কারা পরিচালনার সংক্ষিপ্ত আইন অনুমোদিত হয়।[২৯] এই অনুমোদিত আইন এবং ভারতবাসীদের শাস্তিদানের মানসে সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র অনুসারে কারাগার পরিচালনা হতে থাকে। ইত্যবসরে বৃটিশ সরকারের ব্যবসায়ী মনোভাব ও দমনমূলক নীতির কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে কারাগারে বন্দির সংখ্যা প্রবলভাবে বাড়তে শুরু করে। ফলে বন্দিদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সময় কারাগারে অত্যধিক বন্দি চাপের কারণে এবং কারাভ্যন্তরে দমননীতির ফলে অনেক বন্দি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এর প্রেক্ষিতে বন্দিদের চাপা অসন্তোষ দানা বাধতে শুরু করে। এসব বিবেচনা করে ১৯১৯ সনে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় জেল কমিটি (Indian Jail Committee) গঠিত হয়। এ কমিটি বার্মা, ফিলিপাইন, হংকং, জাপান ও ব্রিটেনের কারাগার পরিদর্শন করে আমাদের দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন দাখিল করে। কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পূর্বের গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ অনুযায়ী বন্দিদের শ্রম, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের মান উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে সমালোচনা করা হয়। কারাগারকে দমনমূলক ও শাস্তিদানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করে সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও কারাগারে অত্যধিক বন্দি চাপ হ্রাসের জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রদানের কথা বলা হয়। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে ভারতবর্ষের কারাগারসমূহে অবস্থানরত অতিরিক্ত বন্দিসংখ্যা হ্রাসের জন্য প্রতিটি কারাগারের নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা (Registered Accomodation) ও প্রত্যেক বন্দির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা নির্ধারণ সম্পর্কিত আইন জারী করা হয়। এর পর হতেই প্রতিটি কারাগারে একজন বন্দির জন্য ৬´×৬´ ফুট জায়গা হিসেব করে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। এ নিয়ম আজও বাংলাদেশে বহাল আছে। কিন্তু প্রতিটি কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার ২ গুণ বা ৩ গুণ বন্দি অবস্থান করছে। তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সরকার নিজেই আইনভঙ্গ করে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি কারাগারে আটক রেখে তাদের কষ্ট দিচ্ছে। আর এর কারণে মানবিক মূল্যবোধ হচ্ছে পদদলিত।

১.৪ পাকিস্তানী কারাব্যবস্থা

১৯৪৭ সনে দেশ বিভক্তের পরও পূর্বের সামন্তীয় নিয়ম-নীতি অনুসারে কারাগার পরিচালিত হতে থাকে। আগের মতই বন্দিদের দ্বারা তেলের ঘানি টানার কাজ, কথায় কথায় পায়ে লোহার বেড়ী (ডাণ্ডাবেড়ী) লাগানো বা দীর্ঘদিন নির্জন কারাবাসে প্রেরণ, কাপড়ের পরিবর্তে চট পরানো, পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও তিন বাটি পানি দিয়ে গোসল, নিম্নমানের খাবার, অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ

---

[২৭] Prof. N.V.Paranjape, Criminology & Penology, 10th Ed. p-262.

[২৮] Prof. N.V.Paranjape, Criminology & Penology, 10th Ed. p-262.

[২৯] কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, Vol-I,পৃঃ-৭।

বিদ্যমান ছিল প্রতিটি কারাগারেই। এ ছাড়া নগ্নপায়ে হাঁটু গেড়ে সারিবদ্ধভাবে বসে মাথা নিচু করে জেলের অফিসারদের নিকট হাজির করার নিয়ম বহু আগে হতেই চলে আসছে।

কাজেই এদেশের মানুষের দাবীর মুখে অপরাধীদের সংশোধন ও বন্দিদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কথা বিবেচনায় রেখে **১৯৫৬** সনে পূর্ব পাকিস্তান কারা সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন **১৯৫৭** সালে যথাযথভাবে তাঁদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ দাখিল করে। উক্ত কমিশন তাঁদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে কারাগারের অমানবিক ও দমনমূলক আইন-কানুন বাতিলসহ কারাগারকে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরের সুপারিশ করে। এরপর কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কারা-সংস্কারের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হলো না। কমিশন কর্তৃক কাগজে লিখিত সুপারিশ কাগজেই থেকে গেল। কারা সংস্কার আর আলোর মুখ দেখতে পেল না। অন্ধকারেই পড়ে রইল বন্দিদের নির্মম ও দুর্বিষহ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। সে সময় বন্দিরা মানবিক দাবী-দাওয়া তো দূরের কথা; তারা সামান্যতম নিজের প্রয়োজনের কথাও কারাকর্তৃপক্ষের কাছে বলার সুযোগ পেত না। এর ব্যতিক্রম হলেই আদিম কায়দায় বন্দিদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হত। **১৯৫২** সালে মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করে। ফলে এ মহান বিপ্লবের আলোর ছটায় কারা বন্দিরাও প্রভাবিত হয়ে ওঠে। এর পর পাকিস্তানী কারাকর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ **১৯৬২-৬৩** সনে বন্দিদের দ্বারা তেলের ঘানি টানার কাজ বন্ধ করে দেয়। এছাড়া কারাগারের তেমন কোন নিয়ম বা আইন পাকিস্তান সরকারের আমলে পরিবর্তন বা সংস্কার করা হয়নি। পূর্বের মতই কারাগারকে শাস্তি দানের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৫ বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে লাখো লাখো মা-বোনের ইজ্জত, লাখো লাখো প্রাণের বিনিময়ে এক নদী রক্ত পেরিয়ে ভারতের সহযোগিতায় দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে আলাদাভাবে "বাংলাদেশ" জায়গা দখল করে নিল। আমরা স্বাধীন হলাম। স্বাধীনতার পর শিশু রাষ্ট্র হিসেবে "বাংলাদেশ" নিজের আত্মপরিচয়ে তার যাত্রা শুরু । সে থেকে সামন্তীয় ধ্যান-ধারণার প্রণীত আইন-কানুন অনুসারে পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া বাংলাদেশের কারাগারসমূহ পরিচালিত হতে লাগল। **১৯৭৩** সাল থেকে **১৯৭৫** সাল পর্যন্ত কারণে-অকারণে এদেশের মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপের হিড়িক শুরু হয়। ফলে প্রতিটি কারাগারে ধারণক্ষমতার ৪/৫ গুণ বেশী বন্দি অবস্থান করছিল। সে সময় প্রতিটি কারাগারেই অত্যধিক বন্দি বৃদ্ধির কারণে শোবার জায়গার অভাবে রাতে বন্দিরা পালা করে ঘুমাতো। এছাড়াও সে সময় অনেক কারাগারের ঘরে জায়গার অভাবে কারাভ্যন্তরের গাছতলায় বা খোলা আকাশের নীচে বন্দিরা অবস্থান করত বলে জানা যায়। কারাগারে অত্যধিক বন্দি বৃদ্ধির চাপ, প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি, বন্দিদের প্রতি লাঠিয়াল বাহিনীর মত অমানবিক আচরণ, অখাদ্য জাতীয় খাবার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রণীত আইনের নিষ্পেষণে বন্দিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। এসব বিভিন্ন কারণে বন্দিদের অভিযোগ, ক্ষোভ ও অশান্তি দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে বিস্ফোরণ আকারে **১৯৭৬** সনে বাংলাদেশে **১ম** কারা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ সালে আরও ৪বার এবং **১৯৭৭** সনে ৬ বার বিভিন্ন কারাগারে কারা বিদ্রোহ ঘটে।[৩০] এসবের ফলশ্রুতিতে তদানীন্তন সরকার কারা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও বন্দিদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং অপরাধীদের সংশোধনের চিন্তা-ভাবনা মাথায় নিয়ে কারা সংস্কারের জন্য ০৪ নভেম্বর **১৯৭৮** ইং তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব এফ.কে.এম. এ. মুনিমকে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কারা সংস্কার কমিশন গঠন করে। ঐ কমিশন এদেশের বিভিন্ন কারাগার পরিদর্শন ও সরেজমিনে ভুক্তভোগীদের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে। এর পরও দেশের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, আমলা, ছাত্র-শিক্ষক ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে কমিশন কারাগারের সমস্যা ও সমাধান, উন্নয়ন এবং আধুনিকরণের বিষয় খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করে। এ ছাড়াও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে **১৮**টি দেশের কারাগার দর্শন ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে। কারাগার ও কারাপরিচালনার নিয়ম, অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন পদ্ধতি, কারাবন্দিদের সুযোগ-সুবিধা এবং বন্দিদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনেন। এরপর কমিশন সর্ব বিষয়ে বিবেচনা করে বাস্তবতার নিরিখে এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে **১৯৮০** সালে **২০**টি অধ্যায়ে লিখিত যুগোপযোগী **১৮৬**টি সুপারিশমালা

[৩০] **২৩.১২.৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।**

সরকারের নিকট দাখিল করে। সুপারিশ দাখিলের দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে ২৫টি বাস্তবায়িত ও ১৯টি সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারা বিভাগে দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব এবং সরকারের উদ্যোগহীনতা ও অর্থায়নের অভাবে ১৯৮০ সনের দাখিলকৃত কারা সংস্কারের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে আমাদের দেশের কারাগারসমূহ এখনো সামন্তীয় কায়দায় শাস্তি দানের প্রধান উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে লজ্জিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন আর পদদলিত হচ্ছে মানবাধিকার।

আজও আমাদের দেশে আমলা আর জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়নি। সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়েই তারা কারাবন্দিদের সাথে অমানবিক আচরণ করে। আজও তারা কারাগারে বন্দিদের দৈহিক উৎপীড়ন ঘটায় পশুসুলভ আচরণ করে। জেলারেরা বন্দিদের পেটায়, এমন নজিরও অসংখ্য।[৩১] দুঃখজনক হলেও মর্মান্তিক সত্য যে, সভ্য দুনিয়ায় বাস করে এখনও বাংলাদেশের মানুষকে কারাগারে নিরাপদ হেফাজত কিংবা পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ ৩০বছরে সবকিছুতেই কমবেশী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; লেগেছে আধুনিকতার ছাপ। কিন্তু এই কারাবিভাগের তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সেই ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয়দের বিভিন্নভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার মানসে প্রণীত আইন-কানুন দ্বারা বাংলাদেশের কারাগারসমূহ এখনো পরিচালিত হচ্ছে। এর কারণে কারাবিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঐ ঔপনিবেশিক আমলের আইন দ্বারা হচ্ছেন সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রিত। ফলে ঐ আইনের প্রভাব তাদের ওপর প্রতিফলিত হওয়ায় স্বাভাবিক। এ কারণে কারাবন্দি ও কারাকর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রভু ও দাস সুলভ মনোভাব আজও বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে কারাবন্দি কর্তৃক হাঁটুগেড়ে বসে কুর্নিশ করা, চুন থেকে পান খসলেই অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ, কারা অপরাধের দমনমূলক নীতিতে বিচার, শারীরিক নির্যাতন, দাস সুলভ নীতিতে বেগার খাটুনি, সব ধরনের বন্দিদের একই পরিবেশে রাখা, সবক্ষেত্রেই মানবিক আবেদন অগ্রাহ্য, মধ্যযুগীয় কায়দায় বন্দিদের পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী বা বারফেটার লাগানো ইত্যাদি এখনো বাংলাদেশের কারাগারে আইনগতভাবে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া বন্দিদের আবাসিক সমস্যা প্রকট, খাবার পানির তীব্র অভাব, চিকিৎসা সংকট, খাদ্য সরবরাহে অনিয়ম, নিম্নকর্মচারীদের প্রতি নির্যাতন ও জুলুম এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি দিন দিন বেড়েই চলেছে।[৩২] বাংলাদেশ পূর্ব সময়ে যেখানে লাঙ্গল দিয়ে দুর্নীতির চাষ চলতো, সেখানে আজ ট্রাক্টর চালানো হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সর্ব ক্ষেত্রে কয়েদী-হাজতীদের সাথে যে নির্মম আচরণ করা হয়, তার বর্ণনা দেয়া অত্যন্ত কষ্টকর। মধ্যযুগের ক্রীতদাসের সাথে কেবল সে আচরণের তুলনা করা চলে।[৩৩] তাই বলা যায় বাংলাদেশের কারাগারসমূহ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় পরিচালিত না হলেও আধুনিকতার ছাপ এখনো পড়েনি। এর ফলে বাংলাদেশের কারাগার সংশোধনী প্রতিষ্ঠান না হয়ে শাস্তি-দানের প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন - ঔপনিবেশিক ও স্বৈরাচারী শাসকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমাদের কারাব্যবস্থায় বড় রকমের কোন সংস্কার এখনো হয়নি। সমগ্র কারাব্যবস্থাটাকে এখনো আমরা শাস্তি মূলক ব্যবস্থা হিসেবেই দেখি।[৩৪] দুঃখের বিষয় আমাদের জেলখানাগুলো নিতান্তই আটক রাখার খোয়াড়, সংশোধন করার প্রতিষ্ঠান নয়।[৩৫] জেল শাসন আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার না হলে এখানে নর-নারীকে সংশোধনের জন্য পাঠিয়ে সমাজ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।[৩৬]

১.৬ কারাব্যবস্থায় আধুনিক ধারণা

কারাগার সম্পর্কে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। ১৬'শ শতাব্দীতে লঘু অপরাধীদের সংশোধনের জন্য লন্ডনে ১৫৫৩ সনে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কলোনী সমস্যা সমাধানের পর তথায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮ শতকে মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ায় অপরাধ সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ঐ শতকের শেষদিক পর্যন্ত কারাগারকে শাস্তি-দানের প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হত। ১৭৯৪ সালে অপরাধীদের শারীরিক যোগ্যতা, লিঙ্গ ও অপরাধের প্রকৃতি ও Reformative measure অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে

---

[৩১] বোরহান আহমেদ, কারাগারের দিনগুলি, ১৯৯৫, পৃঃ-৪৯।
[৩২] কারা অধিদপ্তরের ২৯.০১.১৯৯৭ তারিখের PD/GL-১৩/৯৭/১৪৬ (৮২) নং পত্র।
[৩৩] ২৪.১২.১৯৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[৩৪] ১১.০৩.৯০ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।
[৩৫] শামসুজ্জামান খান, উচ্চতর সমাজ কল্যাণ (২য় সংস্করণ), ১৯৭৭, পৃঃ- ১৯৪।
[৩৬] শামসুজ্জামান খান, উচ্চতর সমাজ কল্যাণ (২য় সংস্করণ), ১৯৭৭, পৃঃ- ১৯৩।

রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় **১**ম রাষ্ট্রীয় পেনিটেনশিয়ারী স্থাপিত হয়। এ সময় ইতালিতে বেক্কারিয়া ও ইংল্যান্ডের জন হাওয়ার্ড কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে কারাগারের শোচনীয় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। **১৯** শতকে এ সংস্কারের নেতৃত্ব দেন এলিজাবেথ ফ্রাই ও ডরোথি এল, কিক্স।[৩৭]

বর্তমান যুগে দণ্ডনীতি সম্পর্কে অপরাধ বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মত পোষণ করেন। “Hate the crime, not the criminal" অপরাধকে ঘৃণা কর অপরাধীকে নয়”। তখন হতেই সামরিক কায়দায় কারা পরিচালনার নিয়ম-কানুন উন্নত দেশগুলো বর্জন করতে শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে **১৯১৭** সালে যুক্তরাষ্ট্রের New York Prison Survey কমিশন কারাগার প্রথা বাতিল করে সংশোধন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।[৩৮]

পরিস্থিতির শিকার হয়ে বা ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত অথবা সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয়ে কিংবা দারিদ্র্যের কারণে কেউ যদি অপরাধ করে বসে, তাকে কারাদণ্ড দিলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সংশোধন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।[৩৯] শাস্তিকে প্রতিরোধ এবং সংশোধন - যে নীতিতে গ্রহণ করিনা কেন, সব মতবাদে শাস্তি স্বীকৃতি আছে। আমেরিকাতে শাস্তি নামটিই উঠিয়ে দিয়ে “চিকিৎসা” নামে অভিহিত করা হচ্ছে। শাস্তিও নয়, চিকিৎসাও নয় বরং শাস্তি চিকিৎসার সমন্বয় সাধন করে আনন্দ-দুঃখ দু'য়ের মাধ্যমে অপরাধীর ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন করে তাকে সামজে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হবে।[৪০]

মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। সুস্থ মানুষ ইচ্ছা করে অপরাধ করে না। তার অপরাধের পেছনে নানা ধরনের কারণ থাকে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিও অনেক সময় অপরাধের সহায়ক হয়ে থাকে। মানুষ ভুল করে কিন্তু তাকে যদি সে ভুলের সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়, তাহলে সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। পৃথিবীর কোন দেশে আর কারাগারকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারাগারকে ধরা হয় সংশোধনাগার হিসেবে।

১.৭ সারকথা

সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা অবগুণ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারাগার চিরকাল জনমানসে কৌতুহলের উদ্রেক করে। ব্রিটিশরা এদেশের কারাগারকে শাস্তি দানের প্রতিষ্ঠান বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। আমরা এখন স্বাধীন। এখন এ ধারণা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। এখন কারাগারকে চরিত্র সংশোধনের কর্মশালা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কারাগারকে সংশোধনের জন্য স্থান বলে মনে করে না। বিচারে শাস্তি হোক বা নাহোক, এখানে আগত প্রত্যেককে ক্রিমিনাল হিসেবে মনে করা হয়।[৪১] কোন বন্দি সুস্থ পরিবেশে ও সুষ্ঠু আচরণ পেলে কারাগার থেকে একজন পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যেতে পারে। আর কারাগারের পরিবেশ অসুস্থ হলে এবং বন্দিরা কারা অভ্যন্তরে নির্যাতিত হতে থাকলে পূর্বের চেয়ে আরও বড় ধরনের অপরাধ প্রবণ মানসিকতা নিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

মানুষের অপরাধ প্রবণতার প্রতিকূল প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ভারসাম্যহীনতা প্রতিরোধের জন্য কারাগারের ভূমিকা অপরিসীম এবং সার্বজনীন। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেই “দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন” এ মূলনীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। দুষ্টের দমনের প্রয়োজনে কারাগার শুধুমাত্র আটক রাখার প্রতিষ্ঠান নয় বরং কারাবাসকালে দুষ্টের নিয়ন্ত্রিত জীবন চর্চায় শিষ্টতার অভিজ্ঞান আরোপ করাও কারা প্রশাসনের একটি মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের কারাগার এর ব্যতিক্রম। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মানবাধিকারের প্রশ্নে আজকের পৃথিবী প্রগতিশীলতার সম্মুখ পথযাত্রী। সে দৃষ্টিকোণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারাগার এখন আর শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই আইনের মানদণ্ডে দণ্ডিত কোন অপরাধীর কারাবাস জীবনে তার অপরাধ প্রবণতাকে সংশোধন করে আইন মান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করাই বাংলাদেশের আধুনিক কারাগারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

---

[৩৭] **খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ২য় প্রকাশ, পৃঃ-৫৬০।**

[৩৮] **JEFFRI G. MURPHY, Punishment and Rehabilitation, USA, p-135.**

[৩৯] **কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪, পৃঃ-১৪।**

[৪০] **হামজা হোসেন, অপরাধ বিজ্ঞান, ১৯৯৫, পৃঃ-১৩৭।**

[৪১] **২২.১২.১৯৯৬ তারিখের “দৈনিক জনকণ্ঠ” পত্রিকা।**

অধ্যায়-২ ঃ আইনগত ভিত্তি

২. কারাবিধি ও কারা সংস্কার

(Jail code and Jail Reforms)

২.১ প্রাসঙ্গিক কথা

ভারতবর্ষের কারাগারসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের শুরুতে বিধিগত দিকনির্দেশনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। সে সময় সামান্য ম্যানুয়েলের উপর ভিত্তি করে কারা প্রশাসনের যাত্রা শুরু । এরপর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থার তাগিদে জারী করা হয় ঘোষণাপত্র, পরিপত্র ও সরকারী আদেশ; যার উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদানের (Punitive) দৃষ্টিভঙ্গিতে কারা প্রশাসন সামনে এগুতে থাকে।

১৮৩৬ সালে মিঃ মেকেলের পরামর্শে কারাসংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম ''কারা তদন্ত কমিটি'' গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার আদৌ গ্রহণ করেনি। তবে ঐ কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৮৫৫ সনে কারাগারসমূহ পরিচালনার জন্য মহা কারাপরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়।

মহা কারাপরিদর্শক ডাঃ এফ, জে মুয়াতের প্রচেষ্টায় জারীকৃত ঘোষণাপত্র, পরিপত্র ও সরকারী আদেশসমূহ একত্রিত করে ১৮৬৪ সনে সর্বপ্রথম কারা বিধি (Bengal Jail code) বই আকারে জন্ম লাভ করে। ঐ বছরই কারাগারের কিছু সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জেল তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এর পর ১৮৬৭ সনে ডাঃ এফ, জে, মুয়াতের প্রধান সহকারী মিঃ হোজ এই কারা বিধির কিছু নীতিমালা পরিবর্তন ও সংযোজন করে কলেবর বৃদ্ধি করেন। অতঃপর ১৮৭১ সনে ''দ্যা প্রিজনার্স এ্যাক্ট'' (Prisoners Act) জারী হওয়ার প্রেক্ষিতে কারাবিধি সংশোধনের তাগিদে মহা কারাপরিদর্শক মিঃ ডাবলিউ, জে, হেলীর প্রচেষ্টায় কারাবিধির ২য় সংস্করণ ১৮৭৬ সনে প্রকাশ পায়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মিঃ ডাবলিউ লেনিয়ার্ড-এর সহযোগিতায় ডাঃ লেথবীজ কারাবিধির ৩য় সংস্করণের আত্মপ্রকাশ ঘটান।

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার সাথে কারাগারের অব্যবস্থা ও অমানবিক দিকগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য পেশ ও কারা সংস্কারের জন্য আবেদন করতে থাকে। কংগ্রেসের আবেদন ও দাবীর প্রেক্ষিতে ১৮৭৭, ১৮৮৯ ও ১৮৯২ সনে মোট তিনটি জেল তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

উপরিউক্ত কমিটিসমূহের সুপারিশের আলোকে ১৮৯৪ সনে ''দ্যা প্রিজন্স এ্যাক্ট'' (The Prisons Act) জারী করা হয়। এই নতুন এ্যাক্ট জারী হওয়ার কারণে ১৮৯৬ সনে কারাবিধির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পরও কারা পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় ১৯০০ সনে সংশোধিত ''প্রিজনার্স এ্যাক্ট'' (The Prisoners Act as amended) জারী করা হয়। এ কারণে কারাবিধি সংশোধন ও সংযোজন করে ১৯১০ সনে ৫ম সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মহা কারাপরিদর্শক, ওয়াল্টার বুকাননের প্রচেষ্টায় ও তাঁর প্রধান সহকারী বাবু পঞ্চগোপাল মল্লিক ও বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র গুহের সহযোগিতায় ১৯১৯ সনে কারাবিধির ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীতে ১৮৯৪ সনের প্রিজন্স এ্যাক্টের কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বিবেচনা করে ১৯১৯-১৯২০ সনে ''ভারতীয় জেল তদন্ত কমিটি'' গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশের আলোকে মহা কারাপরিদর্শক, লেঃ কর্ণেল, ডাবলিউ, জে বুকানন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনসহ ১৯৩৭ সালে কারাবিধির সর্বশেষ বা ৭ম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

১৮৬৪ সনের ১ম সংস্করণ থেকে ১৯৩৭ সনের ৭ম সংস্করণ পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণও বিভিন্ন সময় বাস্তবতার নিরিখে ও প্রয়োজনের তাগিদে কারাবিধির মৌলিক পরিবর্তন করেছে। কিন্তু ১৯৩৭ সনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কারাবিধির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ঐ কারাবিধি অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশের কারা প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে।

কারা বিধি বা Jail code দু'খণ্ডে বিভক্ত। যথা ঃ- ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড।

কারাবিধির ১ম খণ্ডঃ- কারা প্রশাসন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার একমাত্র অবলম্বন ও দিকনির্দেশক। ঐ ঔপনিবেশিক আমলের আইনের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের কারাগারসমূহ এখনো পরিচালিত হচ্ছে।

কারাবিধির ২য় খণ্ড ঃ- কারা প্রশাসন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ফরম এবং তার ব্যবহার প্রণালী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে কারা সংস্কার কমিশন গঠন করে। ঐ কমিশন কারা প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনসহ আধুনিকায়নের সুপারিশ করে। কিন্তু তৎকালীন সরকার কারা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আদৌ গ্রহণ করেনি। অতঃপর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৮ সনে কারা বন্দিদের দাবীর প্রেক্ষিতে ঐ বছরের ৪ঠা নভেম্বর কারা সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এফ, কে, এম, এ মুনীমের নেতৃত্বাধীন নয় সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন দেশের বিভিন্ন কারাগার ও বহির্বিশ্বের ১৮টি দেশের কারা ব্যবস্থা পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করে। পরিশেষে বন্দিদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, কারা প্রশাসনের সংস্কার ও আধুনিকায়নের নিমিত্তে ১৮৬টি সুপারিশসহ ১৯৮০ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন দাখিল করে। দীর্ঘ একুশ বছরে ঐ সুপারিশগুলোর মধ্যে মাত্র ২৫টি বাস্তবায়িত এবং ১৯টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সুপারিশগুলো এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা এখনো শাস্তি প্রদানের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.২ প্রচলিত কারাবিধি অমানবিক ও উন্নয়নের অন্তরায়

অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের সংশোধনের জন্য ১৯৫৫ সনে জাতিসংঘের ১ম কংগ্রেসে কারাবন্দিদের সাথে আচরণের ন্যূনতম নিয়ম-নীতি ও আদর্শ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন অনুমোদিত হয় (Standard Minimun Rules for the Treatment of prisoners)(পরিশিষ্ট-ক)। এই আন্ত-র্জাতিক আইনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সনে জাতিসংঘে কারাবন্দিদের সংগে আচরণের ন্যূনতম আদর্শ নিয়ম এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রণালী বিষয়ক আইন পাস হয়। দলিলটির ইংরেজি মূল শিরোনাম ছিলঃ- Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners and procedures for the effective implementation of the rules. ঐ আইন/দলিলের বাংলা অনুবাদ ''পরিশিষ্ট-খ'' দেখা যেতে পারে।[৪২] বাংলাদেশে প্রচলিত কারাবিধি বা Jail code কোন সাংবিধানিক আইন নয়। প্রায় একশত বছর আগে ব্রিটিশ শাসকগণ তাঁদের মন মানসিকতায় উপনিবেশ শাসন করার সুবিধার্থে বিদ্রোহীদের আটক রাখা, অপরাধ দমন ও শাস্তি প্রদানের জন্য কারাবিধি সংকলন করেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বৃদ্ধ আইন হয়ে পড়েছে এই স্বাধীন দেশের জন্য অনুপযুক্ত। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এই বৃদ্ধ দানবীয় আইন এখনও প্রচলিত আছে মনে হলে নিজেদের স্বাধীন ভাবতে কষ্ট হয়। আমরা স্বাধীন হয়েও পরাধীনতার শিকল আমাদের ওপর অক্টোপাসের মত চেপে বসে আছে। দেশের স্বাধীনতার সাথে সাথে সমাজ, সভ্যতা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সর্বক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রগতিশীল মানবিক আন্দোলনের হাওয়ায় পরিচ্ছন্ন সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলিত কারাবিধির উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে। এ সব বুড়ো আইন যতদিন প্রচলিত থাকবে ততদিন আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব না। সব উন্নয়নের অন্তরায় এসব আইন।

কেস-১

প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা চাহিদা পূরণে অক্ষম

আইন মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তারা বলেন-দেশে প্রচলিত আইনের অধিকাংশই ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে তৈরী। শত শত বছরের পুরনো এসব আইন এবং বিচার-ব্যবস্থা সময়ের চাহিদা পূরণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কখনো আইন ও বিচার কাঠামো সংস্কারের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে আদালতগুলোতে হাজার হাজার মামলা ক্রমান্বয়ে পুঞ্জিভূত হয়েছে। আইন আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে গেছে। ন্যায় বিচার পরিণত হয়েছে দুর্লভ বস্তুতে।

উৎস ঃ-২৮/০২/৯৯ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকা

[৪২] **আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃ-১৩৩।**

নির্যাতন, নিপীড়ন ও শাস্তি সর্বস্ব কারা আইন বলবৎ থাকায় অপরাধীরা সংশোধিত না হয়ে ঘাঘু অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। এদের সংস্পর্শে যারা অবস্থান করছে তাদের উপরও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ছে। ফলে প্রতিহিংসা, সহিংসতা, অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা সমাজে দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রচলিত কারা আইনে ন্যূনতম মানবাধিকারের সুযোগ রাখা হয়নি। তাই আমরা স্বাধীন হয়েও আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি।

২.৩ কারাবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য ও সুধীজনদের কথা

বর্তমানে প্রচলিত কারাবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য ও দেশের বরেণ্য সুধিজনদের বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জেল সংস্কার শীর্ষক সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে বক্তাগণ বলেন-[৪৩] কারাবন্দিদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তাদের বাঁচার অধিকার আছে। তাদের মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ নিশ্চিত করতে হলে ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইন সংশোধন করে তা স্বাধীন দেশের যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে। তাঁরা আরও বলেন-বৃটিশ আমলে বন্দিদের সাথে শাস্তিমূলক আচরণ করা হতো। কিন্তু স্বাধীন দেশে বন্দিদের সাথে আচরণ হবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও সংশোধনমূলক। সমাজ জীবনে পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি পাল্টে যাওয়ার কারণেও এই আইন এখন অচল হয়ে পড়েছে। অপরাধীকে কয়েদ করেই অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয়। এসব বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য বক্তাগণ জেল কোড সংশোধন এবং একটি আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব এ, এফ,এম আব্দুল জলিল কারাগারের কাহিনী বইয়ে লিখেছেন- পুরাতন জেল কোডকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। জেলে কয়েদীদের জন্য শিল্পকলা ও শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাজতীদেরও যোগ্য শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের ইচ্ছা ও রুটিন মাফিক কাজ দিতে হবে। এখনকার বন্দিশালা শুধু একটা জাতির বোঝা ভারী করছে। এর সমাধান খুঁজতে হবে। [৪৪]

১লা এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখে প্রকাশিত "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার ভাষ্য-বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী ভারত তথা বাংলা শাসনের সুবিধার্থে ১৮৬৪ সনে জেল কোড নামীয় কালাকানুনের প্রবর্তন করে। তৎকালে ইংরেজ জেল কর্তৃপক্ষ জেল কোড অনুযায়ী ভারতীয় বন্দি ও এদেশের অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ চালিয়ে জেল প্রশাসন ঠিক রাখতো। জেল কোড কোন সাংবিধানিক আইন নয়। কারারক্ষীদের জোরে কথা বললে বা হাসলে চাকরি চলে যায়।

১৯৯৪ সনে অনুষ্ঠিত কারা কর্মকর্তা সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী বলেন[৪৫] "১৮৬৪ সালে প্রথম সংকলিত জেল কোডের সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৩৭ সালে করা হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথে কারাবন্দিদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আচরণের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্ধ শতাব্দীকাল পর্বে সর্বশেষ সংস্কারকৃত এই বিধিমালার সংস্কার কিংবা পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে"। ঐ সম্মেলনে মহা কারাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল হোসেন বলেন[৪৬] - কারা প্রশাসনের একমাত্র বিধিবদ্ধ আইন হলো "কারাবিধি"। এটা বৃটিশ সরকারের আমলে প্রণীত। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানে উপযোগিতা প্রায় হারাতে বসেছে।

জনাব আশরাফ কায়সার লিখেছেন-ঔপনিবেশিক আমলের জেল কোডের অনেক বিধি বিধানই একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের জন্য অমানবিক ও লজ্জার হলেও এখনও তা বলবৎ রয়েছে। [৪৭]

২৫/১০/৯৫ তারিখে প্রকাশিত "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামের ভাষ্য - আজ পর্যন্ত জেল কোডটি সংশোধন না করায় কারাবন্দিদের শাস্তি সর্বস্ব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা থেকে

---

[৪৩] **২৭.২.৯০ তারিখের "দৈনিক জনতা" পত্রিকা।**

[৪৪] **এ,এফ,এম আব্দুল জলিল, কারাগারের কাহিনী, ১৯৮৯, পৃঃ -১২২।**

[৪৫] **কারা কর্মকর্তা সম্মেলন/৯৪, পুস্তিকা, পৃঃ- ৩৮।**

[৪৬] **কার কর্মকর্তা সম্মেলন,/৯৪ পুস্তিকা, পৃ-২২।**

[৪৭] **আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন,১৯৯৫, পৃঃ-৩১।**

মুক্তি ঘটছে না। বন্দিদের উপর মানসিক নিপীড়ন ও সুযোগ-সুবিধা হ্রাস ঘটানোর প্রক্রিয়া বন্দিদের পরবর্তীতে আরও সহিংস, মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি ও প্রতিহিংসা উন্মত্ত হতে সাহায্য করছে। দৈহিক বন্দি দশায় মানসিক অবদমন প্রকৃতপক্ষে নীচু মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক শক্তি।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখে প্রকাশিত "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকার ভাষ্য - ব্রিটিশ সরকার তাদের ইচ্ছামত একটি পরাধীন দেশের কারাগারসমূহের প্রশাসন চালানোর জন্য জেল কোড বিধি প্রণয়ন করে। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এই কারাবিধি সম্পূর্ণ অযোগ্য। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম বলেন[৪৮] - ব্রিটিশ আমলে প্রণীত ঔপনিবেশিক আইন দিয়ে স্বাধীন দেশ চলতে পারে না। এ সব আইন প্রণীত হয়েছিল শাসন করার জন্য। স্বাবলম্বী হওয়া এবং সার্বিক উন্নয়ন এই আইন দিয়ে সম্ভব নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, জনাব বোরহান আহমেদ বলেন[৪৯] - "ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬৪ সালে প্রণীত ''জেল কোড'' অনুসারে আজও কারা প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে দু'বার দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি। তাদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের মানবাধিকারটুকুও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিগত ৫০ বছরে।''

বিশিষ্ট কলামিস্ট ও সাংবাদিক জনাব ইমতিয়াজ শামীম বলেন[৫০] - "ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য শুধু চোর-ডাকাত আর দুর্নীতি পরায়ণদের শাস্তি দেয়া ছিল না। ভারত উপমহাদেশে জেল কোড প্রণীত হওয়ার কয়েক বছর আগেই সংঘটিত হয়েছিল সিপাহী-জনতার মহাবিদ্রোহ। স্বাধীনতাকামী মানুষদের দমন করার মানসে জেলের মধ্যে নির্যাতন করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল ওই জেল কোড দিয়ে।'' ''একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঔপনিবেশিক শাসনামলের কারা প্রশাসনের আমুল পরিবর্তন ঘটাতে হবে; সংশোধন করতে হবে জেল বিষয়ক আইন ও বিধিমালা।''

জনাব আলতাফ পারভেজ লিখেছেন-লক্ষ্য করার বিষয় হলো ১৮৬৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণ ও বিভিন্ন সময় জেল কোডের মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছেন। উপনিবেশের জনগণের জন্য বৃটিশদের প্রবর্তিত জেল কোডের চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই ছিল দমনমূলক। লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে একাধিক দফায় স্বাধীন হওয়া এ অঞ্চলে ঐ জেল কোডই এখনও বহাল তবিয়তে চালু আছে।[৫১]

১৯৯৬ সনের ১৬ই ডিসেম্বরে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত কারা বিদ্রোহের ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেন[৫২]-"ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার্থে যে কারা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছিল, ভারত বিভাগ এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশেও ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে আসছে। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কারা প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এক্ষণে বিশেষ করে পর পর বেশ কিছু কারা বিদ্রোহের পরবর্তীকালে সমাজের বিবেকবান মানুষ মনে করে শতাব্দীর প্রচলিত কারা প্রশাসন অকার্যকর এবং নির্যাতনমূলক বিধানসমূহের পরিবর্তন সাধন করে আরও কার্যকর মানবাধিকার সম্মত আইন/বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।''

বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব নির্মল সেন বলেন[৫৩]-"আমি নতুন করে জেল সংস্কারের কথা লিখব না। লিখে লিখে কলম ভোঁতা হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেও জেল সংস্কারের নামে কমিটি বসে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। কোন সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি।''

---

[৪৮] ১/৫/৯৭ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকা।

[৪৯] ২৭/৭/৯৭ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[৫০] ০৯.০১.১৯৯৮ তারিখের ''দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকা।

[৫১] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃ-৪।

[৫২] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারা বিদ্রোহ, ২০০০, পৃ-১৬১।

[৫৩] ১৫/০১/৯৭ তারিখের 'দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকা।

২.৪ বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য শিক্ষাদান

বাংলাদেশের অপরাধ সমস্যা, অপরাধীদের সংশোধন, অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ ও বন্দি দর্শন এবং সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে বিদ্যাপীঠসমূহে ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই। ফলে অপরাধ সমস্যা ও অপরাধীদের সংশোধনের বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরাধ ও বন্দিদর্শন এবং আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির প্রচলন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের যুগপযোগী Penal Policy নেই। অপরাধীদের সংশোধনের অন্তরায়সমূহ খুঁজে বের করতে হবে এবং জটিল সমস্যার সমাধান, কারাসংস্কার ও সংশোধন পদ্ধতির উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে এসব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২.৫ কারাসংস্কারে সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের কারাগারে বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও সৃষ্ট বহুবিধ সমস্যা নিরসন কল্পে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ৯ বার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু আজঅবধি কোন উদ্যোগই বাস্ত-বায়িত হয়নি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে তার সংগে সঙ্গতি রেখে কারা বিষয়ক আইন সংশোধন এবং কারা প্রশাসনের মৌলিক পরিবর্তন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

অপরাধীকে আটক রেখে বা কয়েদ করলেই অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারাবন্দিদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তাদের মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ নিশ্চিতের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের মনমানসিকতা সুস্থ রাখার জন্য আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। তাদের সাথে শাস্তিমূলক আচরণের পরিবর্তে নৈতিক ও সংশোধনমূলক আচরণ করতে হবে।

সমস্যার বেড়াজালে আবৃত বাংলাদেশের কারাপ্রশাসনকে নিষ্কৃতি দেয়া বা সংস্কারের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যতবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিন্তু কোন উদ্যোগই আলোর মুখ দেখেনি। ফলে কারাগারের সমস্যা ও দুর্নীতি গাণিতিক হারে বেড়েই চলেছে। কারাসংস্কারের জন্য বিভিন্ন ফোরামে দাবী করা হয়। মাঝে মধ্যে পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়। দু'একটি বাস্তব উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ফলাফল শূন্যের কোঠায়। কারা সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে চরম দুর্ভাগ্য হচ্ছে, ক্ষমতার বাইরে থাকার সময়ে যা বুঝেন, অনুভব করেন ও বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তা বেমালুম ভুলে যান। অপরদিকে ক্ষমতা হারানোর পরই রাজনৈতিক দল বুঝে ক্ষমতায় থাকাকালীন কি করেছিলেন অথবা কি করা উচিত ছিল।[৫৪]

প্রতি বছর কারা বিভাগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও অমানবিক ও নিপীড়নমূলক কারাবিধির কারণে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ অপরাধী বানানোর কারখানায় পরিণত হয়েছে। এ কারণে ব্যয় সর্বস্ব কারা বিভাগকে জাতির বোঝা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। সরকারের Penal Policy বক্তৃতা সর্বস্ব। ফলাফল শূন্যের কোঠায়। আমরা অপরাধমুক্ত পরিচ্ছন্ন সমাজ চাই। অপরাধীরা সু-নাগরিক হিসেবে সমাজে ফিরে আসুক এই আমাদের কাম্য।

সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে আমাদের দেশের কারা ব্যবস্থাকে শাস্তিদানের পদ্ধতি থেকে আধুনিক সংশোধনের পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে। এ বিষয়ে বিচারপতি এফ, কে, এম, এ মুনীম কমিশনের রিপোর্টসহ অন্যান্য তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং বিশেষজ্ঞ গুণিজনদের মতামতের ভিত্তিতে যুগোপযোগী কারাবিধি প্রণয়ন করা বাস্তবতার তাগিদে জরুরী হয়ে পড়েছে।

---

[৫৪] **২৬/১২/৯৩ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।**

২.৬ জাতীয় প্রিজন কাউন্সিল গঠন

কারাসংস্কার ও সমস্যা দূরীভূত করার দাবী এখন সর্বসাধারণের। কাজেই কারাসংস্কার এবং কারাপ্রশাসনকে গতিশীল করার নিমিত্তে স্থায়ীভাবে জাতীয় প্রিজন কাউন্সিল গঠন করলে কারাপ্রশাসনের সকল স্তরের দুর্নীতি অনেকটা কমে আসতে পারে বলে আশা করা যায়।

২.৭ সারকথা

সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের প্রকৃতি ও ধরন পাল্টে গেছে। বর্তমানে প্রচলিত কারাবিধির আওতায় অপরাধীদের সংশোধন ও অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বন্দিদের শাস্তি প্রদানের মনোভাব নিয়ে এই কারাবিধি প্রণীত হয়েছিল। বর্তমানে এই নিপীড়নমূলক সেকেলে আইনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এসব কালাকানুনই দেশের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। সেই সাথে মানবিক মূল্যবোধ নিশ্চিতকরণসহ কারাসংস্কার, জাতীয় প্রিজন কাউন্সিল গঠন ও যুগোপযোগী কারা বিধি প্রণয়ন করতে পারলেই এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হবে।

অধ্যায়-৩ঃ কারাগারের অবকাঠামো

৩.১ কারাবন্দিদের শ্রেণী বিন্যাস

(3.1 CLASSIFICATION OF PRISONERS)

৩.১.১ কারাবন্দি কাকে বলে

কারাবন্দি বলতে সাধারণ অর্থে যারা কারাগারে আটক বা আবদ্ধ থাকে সেই সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেই বুঝায়। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মামলায় জড়িত হয়ে বা বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্ন অবস্থাতে মানুষ কারা বন্দি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে যে সকল মানুষ আটক থাকে; প্রচলিত আইনানুসারে তাদেরকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১। বিচারাধীন বন্দি বা হাজতী (Undertrial Prisoner)
২। সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বা কয়েদী (Convicted Prisoner)
৩। ডিটেন্যু বন্দি (Detenue Prisoner)
৪। দেওয়ানী বন্দি (Civil Prisoner)
৫। নিরাপদ হেফাজতী বন্দি (Safe custody Prisoner)

৩.১.২ বিচারাধীন বন্দি বা হাজতী

কারাগারে আটক যে সকল বন্দির মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বা দায়রা আদালতে বিচারের কাজ চলছে বা বিচারের কাজ সমাধা হয়নি, এই সকল বন্দিকে বিচারাধীন বন্দি বা হাজতী বলা হয়। হাজতী বন্দিদের সামাজিক মর্যাদাগত দিক থেকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ-

ক) ১ম শ্রেণীর হাজতী বন্দি এবং
খ) ২য় শ্রেণীর হাজতী বন্দি।

হাজতী বন্দিদের সামাজিক মর্যাদা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট আদালত বা জেলা প্রশাসক ১ম শ্রেণীর মর্যাদা উল্লেখ করে আদেশ দিয়ে থাকেন। ২য় শ্রেণী বা সাধারণ হাজতী বন্দিদের থেকে ১ম শ্রেণীর হাজতী বন্দিদের বাসস্থান, খাওয়া ও জীবনযাত্রার ধরন উন্নতমানের হয়ে থাকে। ১৬ বছরের নীচে বয়স্কদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক হাজতী হিসেবে ধরা হয়। পুরু ষ কিংবা মহিলা হাজতী হিসেবে কারাগারে বন্দি হতে পারে, তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে কঠোর নিরাপত্তাসহ পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে প্রতিটি কারাগারেই।

৩.১.৩ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বা কয়েদী

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে পাঁচ ধরনের শাস্তি বা সাজা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন-

ক) সশ্রম কারাদণ্ড।
খ) বিনাশ্রম কারাদণ্ড।
গ) জরিমানা অথবা অনাদায়ে কারাদণ্ড।
ঘ) মৃত্যুদণ্ড।
ঙ) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

যে সকল ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্তে সাজা বা শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আটক থাকে, তাদেরকে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বা কয়েদী বলে। এই সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সাজার প্রকার ভেদে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়-

- সশ্রম কয়েদী।
- বিনাশ্রম কয়েদী।
- মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বা ফাঁসির আসামী।

সশ্রম কয়েদীদের কারাগারে অবস্থানকালে বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়। এর জন্য কোন পারিশ্রমিক দেয়ার নিয়ম বর্তমানে আমাদের দেশে নেই। বিনাশ্রম সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের কোন কাজ করতে হয় না। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা ফাঁসির আসামীদের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আপিল শেষে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ পাওয়ার পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে থাকে। কয়েদী বন্দিদের সামাজিক মর্যাদাগত দিক থেকে তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনঃ-

১. ১ম শ্রেণীর কয়েদী ।
২. ২য় শ্রেণীর কয়েদী।
৩. ৩য় শ্রেণীর কয়েদী।

কয়েদী বন্দিদের সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করে সাজাদানকারী সংশ্লিষ্ট আদালতের সুপারিশক্রমে সরকার **১**ম বা **২**য় শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে থাকে। আর যে সকল কয়েদী বন্দিদের **১**ম ও **২**য় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা হয় না, তাদেরকে **৩**য় শ্রেণীর বা সাধারণ কয়েদী বলা হয়। যে সকল কয়েদীর বয়স **১৬** বছরের নীচে তাদেরকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েদী বলা হয়। পুরুষ বা মহিলা উভয়েই সাজা প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আটক বা বন্দি হতে পারে।

৩.১.৪ ডিটেন্যু বন্দি

১৯৭৪ সনের **১৪**নং বিশেষ ক্ষমতা আইনে যে সকল ব্যক্তি আটকাদেশ প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আটক থাকে, তাদেরকে ডিটেন্যু বন্দি বলা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের বিশেষ শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথমে **৩০** দিনের আটকাদেশ দিয়ে থাকেন। এই **৩০** দিনের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এক অথবা দুই বা তিন মাসের বা যে কোন মেয়াদের আটকাদেশ দিয়ে থাকেন। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে যে কোন সময় মুক্তি পেতে পারে। এদেরকে বিনা বিচারে আটক বন্দিও বলা যেতে পারে। হাজতী বন্দিদের মতই ডিটেন্যু বন্দিদের সামাজিক মর্যাদাগত দিক থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশে **১**ম ও **২**য় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

৩.১.৫ দেওয়ানী বন্দি

দেওয়ানী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যে সকল ব্যক্তি সাজা ভোগের জন্য কারাগারে আটক থাকে তাদেরকে দেওয়ানী বন্দি বলা হয়। দেওয়ানী বন্দিদের থাকা খাওয়ার খরচ কারা বিভাগ বহন করে না। সাধারণতঃ পার্টি তাদের খরচ বহন করে থাকে। দেওয়ানী বন্দি কারাগারে পাঠানোর আগেই কারা কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা খাওয়া ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত খরচের হিসাব চাওয়া হয়। হিসাবমত প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার পর কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের দেওয়ানী বন্দিকে কারাগারে পাঠানো হয়। আদালতের সুপারিশক্রমে সরকারী আদেশ বলে এই সমস্ত দেওয়ানী বন্দি অন্যান্য বন্দিদের মত শ্রেণীগত মর্যাদা লাভ করতে পারে।

৩.১.৬ নিরাপদ হেফাজতী বন্দি

কোন কারণে কোন ব্যক্তি অবস্থার শিকার হয়ে (victim) বা জীবনের নিরাপত্তাজনিত কারণে বা বিচার সংক্রান্ত কারণে (JUDICIAL CUSTODY) কারাগারে আটক থাকলে, তাকে নিরাপদ হেফাজতী বন্দি বলা যেতে পারে। যে সব বন্দিকে আদালত কর্তৃক কারাগারে পাঠানোর সময় ঐ বন্দির পরোয়ানায় (WARRANT) "VICTIM" বা " JUDICIAL CUSTODY" লেখা হয়; প্রকৃত পক্ষে তাদেরকেই নিরাপদ হেফাজতী বন্দি বলা হয়। নিরাপদ হেফাজতী বন্দিদের হাজতী বন্দিদেরমতই সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ একই সাথে বসবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কারা পরিচালনা আইনে নিরাপদ হেফাজতী বন্দি সম্পর্কে কোন বিধি বিধান নেই। ফলে কারাকর্তৃপক্ষের মনগড়া আইনে তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়ে থাকে। তাদের দেখা সাক্ষাৎ, আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মুক্তির বেলায় কারা কর্তৃপক্ষ আদালতের হুকুম মেনে চলে। অনেক ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ হেফাজতীদের মুক্তির সময় জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার বহু নজির রয়েছে।

কেস-২

<u>কারাজীবন ধর্ষণের চেয়ে অপমানের, কষ্টের</u>

শ্রীমতি ভারতী রাণী, গ্রাম-গোবিন্দপুর, থানা ও জেলা- দিনাজপুর। আমি ধর্ষিতা। দুর্বৃত্ত স্বামীর সহযোগিতায় গণ-ধর্ষণের শিকার হই। বিচার চাইতে গিয়ে প্রায় ৪ বছর দিনাজপুর জেলে নিরাপদ হেফাজতী হিসেবে বন্দি জীবন কাটাতে হয় আমাকে। এই দীর্ঘ কারাবাসের প্রায় প্রতিটি দিনই আমার মনে হয়েছে আমি পালিয়ে যাই। মনে হয়েছে আমি বিচারপ্রার্থী নই- সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। অসহ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে আমার মনে হয়েছে এ অবস্থা ধর্ষণের চাইতেও বেশী অপমানের এবং কষ্টের।

উৎস ঃ- ০৫/০৪/৯৯ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা।

কারাগারে নিরাপত্তা হেফাজত বলতে আলাদা কোন ব্যবস্থা, ওয়ার্ড বা সেল নেই। জেল কোড অনুযায়ী তাদের রাখারও কোন বিধান নেই। আদালতের আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে কারাগারে রাখা হচ্ছে। জেল কোডে নিরাপত্তা হেফাজতের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও বহু পূর্ব থেকেই নিরাপত্তা হেফাজতের প্রচলন আছে। ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখ না থাকলেও আদালত তার বিচারিক এখতিয়ার (Judicial Discreation) বলে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে কার্যতঃ জেলে রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। ফলে এসব নারী-শিশুরা সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দিদের সঙ্গে জেলে সহ-অবস্থান করছে। নাবালক শিশু-কিশোররা সাজাপ্রাপ্ত দাগী, কুখ্যাত অপরাধীদের সাথে সহ-অবস্থানের কারণে সব ধরনের অপরাধের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। ফলে বাড়ছে অপরাধ আর অপরাধীর সংখ্যা, কলুষিত হচ্ছে সমাজ। নিরাপত্তা হেফাজত বর্তমানে রীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে বিদ্যমান নিরাপত্তা হেফাজতের আইনগত ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।[৫৫]

৩.১.৭ প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের বেশ কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পরে বৃটিশ উপনিবেশের প্রণীত আদেশ, নির্দেশ, পরিপত্র ও সর্বশেষ ১৮৯৪ সনের আইন অনুসারে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ এখনো পরিচালিত হচ্ছে। ঐ আইনের আওতায় সামন্তীয় ধ্যান-ধারণায় বন্দিদের এই শ্রেণী বিন্যাসের ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই নিরপরাধী, লঘু অপরাধী ও কিশোর বন্দিরা একই ঘরে পাশাপাশিভাবে অভ্যাসগত, মারাত্মক ও ঘাঘু অপরাধীদের সাথে বসবাস করছে। এর ফলে তাদের সাথে নিত্য চলাফেরা, নাওয়া-খাওয়া ও গল্প-গুজবের মাধ্যমে গড়ে উঠছে আত্মীক সখ্যতা। ফলশ্রুতিতে অভ্যাসগত, মারাত্মক ও ঘাঘু অপরাধীদের গল্প-গুজব ও আচরণের প্রভাবে নিরপরাধী, লঘু অপরাধী এবং কিশোরদের মাঝে মারাত্মক মারাত্মক অপরাধ সংঘটনের মানসিকতা তৈরী হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই সব ধরনের বন্দি একই পরিবেশে এক সংগে অবস্থান করছে। বন্দিরা কারাগারে অপরাধ করে আসুক আর বিনা অপরাধেই আসুক, সাধারণতঃ বন্দিদের নিশ্চিত অপরাধী বলেই ধরে নেয়ার মানসিকতা কারাকর্তৃপক্ষের আছে। যদিও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেনা যে, কারাগারে সবাই অপরাধ করে আসে। অথবা একথাও বলা যাবেনা যে, বিভিন্ন আদালতে যাদের সাজা হয়, তারা সবাই প্রকৃত পক্ষে অপরাধী। আবার এ কথাও বলা যাবেনা যে, যারা বিভিন্ন আদালতের রায়ে খালাস পায়, তারা সবাই নির্দোষী।[৫৬] তাই নিরপরাধী , লঘু অপরাধী ও কিশোর বন্দিরা একই ঘরে পাশাপাশিভাবে অভ্যাসগত, মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধীদের সাথে বসবাস করার কারণে আমরা যে উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে বন্দিদের কারাগারে পাঠাচ্ছি ; তা ফলপ্রসূ না হয়ে উল্টো আমাদের সমাজের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। জেল যদি নাও হয় বিচারের জন্য ন্যূনতম দু'তিন বছর এমনিভাবে বিচারাধীন আসামী হিসেবে এই পরিবেশে কাটাবার পর জেল থেকে বেরিয়ে ওকি আগের মত সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে?[৫৭]

মান্ধাতা আমলে প্রণীত আইন অনুসারে সব ধরনের বন্দিরা কারাগারে একই সংগে বসবাসের কারণে ''রাজনীতি'' মাস্তানচক্র ও অন্যান্য অপরাধের নতুন নতুন মেরুকরণ ঘটে জেলে। জেলে রয়েছে আলাদা পরিভাষা আর বিচিত্র সব নিয়ম-কানুন। বন্দিদের অবসর আলোচনা কিংবা আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুই বাইরের জীবনের মত নয়, ভয়ংকর সব অপরাধীর পাশাপাশি জেলের চার দেয়ালের ভেতর বাস করে বিনা বিচারে আটক নিরীহ বন্দিটিও। এখানকার সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় প্রচলিত ব্যবস্থার উল্টো পথে।[৫৮] জেলের ভেতর বিভিন্ন ধরনের অপরাধী একসংগে থাকায় অপরাধীরা আরো "স্কিল্ড'' হয়। ডাকাতির ক্ষেত্রে আন্তঃজেলা সংযোগ হয়।[৫৯] রবার্ট-ই-শেরউড বলেছেন, সঙ্গী-সাথীরা খারাপ হলে অপরাধ প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

[৫৫] ৭/০৪/৯৭ তারিখের "দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকা।
[৫৬] কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪, পৃঃ-১০৩।
[৫৭] মতিয়া চৌধুরী, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃঃ- ৫৩।
[৫৮] আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫ পৃঃ-৩০।
[৫৯] আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫, পঃ-৪৫।

কারাগারগুলো বড় অপরাধী তৈরীর কারখানা হিসেবে কাজ করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কোন সভ্য দেশে কাম্য নয়।[৬০] বর্তমান যুগে কারাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীকে তার অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করা; কিন্তু কারাগারই যদি অপরাধীকে আরও বেশী অপরাধী করার জন্য তৈরী করে তাহলে সেই কারাব্যবস্থা দেশের আইন- শৃংখলা পরিস্থিতির উপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বস্তুতঃ বাংলাদেশের কারাগারগুলো অপরাধীদের সংশোধনের কেন্দ্র না হয়ে অপরাধীকে আরও বেশী পাকা অপরাধী তৈরীর কারখানা হিসেবেই কাজ করে চলেছে অবিরাম।

তৎকালীন বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কারাগার প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভের পর হতেই বন্দিদের বিদ্যমান শ্রেণী বিন্যাসের কারণেই সব ধরনের বন্দি একই পরিবেশে এক সংগে বসবাসের ফলে কারাগারের ভেতরেই অধিকতর অপরাধ প্রবণ পরিবেশ দীর্ঘদিনে তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছে। "যে লক্ষ্যে অপরাধী বা অভিযুক্তদের জেলখানায় পাঠানো হয় সে লক্ষ্য পূরণ তো হচ্ছেই না বরং জেলখানাগুলো নতুন অপরাধ সংঘটনের প্রশিক্ষণালয়ে পরিণত হয়েছে। অনেক অপরাধীই ক্ষুদ্র অপরাধে স্বল্পমেয়াদী সাজা ভোগ করতে জেলখানায় গিয়ে বড় অপরাধী হয়ে বেরিয়ে আসছে। সাজা খাটার বিষয়টিও হয়ে পড়েছে প্রশ্ন সাপেক্ষ। জেলখানার অভ্যন্তরে অপরাধীদের পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হওয়ার আর কোন অবকাশ এখন নেই। কারণ জেলখানার ভেতরেই অধিকতর অপরাধ প্রবণ পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে। নিরাপত্তার কারণে যে সব নারী-শিশুকে জেলখানায় রাখা হয়েছে তারা জড়িয়ে পড়ছে অপরাধে।[৬১]

সবধরনের বন্দি একই সঙ্গে বসবাসের ফলে সামান্য প্রয়োজনেও একজন নিরপরাধী বা লঘু অপরাধীকে বড় বড় ঘাঘু অপরাধী বা মারাত্মক অপরাধীদের একান্ত শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে একজন সামান্য অপরাধী তাদের সংশ্রবে থেকে ঘাঘু অপরাধীর মানসিকতা নিয়ে বেরিয়ে আসে। এরকম বহু নজীর আছে। "জেল হচ্ছে অপরাধ রপ্ত করার জন্য। ওখানে অপরাধের প্রশিক্ষণ হয়। জেল হয়ে উঠেছে চোর-ডাকাত বানানোর কারখানা। ভয়ংকর অপরাধী, অপরাধহীন ব্যক্তি এবং অল্প বয়সের বা চারা সবাই একসংগে থাকছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই জেল আর সংশোধনাগার থাকছে না।" [৬২]

বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক হীনমন্যতা, প্রতিহিংসা, দীনতা ও প্রবল দুর্নীতির কারণে সংঘটিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অপরাধ প্রতিরোধের নামে তাদের পাঠানো হচ্ছে কারাগারে। আর তারা কারাগারে বিভিন্ন ঘাঘু অপরাধীর সংস্পর্শে থেকে স্কিল্ড হয়ে ফিরে আসছে আবার সমাজে। অপরাধ যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, মানুষ সেখানে নিরাপদ নয়। মানুষ চায় অপরাধমুক্ত সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু বাংলাদেশের কারা বিভাগ কি পারছে অপরাধীদের সংশোধন করে সমাজে ফিরিয়ে দিতে? কাজেই অপরাধীদের সংশোধন বিষয়ে সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন/সংস্কার এবং যোগ্য প্রশাসক ও স্বচ্ছ প্রশাসনের অভাবে কারা বিভাগ কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না।

৩.১.৮ প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসে অপরাধ বিজ্ঞানীদের মন্তব্য

সব রকম বন্দিদের একই সংগে অবস্থানের কারণে সৃষ্ট সমস্যাদি উপলব্ধি করে সমাজবিজ্ঞানী শামসুজ্জামান খান বলেন-সকল রকম ও সকল বয়সের অপরাধীদের একই সঙ্গে রাখার ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। যথা, পাকা অপরাধীরা নতুনদেরকেও অপরাধের অন্ধি-সন্ধি সম্বন্ধে এমন ওয়াকেবহাল করে দেয় যে, তারাও বাইরে এসে পুনরায় গুরুতর অপরাধ করে। আসলে জেলের পরিবেশ অপরাধীকে জন্ম অপরাধী করে তোলে।[৬৩]

অপরাধী, নিরপরাধী, লঘু অপরাধী ও সব ধরনের বন্দিদের এক সঙ্গে রাখায় উদ্ভুত সমস্যা ও জটিলতার বিষয়ে আইন বিজ্ঞানী বোরহান উদ্দীন খান বলেন-অধিকন্তু যে সব যথার্থ অপরাধী কারাগার বা সংশোধনমূলক স্কুলে শাস্তি ভোগ করে, তারা কারাগার এবং সংশোধনমূলক স্কুলের নানা ধরনের অপরাধীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। এতে শাস্তি ভোগের ফলে অথবা চারিত্রিক সংশোধনীর ফলে ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস না পেয়ে বরং বহুগুণে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। পক্ষান্তরে, এমন ঘটনাও বিচিত্র নয় যে, অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য সন্দেহমূলকভাবে

---

[৬০] ২২/১২/৯৬ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[৬১] ৩০.১২.৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[৬২] আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫, পৃঃ-৪৪।

[৬৩] সামসুজ্জামান খান, উচ্চতর সমাজ কল্যাণ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ-১৯৩।

অভিযুক্ত করা হয় এবং তাকে সাময়িকভাবে কারাগারে রাখা হয়। এমতাবস্থায় প্রকৃত নিরপরাধী ব্যক্তিটি কারাগারের অন্যান্য অপরাধী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে অথবা নেহায়েত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে অপরাধে লিপ্ত হতে পারে।[৬৪]

প্রাচীন বা সেকেলে ধ্যান-ধারণা বাদ দিয়ে বর্তমান যুগোপযোগীভাবে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে অপরাধ বিজ্ঞানী Sir Lionel Fox বলেন[৬৫] আধুনিক সংশোধনী ব্যবস্থায় অপরাধীদের ছয়টি বর্গে বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকটির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে অপরাধ পুনরাবৃত্তির সমস্যা লাঘব হতে পারে।

১) সাজাপ্রাপ্ত নিরপরাধী (Innocent Convict)
২) সম্পূর্ণ বিচার বুদ্ধিহীন অপরাধী (Insane Criminal)
৩) ঘটনাচক্রে বা পরিবেশ বিচারে অপরাধী (Criminal by Accident)
৪) অনিয়মিত অপরাধী (Occasional Criminal)
৫) নির্মম বা কঠিন অপরাধী (Hardened Criminal)
৬) হোয়াইট কলার অপরাধী (White Collar Criminal)

৩.১.৯ বন্দি আগমন ও মুক্তির পরিসংখ্যান

সরেজমিনে ৫টি কারাগারে জরিপ চালিয়ে সকল প্রকার বন্দি আগমন ও মুক্তির যে তথ্য পাওয়া গেছে তার পরিসংখ্যান ১নং সারণীতে দেখানো হলোঃ-

১ নং সারণী

বন্দি আগমন ও মুক্তির বছর ভিত্তিক হিসাব

কারাগারের নাম	ইংরেজী সন	সারা বছরে আগমন	সারা বছরে মুক্তি
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	পূর্ব বছরের জের	২৮৫৪ জন	
	১৯৯৩	৫৯১৬ জন	৬০৪৩ জন
	১৯৯৪	৫৯৭১ জন	৫৮১৪ জন
	১৯৯৫	৬২০৪ জন	৬৪৬১ জন
	১৯৯৬	৬১৯৯ জন	৬২১২ জন
	১৯৯৭	৬৬৬১ জন	৬৬৬১ জন
	১৯৯৮	৬৮৭৬ জন	৬৭৪৫ জন
	১৯৯৯	৮৫২৫ জন	৮২৮৪ জন
	২০০০	৯০৩৪ জন	৯০১১ জন
	৮ বছরে সর্বমোট =	৫৮২৪০ জন	৫৫২৩১ জন
কারাগারের নাম	ইংরেজী সন	সারা বছরে আগমন	সারা বছরে মুক্তি
নওগাঁ জেলা কারাগার	পূর্ব বছরের জের	৪২৭ জন	
	১৯৯৩	৩৩৮৪ জন	৩৩৯৮ জন
	১৯৯৪	৩৩০৮ জন	৩২৬১ জন
	১৯৯৫	২৮৪১ জন	২৭১৯ জন
	১৯৯৬	৩৩৪৮ জন	৩৪৮৩ জন
	১৯৯৭	৩০৮৪ জন	৩০৬৩ জন
	১৯৯৮	৩৯৫৭ জন	৩৮০৯ জন
	১৯৯৯	৪৪০১ জন	৪১৬৮ জন
	২০০০	৪৬২০ জন	৪৬৫৪ জন
	৮ বছরে সর্বমোট =	২৯৭৭০ জন	২৮৫৫৫ জন

[৬৪] বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫, পৃঃ-১৭০।
[৬৫] বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫, পৃ-২২৯।

	পূর্ব বছরের জের	৩১০ জন	
ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১৯৯৩	২৫৮৭ জন	২৬১৪ জন
	১৯৯৪	২০৮৩ জন	২০০২ জন
	১৯৯৫	১৮৫২ জন	১৯০১ জন
	১৯৯৬	১৫৯৯ জন	১৭০১ জন
	১৯৯৭	১৫৪৪ জন	১৫৯০ জন
	১৯৯৮	১৬৭৬ জন	১৬৫৭ জন
	১৯৯৯	১৬৩৫ জন	১৫৮৩ জন
	২০০০	১৫০৪ জন	১৪৮২ জন
	৮ বছরে সর্বমোট =	১৪৭৯০ জন	১৪৫৩০ জন
	পূর্ব বছরের জের	১৯২ জন	
নাটোর জেলা কারাগার	১৯৯৩	২১৪৭ জন	২১২২ জন
	১৯৯৪	২১২১ জন	২১৩৫ জন
	১৯৯৫	২১৯৮ জন	২২১৬ জন
	১৯৯৬	২৬০৮ জন	২৫৭৪ জন
	১৯৯৭	২৭৩৭ জন	২৮০১ জন
	১৯৯৮	২৩৭৩ জন	২৩৪৩ জন
	১৯৯৯	২৮০০ জন	২৭৭০ জন
	২০০০	২৯৩৭ জন	২৯২৫ জন
	৮ বছরে সর্বমোট =	২০১১৩ জন	১৯৮৮৬ জন
কারাগারের নাম	ইংরেজী সন	সারা বছরে আগমন	সারা বছরে মুক্তি
	পূর্ব বছরের জের	৭৯০ জন	
বগুড়া জেলা কারাগার	১৯৯৩	৫৪১০ জন	৫৪৬২ জন
	১৯৯৪	৪৯৯৯ জন	৪৯৪৬ জন
	১৯৯৫	৫৬০৫ জন	৫৫৯০ জন
	১৯৯৬	৬৬০৯ জন	৬৫১০ জন
	১৯৯৭	৫৮২৭ জন	৫৯৯৪ জন
	১৯৯৮	৫৮৭৫ জন	৫২০২ জন
	১৯৯৯	৬৮৩৫ জন	৬৪৭৫ জন
	২০০০	৬৮৮৮ জন	৬৯৬৯ জন
	৮ বছরে সর্বমোট =	৪৮৮৩৮ জন	৪৭১৪৮ জন

উপরে বর্ণিত ৫টি কারাগারে বিগত ৮ বছরে বন্দি আগমন ও মুক্তির সর্বমোট সংখ্যা ও প্রতিদিনের গড় সংখ্যা ২ নং সারণীতে দেখানো হলোঃ-

২ নং সারণী

বন্দি আগমন ও মুক্তির প্রতিদিনের গড় হিসাব

কারাগারের নাম	গত ৮ বছরে বন্দি আগমনের মোট সংখ্যা	গত ৮ বছরে প্রতিদিন গড়ে বন্দি আগমনের সংখ্যা	গত ৮ বছরে বন্দি মুক্তির মোট সংখ্যা	গত ৮ বছরে প্রতিদিন গড়ে বন্দি মুক্তির সংখ্যা
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৫৮২৪০ জন	১৯.৯৪৫	৫৫২৩১ জন	১৮.৯১৫
নওগাঁ জেলা কারাগার	২৯৩৭০ জন	১০.০৫৮	২৮৫৫৫ জন	৯.৭৭৯
ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১৪৭৯০ জন	৫.০৬৫	১৪৫৩০ জন	৪.৯৭৬
নাটোর জেলা কারাগার	২০১১৩ জন	৬.৮৮৮	১৯৮৮৬ জন	৬.৮১০
বগুড়া জেলা কারাগার	৪৮৮৩৮ জন	১৬.৭২৫	৪৭১৪৮ জন	১৬.১৪৭
সর্বমোট =	১৭১৩৫১ জন	৫৮.৬৮১	১৬৫৩৫০ জন	৫৬.৬২৭

উপরিউক্ত ২নং সারণীর তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিগত ৮ বছরে ঐ ৫টি কারাগারে গড়ে প্রতিদিন ৫৮.৬৮১ জন বন্দি আগমন করেছে এবং গড়ে ৫৬.৬২৭ জন বন্দি মুক্তি পেয়েছে। বাংলাদেশে ৮০টি কারাগারের মধ্যে বর্তমানে ৬৩টি কারাগার চালু রয়েছে। এই হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে,

৫ টি কারাগারে গড়ে প্রতিদিন আগমন করছে ৫৮.৬৮১ জন
তাহলে ১ টি ” ” ” ” ” ৫৮.৬৮১÷৫=১১.৭৩৬ জন
সুতরাং ৬৩টি ” ” ” ” " ১১.৭৩৬×৬৩=৭৩৯.৩৬৮ জন
কাজেই ৬৩টি ” ” ১ বছরে " ৩৯.৩৬৮×৩৬৫=২,৬৯,৮৬৯.৩২০ জন
অর্থাৎ এক বছরে গড়ে ২,৬৯,৮৬৮ জন বাংলাদেশের কারাগারে আগমন করে।
অপরপক্ষে -
ঐ ৫ টি কারাগারে গড়ে প্রতিদিন মুক্তি পাচ্ছে - ৫৬.৬২৭ জন
তাহলে ১ টি ” ” ” ” ” ৫৬.৬২৭÷৫=১১.৩২৫ জন
সুতরাং ৬৩টি ” ” ” ” ”১১.৩২৫×৬৩=৭১৩.৪৭৫ জন
কাজেই ৬৩টি ” ” এক বছরে ”৭১৩.৪৭৫×৩৬৫=২,৬০,৪১৮.৩৭৫ জন

অর্থাৎ এক বছরে গড়ে ২,৬০,৪১৮ জন বন্দি বাংলাদেশের কারাগার থেকে বিভিন্ন কারণে মুক্তিলাভ করছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাভাবিকভাবে অপরাধ সংঘটনের কায়দা কৌশল রপ্ত করে জটিল ও মারাত্মক অপরাধ সংঘটনের দক্ষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের সমাজে ফিরে আসছে। ফলে দেশে নিত্য নতুন অপরাধ সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েই চলেছে। সামন্তীয় ধ্যান-ধারণায় প্রণীত এবং বর্তমান যুগের অনুপযোগী নিয়মে বন্দিদের শ্রেণী বিন্যাসের ব্যবস্থা চালু থাকায় নিম্নবর্ণিত কারণে আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবন নির্বাহে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, ধর্ষণ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- কারাগার অপরাধীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।[৬৬]
- কারাগার অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক।
- কারাগার অপরাধীদের সম্মেলন কেন্দ্র।

৩.১.১০ আন্তর্জাতিক নীতিমালা

বিভিন্ন দেশের কারাগারে অপরাধীদের সাথে সহঅবস্থানের ফলে যাতে অন্যান্য বন্দিদের ওপর অপরাধীর প্রভাব না পড়ে এবং আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি অপরাধীদের ওপর প্রয়োগের ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৫৫ সালের ৩০শে আগস্ট জাতিসংঘের প্রথম কংগ্রেসে বন্দিদের প্রতি আচরণ বিষয়ক Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners[67] নামে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুমোদিত হয়। এই নীতিমালা বা আইনের ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ও ৮৬ ধারা মোতাবেক অপরাধীর পূর্ব তথ্য, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত চাহিদা ও অপরাধের ধরন অনুসারে বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে বা সম্পূর্ণরূপে পৃথক ওয়ার্ডে রাখার বিধান রয়েছে। যাতে এক শ্রেণীর বন্দির সাথে অন্য শ্রেণীর বন্দির যোগাযোগ বা দেখা না হয়(পরিশিষ্ট -ক)

৩.১.১১ অন্যান্য দেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের শ্রেণীবিন্যাস

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিদের বয়স, অপরাধের ধরন ও পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে তাদের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। এই আধুনিক শ্রেণী অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।[৬৮]

---

[৬৬] N.J. Demerath III and Gerald Marwell, Sociology, 1975, p-343.
অথবা,
নাজমুল করিম, সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ-২৩৫।

[৬৭] council of Europe, committee of ministers, Resolution (73)5, p-11/12/14.

[৬৮] New standard Encyclopedia, Vol-II, Chicago, USA, p-584.

পশ্চিম জার্মানীর পেনিটেনশিয়ারীগুলোতে বিচারাধীন বন্দি ও ১৪ বছর বয়সের নিম্ন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের রাখা হয় না। তাদের জন্য আলাদা কারাগারের ব্যবস্থা আছে।[৬৯]

যুগোশ্লাভিয়ার নিয়োগপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী মনোচিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অপরাধের গুরুত্ব ও ধরন অনুসারে বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।[৭০]

শ্রীলংকায় সাজাপ্রাপ্ত প্রথম অপরাধীদের পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা আছে।[৭১] মালয়েশিয়ায় বন্দিদের বয়স, অপরাধের প্রকৃতি, সাজার মেয়াদ ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করে শ্রেণী অনুযায়ী তাদের পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়ঃ-[১৮]

ক) যুবক শ্রেণীর বন্দি
খ) স্টার শ্রেণীর বন্দি
গ) সাধারণ শ্রেণীর বন্দি
ঘ) বিচারাধীন বন্দি
ঙ) কিশোর বন্দি
চ) ডিটেন্যু
ছ) পোপোক (POPOC)[*] বন্দি।

কাউন্সিল অব ইউরোপ-এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কারাগারে আটক বন্দিদের প্রতি আচরণ বিষয়ে Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners Made By The Council Of Europe -এর নীতিমালার অনুসরণ করা হয় এবং ঐ নীতিমালার আলোকে যুক্তরাজ্যে বন্দি নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে বন্দিদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।[৭২]

জাতিসংঘের Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners-এর নীতিমালা অনুযায়ী সিংগাপুরে বন্দিদের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।[৭৩]

জাপানে বয়স, সেক্স, সাজার মেয়াদ, বিচারকালীন অবস্থান, অপরাধের ধরন, স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততা ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ঐ শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বন্দিদের রাখার জন্য জাপানে পৃথক পৃথক কারাগার আছে। বন্দিদের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাসের ফলে জাপানে অপরাধের হার অনেকটা কমে গেছে বলে জানা যায়।[৭৪]

হংকং-এ প্রশিক্ষিত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। বন্দিদের প্রথমেই অভ্যর্থনা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। তথায় ব্যক্তিচরিত্র, বয়স ও সেক্স অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করে সেই অনুসারে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়ে থাকে।[৭৫]

৩.১.১২ বন্দিদের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশেও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে কারাগারে বন্দি আগমনের পর আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্যাস করা উচিত।

৩.১.১৩ সারকথা

বাংলাদেশের কারা ব্যবস্থায় বন্দিদের প্রচলিত শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না। ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ কারা প্রশাসনে ব্যয় করেও আমাদের উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ সফল হচ্ছে না। অধিকন্তু বন্দিদের শ্রেণী বিন্যাসে

---

[৬৯] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-110/111.

[৭০] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-113.

[৭১] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-133.

[*] Public Order Prevention of Criminal.

[৭২] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-117/118.

[৭৩] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p- 140.

[৭৪] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-147.

[৭৫] Report of the Bangladesh Jails Reform Commission, 1980, Vol-II, p-153.

আধুনিকতার পরশ না লাগায় দিন দিন আমাদের সমাজে স্কিল্ড অপরাধীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। এর কারণে সমাজের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও বন্দিদের শ্রেণী বিন্যাসে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বন্দিদের শ্রেণী বিন্যাস করলে বিনা অপরাধে আটক বা লঘু অপরাধে আটক বন্দিরা দক্ষ বা ঘাঘু অপরাধীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবে না। ফলে কারাগারে অপরাধের মেরুকরণের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও কারাগারে আটক কিশোর বা যুবকদের সংশোধন হওয়ার পথ সুগম হবে এবং দেশে দক্ষ অপরাধীর সংখ্যা হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.২ কারাগারের শ্রেণী বিভাগ
(3.2 PATTERN OF PENAL INSTITUTION)

৩.২.১ প্রাসঙ্গিক কথা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর মোঘলদের রেখে যাওয়া কারাগারসমূহকে পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে। ঐ সময় অধিক নিরাপত্তা সম্বলিত বড় বড় কারাগারগুলোকে কেন্দ্রীয় কারাগার এবং জেলা সদরে অবস্থিত কারাগারগুলোকে জেলা কারাগার ও মহকুমা সদরে অবস্থিত কারাগারসমূহকে উপ-কারাগার হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পর্ব পাকিস্তান আমলে ঐ কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৮৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের মহকুমা সদরে অবস্থিত উপ- কারাগারসমূহকে জেলা কারাগার হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়াও বেশকিছু থানা সদরে থানা কারাগার এবং নতুন নতুন জেলা সদরে জেলা কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৯২ সনে তদানিন্তন এরশাদ সরকারের পতনের পর হতেই থানা কারাগারগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তখন হতেই থানা কারাগারগুলো শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও লোকবল নিয়ে কাজহীন বেকার সময় অতিবাহিত করছে। এই সব কারাগারে কোন বন্দি রাখা হচ্ছে না। ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত থানা কারাগারগুলো বিনা কাজে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের বোঝা টেনে চলেছে।

৩.২.২ কারাগারের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ

বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

Δ কেন্দ্রীয় কারাগার- ৯টি
Δ জেলা কারাগার- ৫৫টি
Δ থানা কারাগার- ১৬টি

আবার সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে কারাগার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের পর বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে কারাগারে আটক জনসংখ্যার ভিত্তিতে কারাগারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করার বিধান চালু করা হয়। ঐ নিয়ম এখনো বাংলাদেশে চালু আছে।

✯ প্রথম শ্রেণীর কারাগার।
✯ দ্বিতীয় শ্রেণীর কারাগার।
✯ তৃতীয় শ্রেণীর কারাগার।
✯ চতুর্থ শ্রেণীর কারাগার।

প্রথম শ্রেণীর কারাগারঃ- যে সমস্ত কারাগারে দৈনন্দিন গড়ে ৫০০ বা তদউর্ধ্ব বন্দি আটক থাকে তাকে প্রথম শ্রেণীর কারাগার বলা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কারাগারঃ- যে সমস্ত কারাগারে দৈনন্দিন গড়ে ৩০০ হতে ৪৯৯ জন পর্যন্ত বন্দি আটক থাকে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কারাগার বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর কারাগারঃ- যে সমস্ত কারাগারে দৈনন্দিন গড়ে ১৫০ হতে ২৯৯ জন পর্যন্ত বন্দি আটক থাকে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর কারাগার বলা হয়।

চতুর্থ শ্রেণীর কারাগারঃ- যে সমস্ত কারাগারে দৈনন্দিন গড়ে ৫০ হতে ১৫০ জন পর্যন্ত বন্দি আটক থাকে তাকে চতুর্থ শ্রেণীর কারাগার বলা যায়।

৩.২.৩ প্রচলিত পদ্ধতি

বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের আটক রাখা ছাড়া অপরাধীদের সংশোধন করার কোন পদ্ধতিই প্রচলিত নেই। তাই ঘাঘু অপরাধী, লঘু অপরাধী, বিচারাধীন বন্দি, রাজবন্দি, কিশোর বন্দি ও নিরাপদ হেফাজতি বন্দিদের একই কারাগারে রাখা হচ্ছে। ফলে অপরাধীরা আরো পাকা হচ্ছে; নিরপরাধ বন্দিরা অপরাধ সংঘটিত করার প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। আর বন্দিদের মুক্তির পর পুনর্বাসনের কোন

ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে সমাজে নিত্য নতুন কায়দায় অহরহ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেও অপরাধ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সর্বদাই সমাজে বিরাজ করছে অস্থিরতা ও আতংক।

আরো বিস্ময়ের কথা হলো যে, বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য কোন পৃথক কারাগার নেই। এই নারী প্রগতির যুগেও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা মহিলাদের মর্যাদা স্বরূপ একটি স্বতন্ত্র কারাগার নির্মাণ করতে পারিনি। আমাদের সামাজিক জীবনে নারীকে করুণার পাত্র হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা তৈরী হয়ে আছে। তাই সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষকে সমভাবে মূল্যায়ন করার মানসিকতা আমাদের নেই। আজ সামাজিক জীবনে নারীদের যে অবস্থা সেখানে কারাগারে নারী বন্দিদের জীবন কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের দেশের কারাগারে নারী বন্দিরা ছোট প্রকোষ্ঠে গাদাগাদি করে থাকে। গোসল ও খাবার পানি, চিকিৎসা এবং অন্যান্য কোন কিছুই ঠিক মত পায় না। এসব বিভিন্ন কারণে তারা চর্মরোগ থেকে শুরু করে বহুবিধ রোগে ভোগে। কোথাও নিস্তার নেই। কারাগারেও নারী-পুরুষে বৈষম্য। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দু'জনেই মহিলা। আরো আছেন মহিলা সংসদ সদস্যা ও বিভিন্ন ফোরামের নেত্রীরা। কিন্তু কারাবন্দি নারীদের উন্নয়নে এযাবৎ কেউই এগিয়ে আসেননি। কিন্তু ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম ইয়ারাদায় (Yarwada) মহিলাদের জন্য পৃথক কারাগার স্থাপিত হয়। [৭৬]

বাংলাদেশে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কারাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাবে এখনো তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইনের ধ্যান-ধারণা মাথায় নিয়ে এখনো কোন কোন জেলা সদরে নতুন নতুন কারাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

বাংলাদেশের কারাগারগুলো সে সময় এবং বর্তমানেও শাস্তি দানের (Punitive) প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এখানে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির ছোঁয়া এখনো লাগেনি। মূলতঃ এ কারাগারগুলোকে মানুষ বন্দি রাখার খোয়াড় ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। সব ধরনের বন্দি একই কারাগারে আটক থাকার কারণে একে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে অপরাধীরা সংশোধন না হয়ে আরো পাকা অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে এবং নিরপরাধীদের অপরাধ করার মানসিকতা গড়ে উঠছে। অপরদিকে শিশু-কিশোর ও নারীরা এদের প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক আমলের নিয়ম-নীতিতে পরিচালিত বাংলাদেশের কারাব্যবস্থা অপরাধী আশ্রয়ণ ও মানসিক নিপীড়নের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এক পক্ষ অপর পক্ষকে নাজেহাল ও শাস্তি দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলায় জড়িত করে কারাগারে পাঠাচ্ছে। ফলে সামাজিক জীবন নির্বাহে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের কারাগার অপরাধ দমন ও বন্দিদের মধ্যযুগীয় কায়দায় শাস্তি বিধানের অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এ যুগে দমননীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। দমননীতি বা অমানবিক পন্থায় কারাগার পরিচালনা করায় পৃথিবীর কোন দেশেই সুফল পাওয়া যায়নি। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দমননীতি পরিহার করে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতিতে কারাগার পরিচালনা করছে।

৩.২.৪ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কারাগারের শ্রেণী

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কারাগারকে "পেনিটেনশিয়ারী" বা "প্রিজন" এবং পৌরকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কারাগারকে "জেল" বলা হয়।[৭৭] পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কারাগারকে পেনিটেনশিয়ারী বা প্রিজন বা জেল নামে অভিহিত করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশে সার্বিক নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে কারাগারকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয় এবং সেই হিসেবেই কারাগার নির্মাণ করে বন্দিদের তথায় রাখা হয়।

১। অধিক নিরাপত্তা কারাগার (Maximum Security prison)

২। মধ্যম নিরাপত্তা কারাগার (Medium Security Prison)

৩। ন্যূনতম নিরাপত্তা কারাগার (Minimum Security Prison)

অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর মানসিক অবস্থা, বয়স ও লিংগ ইত্যাদি বিবেচনা করে শ্রেণী বিন্যাস পূর্বক তাদেরকে নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনায় আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে রাখার ব্যবস্থা সেথায়

---

[76] Prof. N.V. Paranjape, Criminology and penology, 10th Edition, p-264.

[77] New standared Encyclopedia, Vol-II, USA, P-583.

বিদ্যমান। কারণ ''কারাগার'' সমাজের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা। তাই তাদেরকে যেন সংশোধন করে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৩.২.৫ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শাস্তি কার্যকরের পন্থা

ফিলিপাইনসহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে আদালত কর্তৃক অপরাধীদের দেয়া দণ্ড বা শাস্তি, সামাজিক ভিত্তিতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে কার্যকর করা হয়ে থাকে।

সামাজিক ভিত্তি (COMMUNITY BASED)

যে সব অপরাধে লঘু শাস্তির বিধান আছে কিন্তু তার অপরাধ অভ্যাসগত কারণে নয় এবং সে ১ম অপরাধী। এই সবক্ষেত্রে আদালত নিশ্চিত হয়ে সর্বোচ্চ শাস্তি ঘোষণা করে এবং তাকে সংশোধনের সুযোগ স্বরূপ শর্তাধীনে বাড়ীতে বসবাসের আদেশ প্রদান করে থাকে। যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতের আদেশ অমান্য বা লংঘন করে তাহলে তাকে পূর্বে ঘোষিত শাস্তি ভোগ করতে হয়।

উক্ত নিয়মের কারণে কারাগারে বন্দির চাপ কমে। সরকারের কারা-বাজেটে ব্যয় হ্রাস পায়। অপরাধী সামাজিকভাবে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলেমিশে নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ পায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি (INSTIUTION BASED)

যেসব অপরাধে গুরু শাস্তির বিধান আছে কিংবা ১ম অপরাধী নয় এমন অভ্যাসগত অপরাধীদের কারাগারে রেখে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতিতে তাদের প্রতি আদালতের দেয়া শাস্তি কার্যকর করা হয়। এক্ষেত্রেও তার বয়স, লিংগ, অপরাধের প্রকৃতি ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়।

উক্ত নিয়মের কারণে মানুষকে একবার তার কৃত ভুলের সামনা-সামনি দাঁড় করাতে পারলেই সে তার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে কারাগারে অপরাধীদের উপর আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের সংশোধিত করে সুশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফলে সমাজে অপরাধ প্রতিরোধের একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

সুইডেনে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালানো, মারামারি, চুরি, প্রতারণা ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ সংক্রান্ত অপরাধে ২ মাস অথবা আরও কম সময়ের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ অপরাধীরা নিজ ঘরে বসে কারাদণ্ড ভোগের সুযোগ পাচ্ছে। তবে তাদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করার জন্য একটি ইলেকট্রনিক নজরদারি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তথাকার কারা ও সংশোধন বিভাগের বেঁধে দেয়া কঠোর সময়সূচী ও নিয়ম তাদের মেনে চলতে হয়। অপরাধীদের কারাগারে পুরে রাখার চেয়ে এই ব্যবস্থা আর্থিক দিক দিয়েও অনেক সাশ্রয়ী। এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রকল্প হাতে নিয়েছে।[৭৮]

কিশোর অপরাধীদের জন্য আমাদের দেশে স্বতন্ত্র কোন কারাগার নেই। তবে গাজীপুর জেলার টংগীতে একটি ও যশোহর জেলার পুলেরহাটে একটি মোট ২টি কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান ২টির উল্লেখযোগ্য তৎপরতা না থাকায় কিশোর-কিশোরীরা বিষাক্ত পরিবেশে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।[৭৯] এ সম্পর্কে সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, দণ্ডিত কিশোরদের ব্যাপারে সংশোধন ও পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম।[৮০] এ ছাড়াও আমাদের দেশে মহিলাবন্দি, রাজবন্দি, বিচারাধীন বন্দি ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য স্বতন্ত্র কোন কারাগার নেই। এ সম্পর্কে আইন কমিশন সচিব কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন, বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের একসংগে কারাগারে রাখা উচিত নয়। এ জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।[৮১]

---

[৭৮] ১৬.১০.১৯৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকা।
[৭৯] ১৪.০৭.১৯৯০ তারিখের "দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকা।
[৮০] ১১.০৩.১৯৯০ তারিখের "দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকা।
[৮১] ০৬.০৪.১৯৯৯ তারিখের "দৈনিক প্রথম আলো'' পত্রিকা।

আমরা শাস্তিকে প্রতিরোধ কিংবা সংশোধন যে নীতিতেই গ্রহণ করিনা কেন সব মতবাদেই শাস্তির স্বীকৃতি আছে। আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে "শাস্তি'' নামটি উঠিয়ে দিয়ে "চিকিৎসা'' নামে অভিহিত করা হচ্ছে।[৮২] আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় ও বাস্তবতা নিরিখে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগের তাগিদে বাংলাদেশের কারাব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা জরুরী প্রয়োজন। কারাব্যবস্থা তথা কারাগারকে আধুনিকায়ন করার পূর্বে আধুনিক কারাগারের কি লক্ষ্য তা স্থির করা বাঞ্ছনীয়।

৩.২.৬ আধুনিক কারাগারের লক্ষ্য

কারাগার তথা কারাকর্তৃপক্ষের মৌলিক দায়িত্ব হলো, মানবাধিকার লংঘন না করে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ বন্দিদের হেফাজতে রাখা এবং অপরাধীদের আইনমান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালানো।

৩.২.৭ অধিক নিরাপত্তার কারাগার

সুউচ্চ প্রাচীর বিশিষ্ট কারাগার। দক্ষ ও কঠোর তদারকির মাধ্যমে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ (External control) এবং অভ্যন্তরীণ সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ (Internal reform)। এ সব কারাগারে অভ্যাস্ত অপরাধী, পেশাদার অপরাধী এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক অপরাধীদের রাখা হয়। অধিক নিরাপত্তার জন্য কারা অভ্যান্তরে প্রয়োজন অনুসারে নেটিং, গ্রিল ও নিরাপত্তা প্রাচীরের (segregation wall) ব্যবস্থা আছে। কিন্তু খোলামেলা জায়গাসহ কষ্টকর পরিবেশের অবসান ঘটানো হয়।

৩.২.৮ মধ্যম নিরাপত্তার কারাগার

১ম অপরাধী ও মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িত নয়; এমন প্রকৃতির অপরাধীদের ব্যক্তিগত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মধ্যম নিরাপত্তার কারাগারে রাখা হয়। এ ছাড়াও যেসব অপরাধী অধিক নিরাপত্তা কারাগারে সংশোধন হয়েছে বলে মনে হয় তাদেরকেও এই কারাগারে আলাদাভাবে রাখা হয়। এই কারাগারে কর্মমুখী শিক্ষা, পর্যাপ্ত খেলাধুলা, শরীরচর্চা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩.২.৯ মুক্ত কারাগার

মুক্ত কারাগার মানে উন্মুক্ত কারাগার নয়। এটা ন্যূনতম নিরাপত্তার কারাগার (Minimum security prison)[৮৩] উনিশ শতকের শেষদিকে সুইজারল্যান্ডে প্রথম মুক্ত কারাগারের চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৩০ সনে বৃটেনে এবং ১৯৪০ সনে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্ত কারাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৪] এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৩৯ সালে, নেদারল্যান্ডে ১৯৫৭ সালে ও থাইল্যান্ডে ১৯৬০ সালে মুক্ত কারাগার স্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দির চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, হাংগেরীতেও মুক্ত কারাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে ১৯৪৯ সনে প্রথম মুক্ত কারাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতের ১২টি প্রদেশে ২১টি মুক্ত কারাগারে বন্দিদের আধুনিক পদ্ধতিতে সংশোধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চালু আছে।[৮৫]

অবস্থার স্বীকার (Victim) যুবক ও মহিলা, ১ম অপরাধী এবং পূর্ব ইতিহাস ভাল তাদের মুক্ত কারাগারে রাখা হয়। এ ছাড়াও নেশাগ্রস্ত অপরাধী ও ট্রাফিক আইন অমান্যকারী অপরাধীদের এখানে রাখার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া অধিক নিরাপত্তা কারাগার ও মধ্যম নিরাপত্তা কারাগারে সংশোধিত বন্দিদের মুক্তি লাভের কিছু কাল পূর্বে এখানে আলাদাভাবে রেখে তাদের সমাজে পুনর্বাসনের পথ ত্বরান্বিত করা হয়।

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য মাথায় নিয়ে মুক্তকারাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়-

ক) কারাগারের ধরা বাধা নিয়মবহির্ভূত মুক্তভাবে বসবাসের সর্বনিম্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Minimum Security)।

খ) বাসিন্দাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

---

[৮২] হামজা হোসেন, অপরাধ বিজ্ঞান, ১৯৯৫, পৃঃ- ১৩৭।

[83] Ahmad Siddique, Criminology, 4th Edition, p-184.

[৮৪] বি.এল.দাস, অপরাধ বিজ্ঞান (১ম খন্ড) ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫।

[85] Prof. N. V. Paranjape, Criminology and Penology, 10th Edition, p-288/289.

গ) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুক্তভাবে দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ দেয়া।
ঘ) হাতে কলমে বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
ঙ) কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করা।
চ) অর্জিত পারিশ্রমিকের একটি অংশ বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা।
ছ) কর্তৃপক্ষ ও বাসিন্দাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।
জ) মুক্ত কারাগার পরিচালনায় দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করা।
ঝ) সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞদের তদারকির ব্যবস্থা করা।
ঞ) খাদ্যের মান উন্নত করা।
ট) চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।
ঠ) মাসে ১৫ দিন রেয়াত / রিমিশনের ব্যবস্থা রাখা।
ড) মুক্তির সাথে সাথে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা।
ঢ) প্রত্যেক বাসিন্দাকে সপ্তাহে ১দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
ন) শহরের বাহিরে অর্থাৎ শহরের অনতিদূরে এই কারাগার নির্মাণ করা হয়।
প) কাজের অবসরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা।
ফ) সাধারণতঃ কারাগারে ব্যবহৃত শব্দগুলোর(কারাপরিভাষা) বিকল্প শব্দ ব্যবহার হয়।
ব) বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন মুক্ত কারাগারে রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়।

বিশিষ্ট পেনোলজিষ্ট অধ্যাপক N.V.Paranjape-এর মতে আধুনিককালের চিন্তা-চেতনায় আধুনিক পেনোলজিক্যাল (Penological) দর্শনের আলোকে মুক্ত কারাগার প্রবর্তনে আমরা নিম্নলিখিত সুবিধা ভোগ করতে পারি।[৮৬]

১। কারাগারে অতিরিক্ত বন্দি অবস্থানের চাপ কমবে।
২। তুলনামূলকভাবে নির্মাণ ব্যয় অনেক কম।
৩। সাধারণ কারাগারের তুলনায় মুক্ত কারাগারের পরিচালনা ব্যয় অনেক কম।
৪। এখানের বাসিন্দারা সবসময় কাজে নিয়োজিত থাকায় তারা শারীরিক ও
মানসিকভাবে সমাজে বসবাসের জন্য সু-নাগরিক হিসেবে উপযুক্ত হয়ে উঠে।
৫। মুক্তি লাভের পর তাদের সমাজে খাপ-খাওয়াতে কোন বেগ পেতে হয় না।
৬। মুক্ত কারাগার পদ্ধতিতে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়।

৩.২.১০ সারকথা

বৃটিশ উপনিবেশের সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শাস্তিদানের মনোভাব নিয়ে কারাগারের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। সেথেকে আজ অবধিও ঐ অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশের কারাগারগুলো অপরাধ দমন ও বন্দিদের মধ্যযুগীয় কায়দায় শাস্তিদানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। দমননীতি বা অমানবিক পন্থায় কারাগার পরিচালনা করায় পৃথিবীর কোন দেশেই সুফল পাওয়া যায়নি। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দমননীতির স্থলে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি অত্যধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আমাদের দেশের কারাগারগুলোতে সব ধরনের বন্দি একই সাথে অবস্থানের কারণে অপরাধীরা আরো পাকা হচ্ছে এবং নিরপরাধ বন্দিরা অপরাধ সংঘটিত করার প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। ফলে আটক বন্দিদের মানসিক পরিবর্তন না ঘটে আরো জটিলতর আকার ধারণ করছে। তাই বর্তমান যুগের চাহিদা ও বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রবর্তন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে আধুনিকায়ন করার তাগিদ প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে।

[86] Prof. N. V. Paranjape, Criminology and Penology, 10th Edition, p-287/288.

৩.৩ বাংলাদেশের কারা প্রশাসন
(3.3 Prison Administration in Bangladesh)

৩.৩.১ প্রাসঙ্গিক কথা

ভারতবর্ষের কারাগারসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহের সময় হতেই দমনমূলক নীতি ও ভারতবাসীদের শাস্তিদানের মানসে পর্যায়ক্রমে কারাগারের প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরী করা হয়। একই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে কারাপ্রশাসন পরিচালনার জন্য বিধি আকারে সংকলিত জেল কোড প্রকাশ করা হয়। ঐ প্রশাসনিক অবকাঠামো ও বিধি অনুসারে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ এখনো পরিচালিত হচ্ছে।

দুর্নীতি রোধ ও কারাগার তদারকির জন্য সর্বপ্রথম ১৮৫৫ সালে কারা মহাপরিদর্শকের পদ এবং বিভাগ ভিত্তিক কারাগার তদারকি ও পরিদর্শনের জন্য ১৯৬২ সনে কারা উপ মহাপরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়।[৮৭] কারাগারের সব কাজ-কর্ম কারা প্রশাসনের অন্তর্গত। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাই গৃহীত পরিকল্পনা ও পলিসিসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। কারাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের জন্য ১৯৯২ সনে সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি[৮৮] এবং ১৯৯৩ সনে কারাগারের "জেলার" পদসমূহ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৮৯] এছাড়াও অধিক তদারকি ও কারাগার পরিদর্শন এবং সুষ্ঠু প্রশাসন লাভের আশায় ১৯৯৫ সনে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়।[৯০] এরপরও বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক পদ সৃষ্টি করে লোকবল বাড়ানো হয়েছে। ফলে বেড়েছে চেয়ার-টেবিলের সংখ্যা ও রাজস্ব ব্যয়। কারা পরিচালনা পদ্ধতি, প্রশাসনিক অবকাঠামো, বিধি-বিধান ও নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকায় বাড়েনি কোন সুযোগ সুবিধা। লোকবল বাড়ানোর পিছনে যতই যুক্তি খাড়া করা হোক না কেন, প্রচলিত পদ্ধতি, নীতিমালা ও বিধি-বিধান বজায় রেখে ফলোদয় আশা করা যায় না।

৩.৩.২ কারা প্রশাসনের নকশা, পদ, পদের সংখ্যা ও অস্ত্রাগার

বর্তমানে বাংলাদেশে ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ৫৫টি জেলা কারাগার ও ১৬টি থানা কারাগার আছে। বর্তমান কারাপ্রশাসনের নকশা, পদ বিন্যাস ও শ্রেণী অনুযায়ী পদের সংখ্যা অপর পৃষ্ঠায় ৩ ও ৪ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলঃ-

---

[৮৭]। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৪৭-HG তারিখ ১৫/১০/৬২।
[৮৮]। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১ই-৮/৮৭-জেল-১/৩৭৭ তারিখ ১/৯/৯২।
[৮৯]। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১ই-১৬/৮৮জেল-১/৬৬৮ তারিখ ১৩/১১/৯৩।
[৯০]। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১ই-১/৮৫ জেল-১ (অংশ-১)/২১৫ তারিখ ১/৪/৯৫।

৩ নং সারণী

কারা প্রশাসনের নক্সা
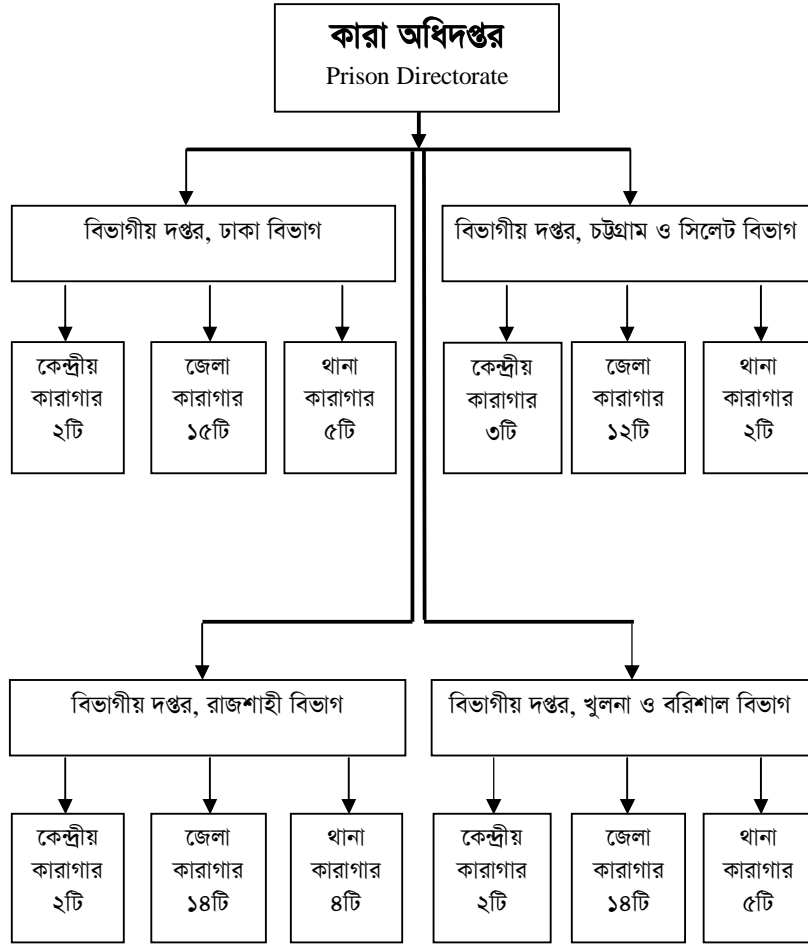
অপর পৃষ্ঠায় কারাপ্রশাসনের পদবিন্যাস প্রদর্শিত হলো

কারা অধিদপ্তরের লোকবলের পদবী

কারা মহাপরিদর্শক
অতিঃ কারা মহাপরিদর্শক
কারা উপ মহাপরিদর্শক
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাজেট অফিসার
পরিসংখ্যানবিদ
প্রধান সহকারী
ভ্রাম্যমাণ নিরীক্ষক
সহকারী ভ্রাম্যমাণ নিরীক্ষক
স্ট্যানো টাইপিস্ট
উচ্চমান সহকারী
নিম্নমান সহকারী
টাইপিস্ট
রেকর্ড কিপার
বডিগার্ড
ড্রাইভার
পিয়ন
সুইপার

বিভাগীয় দপ্তরের লোকবলের পদবী

কারা উপ মহাপরিদর্শক
স্ট্যানো টাইপিস্ট
উচ্চমান সহকারী
নিম্নমান সহকারী
ড্রাইভার
পিয়ন
সুইপার

কেন্দ্রীয় কারাগারের লোকবলের পদবী

সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
উপ-তত্ত্বাবধায়ক
জেলার
ডেপুটি জেলার
উচ্চমান সহকারী
কারাসহকারী
শিক্ষক
হিসাবরক্ষক
কারখানা তদারক
টাক্স-টেকার
দর্জি
সার্জেন্ট ইন্সট্রাক্টর
সর্বপ্রধান কারারক্ষী
প্রধান কারারক্ষী
মেট্রন
কারারক্ষী
মহিলা কারারক্ষী

জেলা কারাগারের লোকবলের পদবী

তত্ত্বাবধায়ক
জেলার
ডেপুটি জেলার
কারাসহকারী
সর্বপ্রধান কারারক্ষী
প্রধান কারারক্ষী
কারারক্ষী
মহিলা কারারক্ষী

থানা কারাগারের লোকবলের পদবী

তত্ত্ববধায়ক (Ex-Officio)
কারাসহকারী
প্রধান করারক্ষী
কারারক্ষী

কারাহাসপাতালসমূহের লোকবলের পদবী

মেডিক্যাল অফিসার (Ex-Officio)
সহকারী সার্জন
ফার্মাসিস্ট

৪নং সারণী [৯১]

শ্রেণী অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১ম শ্রেণী	১৩৩
২য় শ্রেণী	৮৩
৩য় শ্রেণী (নির্বাহী)	৬৯১৮
৩য় শ্রেণী (সাধারণ)	৩৫৯
৪র্থ শ্রেণী	১৭
সর্বমোট	৭৫১০

বাংলাদেশের মানউন্নত প্রায় জেলা কারাগারগুলোর অস্ত্রাগার জেল গেটের মধ্যে অবস্থিত অফিসের ভেতর। ফলে বন্দিরা যে কোন সময়, যে কোন কারণে মারমুখী হয়ে অফিসে ঢুকে পড়লে কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে না। আবার বন্দিরা বিভিন্ন কারণে প্রায় সময়ই অফিসে যাতায়াত করে ; অকস্মাৎ কোন কারণে বন্দিরা পরিকল্পিতভাবে অস্ত্রাগার লুট করে একযোগে কারাগার থেকে পলায়ন করতে পারে। ১৯৯১ সনে নরসিংদী জেলা কারাগারে এরূপ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল। [৯২]

৩.৩.৩ কারা প্রশাসনে দুর্নীতি

কারাবিভাগে চাকরী অর্থাৎ কারাগার তথা কারাবন্দিদের উন্নতি সাধানই মূল লক্ষ্য। লোকবল বেড়েছে কিন্তু মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে কোন ছোয়া লাগেনি। মাঝেমধ্যেই পত্রিকান্তরে কারাগারে বন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অতিমাত্রায় দুর্নীতির খবর জানা যায়।

"জেলখানার প্রশাসনিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল ও নড়বড়ে, তাই দুর্নীতি এখানে বেশি।" [৯৩] উইলিয়াম পিট বলেছেন- " দুর্নীতি গাছের শাখা প্রশাখার মতো, খুব সহজেই এর বিস্তার ঘটে"। দুর্ব্যবহার ও সবক্ষেত্রেই দুর্নীতির কারণে বন্দিরা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত। ফলে বন্দিদের মাঝে সবসময়ই কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করে।

কেস-৩

নরক যন্ত্রণার কারাগার

চারটি মামলা থেকে জামিন প্রাপ্ত ও ডিটেনশনমুক্ত ধানমণ্ডির নিয়াজ আহম্মেদ কারাবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ২৭/০২/৯৯ তারিখ সন্ধ্যায় আমাকে নেয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের আমদানী ওয়ার্ডে। সেখানে নির্যাতন অবধারিত। ম্যাট, রাইটার ও পাহারাদারদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি, চড়-থাপ্পড় শুরু হয়ে যায়। এটা তাদের উৎকোচ আদায়ের একটা কৌশল। আমি সারারাত ঘুমানোর মত জায়গা পাইনি। অন্যদের গুদামে বস্তা সাজিয়ে রাখার মত করে জোর করে শুইয়ে দেয়া হচ্ছিল। তখন বাইরে বেশ শীত ছিল। কিন্তু আমদানী ওয়ার্ডের ভেতরের প্রচণ্ড গরমে তখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসার দশা। সেই সাথে মশার কামড় এবং টয়লেটের দুর্গন্ধ তো রয়েছেই। আমদানীর টয়লেটের দরজা ভাঙ্গা, ময়লা উপচে পড়ছে। টয়লেটের কাছে যেসব বন্দি অবস্থান করছিল তারা অনেকেই বমি আটকাতে পারছিল না। অথচ সেখানে বসেই তাদের খাবার ব্যবস্থা। এভাবে রাত না পোহাতেই সাড়ে তিনটার দিকে আবার বন্দিদের উঠিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়; কেস টেবিলের ফাইলের জন্য। এরপর ভোর ৬টা থেকে শুরু হয় নতুন নির্যাতন, ভোঁতা ক্ষুর-কাঁচি দিয়ে গণহারে চুল কাটা। জেলের পরিভাষায় একে 'বাটিছাঁট' বলে। ম্যাট বা রাইটারদের ম্যানেজ করতে পারলে নির্যাতন কমবে। কারাগারে এমনিতেই স্থানাভাব রয়েছে-তারপরও এ ম্যানেজ প্রক্রিয়াতে প্রকারান্তরে জায়গা বিক্রি করা হয়। কোন রকম শোয়ার জায়গা কিনে না নিলে বন্দিদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। ৪ফুট বাই ৭ফুট আয়তনের জায়গা বরাদ্দ পেতে সপ্তাহে ৪'শ টাকা পর্যন্ত দেয়া লাগে। টয়লেটে যেতে হলে একটি মাত্র টয়লেটের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রহর গুণতে হয়। তবে এসব সমস্যা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে সব কিছুই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। টাকা আদায়ের জন্য যেনতেন ছুতোয় হাজতীদের কেস টেবিলে ডেকে নিয়ে বড় লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। উচ্চশিক্ষিত বা ভদ্র ঘরের সন্তানের পরিচয় অনেক সময় কেস টেবিলে যাবার কারণ হয়ে ওঠে। উৎস ঃ ০৪/০৪/১৯৯৯ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা।

---

[৯১] । Training Guide, Good Prison Management for Prison Personnel of Bangladesh, 2000, p-68/69.

[৯২] । ২ -৪-৯১ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[৯৩] । ১/৪/৯৩ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

"কারাপ্রশাসনে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। অনিয়ম, দুর্নীতি নামক বিষবৃক্ষের শেকড় এখানে এতো গভীরে ঢুকে পড়েছে যে, তা উপড়ানো এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে ; পক্ষান্তরে কারা প্রশাসনের চিহ্নিত কর্মকর্তারা রাতারাতি কালো টাকার মালিক বনে যাচ্ছে। কারাগারের ভেতরে ও বাইরে একই অবস্থা বিরাজ করছে।"[৯৪] স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত দেশের কারাগারগুলোর বিভিন্ন অনিয়ম আর দুর্নীতির তদন্তে ১২৬টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু এর মধ্যে বেশির ভাগ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি।[৯৫] সর্ষের ভেতরে যে ভূতঃ কারাপ্রশাসনের সেই অনিয়ম ও দুর্নীতিকে দূর করতে হবে সবার আগে।[৯৬] মাঠ পর্যায়ে জরীপকালে জানা গেছে যে, তাদের প্রায় সবারই অভিমত অধিদপ্তরে দুর্নীতি কমলেই মাঠ পর্যায়ে অনেক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন আশা করা যায়।

বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি, জনসংখ্যা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি কারণে অঞ্চলভেদে সমাজে অপরাধ প্রবণতার তারতম্য ঘটে। আবার সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা, স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা, রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি কারণেও মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা অঞ্চলভেদে কম বেশি হয়। এসব বহুবিধ কারণে বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত কারাগারে বন্দি সংখ্যার তারতম্য ঘটাই স্বাভাবিক। যে সব জেলার লোক সংখ্যা কম কিংবা তুলনামূলকভাবে অপরাধ প্রবণতা কম, সেসব জেলা সদরে অবস্থিত কারাগারে অন্যান্য কারাগারের তুলানায় আটক বন্দির সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাভাবিক। সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাক এবং কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসুক এটাই দেশের মানুষের প্রত্যাশা। কিন্তু এই সুশীল পরিস্থিতি কারা কর্মকর্তাদের কাছে সুখকর নয়। কারাগারের বন্দি সংখ্যা হ্রাস পেলে তাঁরা মর্মাহত ও বিষণ্ন হয়ে পড়েন। যে সব কারাগারে বরাবরই বন্দি সংখ্যা কম থাকে, সেসব কারাগারে সহজে কোন কর্মকর্তা বদলী যেতে চান না। ঐ সব জেলে বদলীর হুকুম হলে তাঁরা বিভিন্ন পন্থায় বদলীর আদেশ বাতিল বা স্থগিত করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে লেগে পড়েন। এসব ঘটনার নজির ভুরি ভুরি। আসল কথা যে কারাগারে বন্দির সংখ্যা কম সেখানে আয় কম। তাই তাঁদের উপরী আয়ের উপর ভিত্তি করে এরকম মনমানসিকতা গড়ে উঠেছে।

কারাগারের প্রায় নির্বাহী কর্মকর্তাগণ (ডেপুটি জেলার থেকে ডিআইজি প্রিজন) ব্যাপকহারে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করেন। অনেকের জেল সংলগ্ন বাসাগুলো খামারে পরিণত হয়েছে। আর এসব পশুপাখীর খাবার যোগাড় হয় জেলখানা হতে। বন্দিদের খাবার কম দিয়ে তা পশুপাখীকে খাওয়ানো হয়। কর্মকর্তাগণ পশু-পাখী পোষার সুবাধে কারারক্ষী ও বন্দিদের শ্রম ব্যক্তিগত কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন।[৯৭] তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে এ প্রক্রিয়া বন্ধের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৩.৩.৪ কারাগারে ভিজিটর গেলে যা করা হয়

উচ্চ পর্যায়ের ভিজিটর বা কর্মকর্তা বা নন-অফিসিয়াল ভিজিটর কারাগার পরিদর্শনে গেলে জেল খানার অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও সমস্যার কথা না বলার জন্য আগে থেকেই বন্দিদের বলে দেয়া হয়। আর যদি কেউ কারাগার সংক্রান্ত কোন সমস্যা বা অভিযোগ পরিদর্শকের কাছে বলে ফেলে, তাহলে তাকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়।[৯৮]

---

[৯৪]। ১/২/৯৯ তারিখের "দৈনিক আজকের কাগজ" পত্রিকা।

[৯৫]। আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০ পৃ-১৮।

[৯৬]। ১৭/১০/২০০০ তারিখে "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকা।

[৯৭]। ২৮.১২.৯৬ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[৯৮]। ৯/৪/৯০ তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকা এবং ২৬/৫/৯৪ তারিখের "সাপ্তাহিক দুনিয়া" পত্রিকা।

কেস-৪

মৌলভীবাজার কারাগারে অপ্রীতিকর ঘটনা

৩১শে মার্চ ১৯৯০ তারিখে মৌলভী বাজারের জেলা প্রশাসক নির্ধারিত মাসিক জেল পরিদর্শনে গেলে কয়েদীরা তাঁর নিকট জেলখানার নানা অব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করে। এর সূত্র ধরে পরের দিন ১লা এপ্রিল জেল পুলিশেরা লাঠিসোটা নিয়ে কারাগারের ভেতরে ঢুকে বন্দিদের প্রহার করতে শুরু করে। বন্দিদের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে জড় হয়ে প্রতিবাদ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

উৎস ঃ- ০৯/০৪/১৯৯০ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা

কোন ভিজিটর কারাগার পরিদর্শনে যাওয়ার আগেই কারাভ্যন্তরে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা হয়, যাতে আগন্তুক ভিজিটর কারাগারের বাস্তব অবস্থার কোন কিছুই আঁচ করতে না পারেন, এছাড়াও ভিজিটর আগমনের সাথে সাথে তাঁকে কর্মকর্তা / কর্মচারীরা এমনভাবে আগলে রাখেন যেন তিনি কারাগারের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে না পারেন।[৯৯] মোট কথা ভিজিটরদের কাছে কারাপরিস্থিতি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, এটা অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উত্তম, মানবিক ও দুর্নীতিমুক্ত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। এসব মিথ্যা অভিনয়ে পারদর্শিতার জন্য আমাদের সব উন্নয়নই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৩.৩.৫ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পোশাকের অসমতা

কারা বিভাগে মেধাবী ও চৌকশ কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এদের মধ্যে অনেকেই তদবীরের জোরে আবার অনেকে আত্তীকরণ (Surpluse) হয়ে চাকরী লাভ করেছেন। নেতৃত্বসুলভ আচারণ, দক্ষতা, পারদর্শিতা না থাকা সত্ত্বেও সিনিয়রিটি হিসেবে একাধিক উচ্চপদে পদোন্নতি দেয়ার প্রথা চলে আসছে বহুকাল ধরে। কারা বিভাগের কাজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী চাকরী। আর দশটা সরকারী চাকরীর চাইতে কারাবিভাগের চাকুরী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে মেধাবী, দক্ষ, চৌকশ ও মানবতাবাদী লোকের প্রয়োজন। নির্বাহী কর্মকর্তাদের মেধা, দক্ষতা, কৌশল ও পারদর্শিতা না থাকায় দিন দিন কারাপ্রশাসনের ক্রমাবনতি ঘটছে। ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের কারাবিভাগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তবে কিছু কিছু মেধাবী ও পারদর্শী কর্মকর্তা আছে। কিন্তু তাদের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় তারা বাস্তব পরিস্থিতিতে একই কাতারে সামিল হতে বাধ্য হয়েছেন।

বাংলদেশের কারাগারসমূহে নিয়োজিত কারারক্ষী থেকে জেলার পর্যন্ত সকলেই খাকী পোশাক পরিধান করেন। কিন্তু এর উপরের পদে পদোন্নতি হলেই খাকী পোশাক ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ উপ-তত্ত্বাবধায়ক বা তদূর্ধ্ব পদে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ খাকী পোশাক পরিধান করেন না। এ অসমতার যুক্তিগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৩.৩.৬ অফিসারদের ব্যর্থতার কারণ

কারাকর্মকর্তাদের গণ-সমর্থন হ্রাস ও ব্যর্থতার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১. প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ বোধ শক্তির অভাব।
২. উদ্যোগহীনতা, আত্মকেন্দ্রীক ও অদূরদর্শিতা।
৩. অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
৪. প্রশাসনিক কাজের কলা-কৌশল ও প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাব।
৫. সঠিক সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব।
৬. উন্নয়নমূলক কাজের চেষ্টায় অনিচ্ছা ও দক্ষতার অভাব।
৭. নতুন ও বিশেষ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে নিজেকে আড়াল করে রাখা।
৮. মানবাধিকার জ্ঞান অনুপস্থিত ও একনায়ক মনোভাব।

[৯৯]। বি.বি. বিশ্বাস, কারাগারের বিভীষিকাময় দিনগুলি, ১৯৯৪, মুখবন্ধ।

৩.৩.৭ কর্মচারীদের নিদারুণ ক্লেশের চাকরী

দেশ ও সমাজের স্বার্থে শত শত কারাকর্মচারী নিদারুণ ক্লেশের মধ্যদিয়ে প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছেন। চাকরীর পয়সায় সংসার চলে না; আবাসিক ব্যবস্থার মহা সংকট, ঘিঞ্জি পরিবেশ; বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই: সহায়তাহীন চাকরী ; নির্ঘুম তারা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। পদে পদে জীবনের ঝুঁকি। এদের কপালে ভোগ নেই, আছে ত্যাগের যন্ত্রণা। ভোগটা আছে মুষ্টিমেয় অফিসারদের। কারারক্ষীদের ব্যর্থতার ইতিহাস দীর্ঘ। কিন্তু কোনদিন পুরস্কার তো দূরের কথা সামান্য বাড়তি পয়সার মুখ দেখেনি দেশের শত শত সাধারণ কারারক্ষী। কারারক্ষীদের নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত জীবনের নানা দুঃখ। আবার এর কারণে রয়েছে ক্ষোভও। দিন কাটে তাদের আতঙ্কের মাঝে। ন্যায়সঙ্গত কোন দাবী করলেই বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত জেল কোড প্রয়োগ করা হয় তাদের প্রতি। বিভাগীয় মামলা করে হয়রানি করা হয়। আবার কখন হারাতে হয় চাকরী। চুন থেকে পান খসলেই বদলী দেয়া হয় অন্যত্র। চাকরী জীবনের রয়েছে নানা সমস্যা। বেতন কম, নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত ডিউটি করতে হয় প্রায় প্রতিদিন। বেতন কম হওয়ায় ছেলে-মেয়েদের ন্যূনতম ইচ্ছাও পূরণ করতে পারেন না তারা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের **"কারা সার্ভিস"** এর সদস্যরা চলাফেরা করেন রাজকীয় কায়দায়। যাতায়াতের জন্য রয়েছে তাদের অত্যাধুনিক গাড়ী। আর সপরিবারে বসবাসের জন্য রয়েছে সরকারী বাড়ী। তাদের এতো সময় ডিউটি করতে হয় না। সে তুলনায় আমাদের দেশের কারা বিভাগ রয়েছে অন্ধকারে। এ অবস্থায় ঠিকমত কাজ করার মনমানসিকতা থাকে না। এরপরও কথায় কথায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উঠে। কখনো কখনো হারাতে হয় চাকরী।

বাধ্য হয়ে অনেক কারাকর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। যে বেতন পায় তাতে সংসার চলে না। প্রমোশন আর বদলীর জন্য বড় কর্তাদের মন যোগাতে হয়। সময় ও পরিস্থিতিটাই এরকম হয়েছে। জেলের চাকরীতে কাজ ছাড়া বিশ্রাম ও বিনোদনের কথা লেখা নেই। এমনকি ঈদের দিনও তারা পরিবার-পরিজনের সাথে দিনটি কাটাতে পারেন না। কারণ ঐদিনই কারাগারে কাজ থাকে আরো বেশি।

কারাগারে নিয়োজিত গার্ডিং স্টাফদের অভাব অভিযোগ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর জন্য কোন সংগঠন (Association) নেই। ফলে "জেলখানার অধস্তন কর্মচারীরা জেলখানার অফিসার দ্বারা নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত। জেল কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন।"[১০০] "কারারক্ষীরা ছুটি চাইতে গেলেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।"[১০১] এছাড়াও কারারক্ষীদের বিভিন্ন অজুহাতে বা ব্যক্তিগত আক্রোশে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়।[১৬]

কেস-৫

<u>রাজশাহী জেল সুপারের ব্যক্তিগত কাজ করতে অস্বীকার করায় রক্ষীকে মারধর</u>

শ্রী দীলিপ কুমার, কারারক্ষী, নং-৩১১২৭, কেন্দ্রীয় কারাগার, রাজশাহী। তিনি জানান যে, কারারক্ষী হিসেবে ডি.আই.জি.প্রিজন অফিসে কর্মে নিয়োজিত ছিলাম। সেই সময় জেল সুপার জনাব আব্দুল অমিক সাহেবের বাসার ব্যক্তিগত কাজ করতে অস্বীকার করায় তাঁর লোকজন আমাকে পোশাক পরিহিত অবস্থায় মারপিট করে এবং অফিসে নিয়ে গিয়ে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন।

উৎস ঃ-১৮/০৪/২০০০১ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা।

কাজেই কারা কর্মকর্তাদের অমানবিক আচরণ রোধ, প্রশাসনে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গার্ডিং স্টাফদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া আদায় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পন্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর জন্য অধস্তন কর্মচারীদের "সংগঠন" থাকা উচিত। অধস্তন কর্মচারীদের মাঝে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মকর্তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলে কারাপ্রশাসনে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং প্রশাসন হবে গতিশীল। আন্ত-

---

[১০০] । ৬.২.৯৭ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[১০১] । ১৮.১০.২০০০ তরিখের "দৈনিক সোনার দেশ " পত্রিকা।

১৬। ১৮/০৪/২০০১ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

রিক পরিবেশের কারণে কর্মচারীরা তত্ত্বাবধান ও পেশাদারিত্বে নিশ্চিতভাবে মনোযোগী এবং যত্নবান হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

৩.৩.৮ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কারাবিভাগে নিয়োগ ও বেতন

গ্রেট বৃটেনের কারাবিভাগে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। [১০৩]

১. প্রার্থী ঝগড়াটে বা রাগ প্রবণতার বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা।
২. উচ্চপদে প্রবেশের আবশ্যকতার মানদণ্ড নিরীক্ষণ।
৩. প্রার্থীর নির্ধারিত বয়স হিসেবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাচাই।
৪. চাকরীর প্রতি মনোযোগ ও নীতিগত ধরাণা যাচাই।

বৃটেনসহ ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অফিসার নিয়োগ ও বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পদোন্নতি দান এবং সে হিসেবে তাঁরা সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে কারাকর্মচারীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন এবং কাজের ধরন অনুসারে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করা হয়।[১০৪] আবার কানাডায় সাধারণ কারারক্ষীদের (Ordinary Prison Guard) বছরে ১৮,০০০ কানাডিয়ান ডলার বেতন প্রদান করা হয়। [১০৫] যুক্তরাষ্ট্র কারাকর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য সহায়তা (Operating) বাবদ ১৯৯৬ অর্থবছরে $ ২০.৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। [১০৬]

৩.৩.৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন সমস্যা প্রকট। সাকুল্য বেতন দিয়ে সংসার চলে না। এছাড়াও পেশাগত পদমর্যাদার সুবাদে সামাজিকতা রক্ষার কি হবে? সংসার চালানোর তাগিদে ঘাটতি টাকার জন্য ভিন্ন পথে হাত বাড়াতে হয়। এ হাত পাতা অভ্যাসটা একবার রক্তে ঢুকে গেলে আর নিস্তার নেই। দুর্নীতি করা বা ঘুষ খাওয়ার প্লান করে কেউ জন্মায় না। প্রয়োজনের তাগিদে হাত পাতা: তারপর অভ্যাসটা মজ্জাগত হয়ে যায়। মজ্জাগত এ অভ্যাসটাই সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে জরুরীভাবে এর অবসান দরকার। যদিও বিষয়টি সরকারের একচেটিয়া, তবুও বেতন স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয় ঃ-

ক. খোলা বাজারের জিনিস-পত্রের দামের সাথে বেতনের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এর ঘাটতি হলেই তা পূরণের ব্যবস্থা করা উচিত।
খ. প্রাত্যহিক নিজের খরচ পোষানো সম্ভব নয় এমন বেতন না দেয়া।
গ. স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক জীবন ধারার প্রতি সুনজর রাখা।

মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তি আকর্ষণীয় বেতন ও পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে অধিকতর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু প্রশাসনের প্রবাহ নিয়মিত থাকলে সকল স্তরের দুর্নীতি অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

কারাগারগুলোতে বন্দিদের অমানবিকীকরণ বন্ধ করতে হলে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়াও কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে অন্যান্য সুযোগ এবং সহায়তা দরকার। "বাংলাদেশের কারাকর্মকর্তাদের জন্য উন্নত কারা ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার সমাপনী দিনে বিচারপতি নাঈমুদ্দিন আহম্মেদ বলেন- "দেশের কারা ব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থিক প্রয়োজন

১৭| COUNCIL OF EUROPE, Prison Information Bulletin, No-8, December, 1986, P-10.

১৮ | COUNCIL OF EUROPE Prison information Bulletin, No-16, June, 1992, p-23.

[১০৫] । বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ১২২।

২০ | U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, State Prison Expenditure 1996, Cover Page.

মেটাতে এই মুহূর্তে আমাদের উচিত দ্বারে দ্বারে হাত পাতা।"[১০৭] "বাংলাদেশের কারাগার ও মহিলা কারাবন্দি" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন যে, কারাউন্নয়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, অপর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ, বন্দিদের 'মানুষ' হিসেবে না ভেবে অপরাধী হিসেবে ভাবার কারণেই কারাগারসমূহে দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আরো বলেন যে, সাংবিধানিকভাবে বন্দিদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[২১]

৩.৩.১০ সারকথা

পুলিশী মনোভাব চরিত্র সংশোধনের অন্তরায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ''কারাগার''কে ন্যস্ত করা হয়েছে। ঐসব দেশে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কারাগার পরিচলিত হচ্ছে। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, ধর্মীয়, সরকারী ও বেসরকারী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সব কাজকর্ম ও সফলতা সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই সমসাময়িক ভাবনা ও প্রশাসনিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন চিন্তাবিদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার বহুবিধ দর্শনের উন্নতি সাধন করেছেন। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে তাঁদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন না ঘটানো পর্যন্ত তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা দূর হবে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা অসম্ভব হবে। কাজেই বাংলাদেশের কারা প্রশাসন সম্পর্কে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা বর্জন করে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় কারাগারগুলোকে সংস্কারধর্মী ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে উন্নয়নমূলক যে কোন কাজের সুফল বয়ে আনবে।

---

[১০৭] ১৪/৯/২০০০ তারিখের ''দৈনিক মানবজমিন'' পত্রিকা।

[২১]। ২২/০৪/২০০১ তারিখের "দৈনিক মানবজমিন" পত্রিকা।

৩.৪ প্রশিক্ষণ

(3.4 Training)

৩.৪.১ প্রাসঙ্গিক কথা

সভ্যতার বিবর্তনে সারা বিশ্বে আজকের কারাগার শুধু লৌহকপাটের কঠিন নিষ্পেষণে অনন্ত বিভীষিকা নয়, বিপথগামী মানব সন্তানদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধন করে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য পৃথিবীর কারাব্যবস্থা নতুন মাত্রায় সঞ্জীবিত। মূলত:এ লক্ষ্যকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যই উন্নত দেশগুলোতে আধুনিক কারিকুলামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ কলেজ বা কেন্দ্র।

বর্তমানকালে গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি বিভাগের (Departments) মানোন্নয়ন ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। সুলতানী, নবাবী ও ব্রিটিশ আমলের ধ্যান-ধারণায় কারাগারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখন আর সমাদৃত নয়। বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় পেশাগত জ্ঞানের অভাবে বিপথগামী মানব সন্তানদের সংশোধন করে সৎ পথের সন্ধান দিতে সক্ষম নয়। তাই আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পদার্পণ করেও বাংলাদেশের কারা বিভাগ হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ বেড়াজাল থেকে উত্তোরণের নিমিত্তে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাই পেশাগত প্রশিক্ষণ।

যুগের চাহিদা ও দেশের বিবেকবান মানুষের দাবীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার কারাব্যবস্থাকে সংশোধনাগারে রূপান্তরিত করার মানসে কারাকর্মকর্তা / কর্মচারীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গাজীপুর জিলার সফিপুর আনসার একাডেমীতে ৫-৮-৯১ তারিখ হতে কারারক্ষীদের ১ম ব্যাচের ২ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। উক্ত কোর্সের সমন্বয়কারী হিসেবে একজন ডেপুটি জেলার নিয়োগ করা হয়। এভাবে ১ম ও ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এর পর ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদানের জন্য রাজশাহী বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীরা ১৪/৪/৯২ তারিখে বাসযোগে আগমনের সময় বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ফলে দুর্ঘটনাস্থলেই একজন কারারক্ষী মারা যায় এবং ৪৫জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

সমাপ্তকৃত দু'টি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীরা শরীরচর্চা (Physical Exercise, Drill) ছাড়া প্রশিক্ষকের অভাবে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে না পারায় প্রশিক্ষণের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ফলে প্রশিক্ষণ পর্বটি এখানেই স্থগিত হয়ে যায়।

৩.৪.২ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

বাংলাদেশের কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষণ বিহীন। প্রশিক্ষণ বিহীন ব্যক্তিকে অন্ধ লোকের সাথে তুলনা করা যায়। কারাকর্মচারীগণ নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনায় এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কারাবন্দিদের কল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থে কারাগারে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে তোলা এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন ব্যক্তিকে যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমেই পেশাগত জ্ঞানে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। যে কোন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার দক্ষতা বাড়িয়ে বাস্তবমুখী করে তোলা যায়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বুঝতে পারেন, কোন দক্ষতাকে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ প্রশিক্ষণ একজন ব্যক্তিকে নতুন আঙ্গিকে পরিচালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলে। এ ব্যাপারগুলোকে সামনে রেখে কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। আধুনিক ধ্যান-ধারণায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা সংশ্লিষ্ট রীতি-নীতি ও বিভিন্ন কলা কৌশলের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। আর তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের কারাগারকে কল্যাণমুখী ও সংশোধনাগারে পরিণত করার কাঙ্ক্ষিত আশা পূরণ হবে।

কারা প্রশাসনের মান উন্নয়ন, গার্ডিং স্টাফের শৃংখলা রক্ষা ও তাদের যথাযথ কাজে নিয়োগ এবং বন্দিদের আধুনিক পদ্ধতিতে সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকা অপরিসীম। কারাবিভাগে আজ অবধিও নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ দানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পেশাগত জ্ঞানের অভাবে তাদের চালচলন, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বসুলভ আচরণ ও প্রশাসনিক

প্রায়গিক কৌশলের অপটুতার কারণে প্রায়ই নিন্দনীয় হতে দেখা যায়। এছাড়াও কারাবিভাগের অনেক নির্বাহীর শরীর চর্চা ও ড্রিল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ''সেলুট'' দিতে এবং অধীনস্তদের নিকট থেকে ''সেলুট'' নিতেও জানেন না। কাজেই গার্ডিং স্টাফের পাশাপাশি নির্বাহীদের যগোপযোগী আধুনিকতর প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত পেশাগত জ্ঞানের অভাবে কারা বিভাগে উন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচীর সফলতা আশা করা যায় না।

বর্তমানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে মানুষের সামাজিক জীবন নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কারাগারে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনমানসিকতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এসব পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজ, দায়িত্ব, দক্ষতা এবং কৌশল শেখা যায়। কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যে জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও মনোভাব দরকার ; তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

৩.৪.৩ কারারক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও তার বেহাল অবস্থা

কারাকর্মচারীদের কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণদানের জন্য ১৯৯৫ সনে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত হয় "কারারক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র''। ঐ কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যাচের বিবরণ নিম্নে ৫ নং সারণীতে উল্লেখ করা হল।

৫ নং সারণী

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যাচের বিবরণ

ব্যাচ নং	কোর্স শুর হওয়ার তারিখ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রধান কারাবন্দির সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কারারক্ষীর সংখ্যা	সর্বমোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম	১৭/৪/৯৫	------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
২য়	৭/১০/৯৫	------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৩য়	২০/৭/৯৬	------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৪র্থ	৮/৩/৯৭	------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৫ম	৩/৮/৯৭	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৬ষ্ঠ	৯/২/৯৮	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৭ম	১৬/৫/৯৮	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৮ম	৮/৯/৯৮	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
৯ম	৭/২/৯৯	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
১০ম	১৫/৭/৯৯	২২ জন[১০৮]	------	--------	২২ জন	২১দিন
১১তম	৫/৯/৯৯	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
১২তম	১৫/১/২০০০	-------	৮ জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস
১৩তম	৭/৫/২০০০	১৩ জন[১]	-------	-------	১৩ জন	২১দিন
১৪তম	১৪/১/২০০১	-------	৮জন	১০০ জন	১০৮ জন	৩ মাস

উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলেও তার লোকবলের জন্য কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। তাই রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের স্টাফ দিয়েই কোন রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণে সঠিক নির্দেশনা দেয়ার মত শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন যোগ্য কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা শারীরিক কসরত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তেমন জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। এছাড়াও কালের বিবর্তনে প্রচলিত কারাবিধি হয়ে পড়েছে অচল। বন্দিদের শাস্তিদান

[১০৮] নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলার (নন গেজেটেড)।

প্রক্রিয়ায় প্রণীত কারাবিধি নির্ভরশীল প্রশিক্ষণ কোন সুফল বয়ে আনবে না। ১ম থেকে ১৩তম ব্যাচ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে, শরীর চর্চা বিষয়ক জ্ঞান ছাড়া তারা আধুনিক কারাগারের রূপরেখা ও অন্যান্য বিষয়ক জ্ঞান কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

৩.৪.৪ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কারা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন এবং কারা প্রশাসনকে কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনার জন্য কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও পারদর্শী করে তোলা হয়। প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে যে পদ্ধতি বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

কাউন্সিল অব ইউরোপ [১০৯]

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে কারা বিভাগের চাকরীতে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ঐ সব দেশের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পাঠদান করা হয়। নববিযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রবেশনকালীন এবং অন্যদেরও তাত্ত্বিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

1. Modern Prison Systems.
2. Leadership of Senior Management Officer
3. Social Science.
4. Criminal Law.
5. Political Science.
6. Social Law and Regulation.
7. Penology
8. Psychology
9. Pedagogies
10. Finance.
11. Administrative Management
12. Conflict Solution
13. Personnel and Public relation for the Penal Treatment.
14. Philosophy rooted in ethic
15. Legal and Social criteria
16. Human Rights
17. Prison regimes and surveillance
18. Security tasks including self-defense.
19. Case History
20. Group discussions on various theatrical or practical questions
21.

এসব প্রশিক্ষণকালীন বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত হয়ে প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করেন। বিশেষজ্ঞগণ বাস্তব জ্ঞান দানের জন্য প্রশিক্ষণার্থী সমভিব্যহারে পরিদর্শন ও সমস্যার উপর বক্তব্য দিয়ে থাকেন। মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় কারা প্রশাসনে নিয়মিতভাবে In-Service Training -এর ব্যবস্থা আছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র [১১০]

কর্মকর্তাদের ২ বছর মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও প্রতি দু'বছর অন্তর অফিসারদের নতুন পেশাগত কলাকৌশল (Refresher Course) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমেরিকায় বর্তমান ধ্যান-ধারণায় অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আধুনিক পদ্ধতিতে কারা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়।

---

[109] Council of Europe, The Status, Selection and Training of Governing Grades of Staff of Penal Establishment, Third Report of Sub Committee No-VI & Prison Information Bulletin No. 16, June/92, p-22.

[১১০] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯।

কানাডা [১১১]

কারাগারকে কল্যাণমুখী ও আধুনিক কারাগারের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য পরণে কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী ও আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কানাডায় কারাকর্মচারীদের জন্য একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। তথায় ১২ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। তাদের নিয়মিত Refresher Course ছাড়াও পেশাগত সামগ্রিক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে ৯ সপ্তাহব্যাপী পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম (Induction Course) চালু রয়েছে।

শ্রীলংকা [১১২]

অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন কলাকৌশল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নয়নের জন্য শ্রীলংকার কারা অধিদপ্তর (Prison Headquarters) সংলগ্নীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"। এখানে প্রহরীদের (Guard) আড়াই মাস মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেলার, স্টোর কিপার, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষক (Agricultural Instructor) ও অন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পুলিশ বিভাগ হতে আগত প্রশিক্ষকেরা মাদক দ্রব্য সনাক্তকরণ বিষয়ে প্রহরীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান করা হয়।

থাইল্যান্ড [১১৩]

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি বাস্তবায়নের কলাকৌশলে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য কারা বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তত্ত্বগত এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। থাইল্যান্ডের কারা বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত দক্ষ।

সিঙ্গাপুর [১১৪]

এখন আর কারাগারকে শাস্তি দানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; অনেক পর্বেই সংশোধনাগারে রূপান্তর করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে কারাকর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য স্বতন্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। অপরাধীদের সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ভারত [১১৫]

কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত জ্ঞানার্জনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আলাদা আলাদা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। তত্ত্বগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি "ফিল্ডওয়ার্ক" এর মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ ও হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। ভারতের কারা বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষাক্রম অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম (Syllabus) নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

১. সমাজ বিজ্ঞান
২. অপরাধ বিজ্ঞান
৩. মনোবিজ্ঞান
৪. অপরাধ তত্ত্ব
৫. আইন
৬. বন্দিদের কেস হিস্ট্রি প্রণয়ন
৭. প্রবেশন
৮. আফটার কেয়ার

---

[১১১] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১২২।
[১১২] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৩২।
[১১৩] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৩৫।
[১১৪] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৪০।
[১১৫] মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, ভারতের ইয়ারাভাদা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন, পৃ-৫।

৯. আধুনিক কারা ব্যবস্থাপনা
১০. ড্রিল
১১. অস্ত্র প্রশিক্ষণ।

৩.৪.৫ প্রশিক্ষণ দানের সুফল

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংস্কারধর্মী ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার জন্য কারা বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করলে আমরা নিম্নলিখিত সুফল পেতে পারিঃ-

ক. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা আধুনিক কারাগারের উদ্দেশ্য, অপরাধীদের সংশোধন পদ্ধতি (Prisoners Correction Method), নীতিমালা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

খ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপরাধীদের সংশোধনের অন্তরায়সমূহ দূর করে নতুন কৌশল প্রয়োগের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

গ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান, কলাকৌশল ও দক্ষতা অর্জন করায় তাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন আসবে। ফলে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ঘ. প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারবে। এতে তাদের গৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

ঙ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা নিজেদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেশি প্রতিশ্রুতিশীল হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মজবুত হয়।

চ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অদক্ষ লোকবল দক্ষ লোকবলে পরিণত হয়।

ছ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির বাস্তবায়ন, কারাবন্দিদের উন্নয়নকল্পে কল্যাণধর্মী ও উন্নয়নমূলক যে কোন কাজে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা যে কোন ধরনের নতুন দায়িত্ব নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। ফলে নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে বেগ পেতে হয় না।

ঝ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল কাজে লাগিয়ে কারাগারসমূহকে সংস্কারধর্মী ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সহজ হবে।

ঞ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রশাসন লাভ করা যায়।

৩.৪.৬ সারকথা

বিপথগামী মানব সন্তানদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধন করে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য পূরণে চাই বাস্তবমুখী যোগ্য ও দক্ষ লোকবলের গতিশীল কারা প্রশাসন। কারা বিভাগের মানোন্নয়ন, পেশাগত জ্ঞান, বিভিন্ন কলা-কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক কারিকুলামে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া বাঞ্ছনীয়। আর এটা করতে পারলেই যুগের চাহিদা ও দেশের বিবেকবান মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হবে।

অধ্যায়-৪ঃ মৌলিক বিষয়

৪.১ বন্দিদের খাদ্য
৪.২ কারবন্দিদের পোশাক-পরিচ্ছদ
৪.৩ কারাগারের আবাসিক অবস্থা
৪.৪ বন্দিদের চিকিৎসা
৪.৫ বন্দিদের শিক্ষা

৪.১ বন্দিদের খাদ্য

(4.1 Diet Of Prisoners)

৪.১.১ সাধারণ বন্দিদের খাদ্য তালিকা

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে সাধারণ বন্দিদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত খাদ্য দ্রব্যের তালিকা (ডায়েট স্কেল) নিম্নে উল্লেখ করা হলো। সাধারণ বন্দি বলতে ৩য় শ্রেণীর কয়েদী এবং ২য় শ্রেণীর হাজতী, ডিটেনু, নিরাপদ হেফাজতী ও সিভিল প্রিজনার্সকে বুঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত বন্দিদের ‘‘কয়েদী’’ ও দ্বিতীয়োক্ত বন্দিদের ‘‘হাজতী’’ হিসেবে দেখানো হলো। একজন সাধারণ বন্দির প্রতিদিনের ডায়েট স্কেল ৬ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো ঃ-

৬ নং সারণী

সাধারণ বন্দিদের খাদ্য তালিকা

সকালের নাস্তা

খাদ্য দ্রব্যের নাম	পূর্বের পদ্ধতি		মেট্রিক পদ্ধতি	
	কয়েদী	হাজতী	কয়েদী	হাজতী
আটা	২ ছটাক	$১\frac{১}{২}$ ছটাক	১১৬.৬৪ গ্রাম	৮৭.৪৮ গ্রাম
গুড়	$\frac{১}{৪}$ ছটাক	$\frac{১}{৪}$ ছটাক	১৪.৫৮ গ্রাম	১৪.৫৮ গ্রাম

দুপুর ও রাতের খাবার

খাদ্য দ্রব্যের নাম	পূর্বের পদ্ধতি		মেট্রিক পদ্ধতি		মাছ/মাংসের দিন এ্যালাউন্সসহ পাবে
	কয়েদী	হাজতী	কয়েদী	হাজতী	
চাউল	৫ ছটাক	$৪\frac{১}{৪}$ ছটাক	২৯১.৬০ গ্রাম	২৪৭.৮৬ গ্রাম	
আটা	৫ ছটাক	$৪\frac{১}{৪}$ ছটাক	২৯১.৬০ গ্রাম	২৪৭.৮৬ গ্রাম	
ডাল	$২\frac{১}{২}$ ছটাক	$২\frac{১}{২}$ ছটাক	১৪৫.৮০ গ্রাম	১৪৫.৮০ গ্রাম	
সব্জি	৪ ছটাক	৪ ছটাক	২৩৩.২৮ গ্রাম	২৩৩.২৮ গ্রাম	*
খাদ্য দ্রব্যের নাম	পূর্বের পদ্ধতি		মেট্রিক পদ্ধতি		মাছ/মাংসের দিন এ্যালাউন্সসহ পাবে
	কয়েদী	হাজতী	কয়েদী	হাজতী	
ভোজ্য তেল	$\frac{৫}{১৬}$ ছটাক	$\frac{৫}{১৬}$ ছটাক	১৮.২২ গ্রাম	১৮.২২ গ্রাম	২২.৭৭ গ্রাম
লবণ	$\frac{১}{২}$ ছটাক	$\frac{১}{২}$ ছটাক	২৯.১৬ গ্রাম	২৯.১৬ গ্রাম	৩৬.৪৫ গ্রাম
জ্বালানি কাঠ	১০ ছটাক	১০ ছটাক	৫৮৩.২০ গ্রাম	৫৮৩.২০ গ্রাম	৭২১.০০ গ্রাম
মাছ/ মাংস	$\frac{১}{২}$ ছটাক	$\frac{১}{২}$ ছটাক	২৯.১৬ গ্রাম	২৯.১৬ গ্রাম	**
মসলা	$\frac{২}{১৬}$ ছটাক	$\frac{২}{১৬}$ ছটাক	৭.২৯ গ্রাম	৭.২৯ গ্রাম	

হলুদ	$\frac{১}{৬৪}$ ছটাক	$\frac{১}{৬৪}$ ছটাক	০.৯১ গ্রাম	০.৯১ গ্রাম	১.১৩ গ্রাম
শুক্না মরিচ	$\frac{১}{৩২}$ ছটাক	$\frac{১}{৩২}$ ছটাক	১.৮২ গ্রাম	১.৮২ গ্রাম	২.২৭ গ্রাম
পিঁয়াজ	$\frac{৯}{১২৮}$ ছটাক	$\frac{৯}{১২৮}$ ছটাক	৪.১০ গ্রাম	৪.১০ গ্রাম	৫.১২ গ্রাম
ধনিয়া	$\frac{১}{১২৮}$ ছটাক	$\frac{১}{১২৮}$ ছটাক	০.৪৫ গ্রাম	০.৪৫ গ্রাম	০.৫৬ গ্রাম

* যে সব সব্জির খোসা, শিকড় বা পাতা বিন্যাসের সময় বাদ যায় সে সব সব্জির ক্ষেত্রে ২৫% এলাউন্স প্রদানের নিয়ম প্রচলিত আছে। ** মাছ অথবা খাসির মাংসের সাথে ২৫% এবং গরুর মাংসের সাথে ৩৩% এলাউন্স দেয়া হয়। $\frac{১}{২}$ ছটাক বা ২৯.১৬ গ্রাম মাছ অথবা মাংস বিতরণ করতে অসুবিধা হওয়ায় কর্তৃপক্ষ একদিন পর পর মাছ/মাংস বন্দিদের প্রদানের রেওয়াজ চালু করেছে।

৪.১.২ শিশুদের খাদ্য তালিকা

কারা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসারের সুপারিশ মোতাবেক কারাগারে মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের বয়স অনুযায়ী ৭নং সারণীতে উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার নিয়ম আছে।

৭ নং সারণী

শিশুদের খাদ্য তালিকা

শিশুর বয়স	খাদ্যদ্রব্যের নাম ও পরিমাণ
নবজাতক হতে ১২ মাসের নিম্নের বয়সের শিশু	প্রয়োজনমত পানির সাথে দুধ মিশিয়ে খাওয়ানো।
১২ মাস হতে ১৮ মাস বয়সের শিশু	দুধ ৬ ছটাক, চাউল ২ ছটাক, ডাল $\frac{১}{২}$ ছটাক।
১৮ মাস হতে ২৪ মাস বয়সের শিশু	দুধ ৪ ছটাক, চাউল ৪ ছটাক ও ডাল $\frac{১}{২}$ ছটাক।

কারাগারে মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের যে ধরনের খাদ্য প্রদান করা হয়, তা বাড়ন্ত শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের সুষ্ঠু ও সবলভাবে বেড়ে উঠার জন্য চাই সুষম খাদ্য ও পরিচর্যা।

৪.১.৩ বিদেশী বন্দিদের খাদ্য

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে বাঙ্গালী খাবারের উপযুক্ত ''ডায়েট স্কেল'' প্রথা চালু আছে। কিন্তু বিদেশী বন্দিদের চাহিদা মাফিক তাদের খাবার উপযুক্ত ডায়েট স্কেল আমাদের দেশে চালু নেই। ভারতীয় ছাড়া অনেক বিদেশী বন্দি বাংলাদেশের কারাগারে আটক হওয়ার পর বাঙ্গালী স্কেলের খাবার খেতে পারে না। তখন তারা প্রায়ই অভুক্ত থাকে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা হঠাৎ করে এ ধরনের খাবারে অভ্যস্ত হতে পারে না। ফলে শারীরিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে করে বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখে তারা আক্রান্ত হয়। ফলশ্রুতিতে বিদেশের মাটিতে বিদেশী বন্দিশালায় অসহায় দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করে বিদেশী বন্দিরা।

৪.১.৪ টেন্ডার পদ্ধতি

উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যগুলোর মধ্যে চাউল ও গম সরকারী খাদ্যগুদাম থেকে সরবরাহ করা হয়। অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যগুলো সরবরাহের নিমিত্তে ছয় মাস ভিত্তিক টেন্ডার আহ্বান করা হয়। সরকারী খাদ্য গুদাম থেকে প্রায়ই নিম্নমানের চাউল ও গম সরবরাহ করা হয়। তবে মাঝে মধ্যে ভাল চাউল, গমও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে ডাল ব্যতীত সব খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ নেয়ার জন্য জানুয়ারি হতে জুন এবং জুলাই হতে ডিসেম্বর ছয়মাস ভিত্তিক টেন্ডার আহ্বান করা হয়। আবার এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর হতে মার্চ ছয় মাস ভিত্তিক ডালের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এ টেন্ডার কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডি, আই, জি প্রিজন সভাপতিত্ব করেন এবং সংশ্লিষ্ট জিলার সিভিল সার্জন, জেল সুপার ও মার্কেটিং অফিসার সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকেন। দরপত্র দাখিলের পর্বেই সংশ্লিষ্ট জিলার সব কারা-ঠিকাদারগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের (যারা বরাবরই জেলখানায় ঠিকা প্রাপ্তিতে কাজ করেন) উদ্যোগে তাদের মধ্যে ‘‘নিগোশিয়েশন’’ করা হয়। এরপর দরপত্রে বর্তমান বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি দর দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়। সেই অনুসারে টেন্ডারের দিন নামমাত্র কয়েকটি দরপত্র দাখিল করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে টেন্ডার কমিটি টাকা খেয়ে দাখিলকৃত দরপত্র অনুমোদনের সুপারিশ করে কারা-অধিদপ্তর, ঢাকায় পাঠায়। এর প্রেক্ষিতে কারা-অধিদপ্তর নামেমাত্র পর্যালোচনা করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে টেন্ডারগুলো পাস করে দেন। টেন্ডারের এই অলিখিত ‘ওপেন সিক্রেট’ নিয়ম অনেকদিন থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। নিম্নে কয়েকটি কারাগারের টেন্ডার সময়কালের মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের টেন্ডারের অনুমোদিত দর অর্থাৎ যে দরে ঠিকাদারকে বিল দেয়া হয়েছে ও সেই সময়ে প্রচলিত বাজার দরের বিবরণ ৮ হতে ১১ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো ঃ-

<u>৮ নং সারণী</u>

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

কতিপয় দ্রব্যের নাম	১/১/৯৯ হতে ৩০/৬/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/১/২০০০ হতে ৩০/৬/২০০০ সময়ের দরপত্র		১/৭/২০০০ হতে ৩১/১২/২০০০ সময়ের দরপত্র	
	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)
রুই মাছ	১৫৪.০০	১৩৫.০০	১৫৯.০০	১৪০.০০	১৬১.৫০	১৪০.০০
মৃগেল মাছ	১৪০.০০	১২৫.০০	১৪৯.০০	১৩০.০০	১৫১.৫০	১৩০.০০
সিলভার কার্প মাছ	১২০.০০	৬০.০০	১২২.০০	৬৫.০০	১২৭.০০	৭০.০০
খাসীর মাংস	১৪৫.৫০	১৩০.০০	১৪৭.০০	১৩০.০০	১৪৭.০০	১৩০.০০
ছাগীর মাংস	১৪৫.০০	১২৫.০০	১৪৫.০০	১২৫.০০	১৪৫.৫০	১২৫.০০
গরুর মাংস	৮৮.৫০	৭০.০০	৮৭.৯০	৮০.০০	৮৯.৯০	৮০.০০
বেগুন	১৬.৫৫	৭.০০	১৬.৯০	৮.০০	১৭.০০	১০.০০
আলু	১২.৫০	৮.০০	১২.৯০	৯.০০	১২.৯০	৯.০০
মিষ্টি কুমড়া	১৬.০০	৫.০০	১৬.৫০	৬.০০	১৬.৫০	৭.০০
কাঁচা পেঁপে	১৩.০০	৫.০০	১২.৫০	৬.০০	১২.০০	৬.০০
সোয়াবিন তেল	৭৪.০০	৪৫.০০	৫৫.০০	৩২.০০	৫৪.০০	৩২.০০
আম খড়ি	৩.৩৫	২.০০	৩.৩৫	২.২৫	৩.৩০	২.২৫
আখের গুড়	৩২.৮৫	১৮.০০	৩৩.৭০	১৮.০০	৩৩.০০	২৪.০০

৯ নং সারণী

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

কতিপয় দ্রব্যের নাম	১/১/৯৯ হতে ৩০/৬/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/৭/৯৯ হতে ৩১/১২/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/১/২০০০ হতে ৩০/৬/২০০০ সময়ের দরপত্র		১/৭/২০০০ হতে ৩১/১২/২০০০ সময়ের দরপত্র	
	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)
রুই মাছ	১৫৫.০০	১০০.০০	১৫৯.৮০	১০০.০০	১৬০.০০	১২০.০০	১৬০.০০	১৩০.০০
মৃগেল মাছ	১৪০.০০	৮০.০০	১৪৯.০০	৮০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	১২০.০০
সিলভার কার্প মাছ	১১০.০০	৫০.০০	১১২.০০	৫০.০০	১২৩.০০	৫৫.০০	১২০.০০	৬০.০০
খাসীর মাংস	১৪৫.০০	১২০.০০	১৪৫.০০	১২০.০০	১৪৫.০০	১২৫.০০	১৪৫.০০	১২৫.০০
ছাগীর মাংস	১৪৫.০০	১০০.০০	১৪৫.০০	১০০.০০	১৪৩.০০	১০০.০০	১৪২.০০	১০০.০০
গরুর মাংস	৮৭.০০	৬০.০০	৮৮.০০	৬৫.০০	৮৭.৫০	৭০.০০	৮৮.০০	৭০.০০
বেগুন	১৬.০০	৮.০০	১৮.০০	৮.০০	১৬.০০	৮.০০	১৬.৫০	১০.০০
আলু	১২.০০	৭.০০	১২.৯০	৮.০০	১২.৫০	৭.০০	১৩.০০	৮.০০
মিষ্টি কুমড়া	১৩.৫০	৫.০০	১৪.০০	৪.০০	১৪.০০	৫.০০	১৫.০০	৫.০০
কাঁচা পেঁপে	৯.৯৭	৩.০০	১১.০০	৩.০০	১১.০০	৪.০০	১২.০০	৩.০০
সোয়াবিন তেল	৭৩.০০	৪৫.০০	৭৩.০০	৩২.০০	৫৪.০০	৩২.০০	৫৩.০০	৩২.০০
আম খড়ি	৩.১৮	২.০০	৩.২৫	২.১৫	৩.২৫	২.১৫	৩.২৫	২.১৫
আখের গুড়	২৮.০০	১৮.০০	৩১.৫০	২৪.০০	৩১.৪৫	২৪.০০	৩২.৪০	২৪.০০

১০ নং সারণী

নাটোর জেলা কারাগার

কতিপয় দ্রব্যের নাম	১/১/৯৯ হতে ৩০/৬/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/৭/৯৯ হতে ৩১/১২/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/১/২০০০ হতে ৩০/৬/২০০০ সময়ের দরপত্র		১/৭/২০০০ হতে ৩১/১২/২০০০ সময়ের দরপত্র	
	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)
রুই মাছ	১৩২.০০	৯০.০০	১৪৩.০০	৯০.০০	১৪৮.৫০	১০০.০০	১৪৮.৫০	১০০.০০
মৃগেল মাছ	১২১.০০	৭৫.০০	১১০.০০	৭৫.০০	১২১.০০	৮০.০০	১২১.০০	৮০.০০
সিলভার কার্প মাছ	৮২.০০	৫০.০০	৯০.০০	৫০.০০	৮৮.০০	৫৫.০০	১০০.০০	৬০.০০
খাসীর মাংস	১৩৯.০০	১০০.০০	১৪২.০০	১১০.০০	১৪৭.০০	১১০.০০	১৪৮.৪০	১২০.০০
ছাগীর মাংস	১৩০.০০	৯০.০০	১৩২.০০	৯০.০০	১৩২.০০	৯০.০০	১৩১.৯০	১০০.০০
গরুর মাংস	৭৯.০০	৬০.০০	৮২.০০	৬৫.০০	৮৮.০০	৭০.০০	৮৮.০০	৭০.০০
বেগুন	১৩.২০	৫.০০	১৫.৪০	৬.০০	১৪.৩০	৬.০০	১৪.৩০	৭.০০
আলু	১১.০০	৫.০০	১১.০০	৭.০০	১৩.১০	৬.০০	১০.০০	৮.০০
মিষ্টি কুমড়া	১১.০০	৪.০০	৮.৮০	৪.০০	১৩.২০	৫.০০	১১.০০	৬.০০
কাঁচা পেঁপে	১০.০০	৩.০০	৯.৯০	৩.০০	৮.৮০	৩.০০	১০.০০	৩.০০
সোয়াবিন তেল	৬২.০০	৪৫.০০	৪৬.২০	৩২.০০	৪৪.০০	৩২.০০	৪৪.০০	৩২.০০
আম খড়ি	২.৯৭	১.৭৫	২.৯৫	২.০০	৩.০৩	২.০০	৩.১০	২.০০
আখের গুড়	২৮.০০	১৬.০০	২৬.৪০	২২.০০	২৬.৪০	১৮.০০	৩৩.০০	২০.০০

১১ নং সারণী
বগুড়া জেলা কারাগার

কতিপয় দ্রব্যের নাম	১/১/৯৯ হতে ৩০/৬/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/৭/৯৯ হতে ৩১/১২/৯৯ সময়ের দরপত্র		১/১/২০০০ হতে ৩০/৬/২০০০ সময়ের দরপত্র		১/৭/২০০০ হতে ৩১/১২/২০০০ সময়ের দরপত্র	
	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)	কারাগারের গৃহীত দর (প্রতি কেজি)	প্রকৃত বাজার দর (প্রতি কেজি)
রুই মাছ	১৫৪.৯৮	১১০.০০	১৫৬.৫০	১১৫.০০	১৬০.০০	১২০.০০	১৫৯.৯৯	১২০.০০
মৃগেল মাছ	১৪২.৯৮	৮০.০০	১৪৫.০০	৮০.০০	১৪৫.০০	৯০.০০	১৪৫.০০	৯০.০০
সিলভার কার্প মাছ	৯৪.৫০	৫০.০০	৯৫.০০	৫০.০০	৯৯.০০	৫৫.০০	৯৯.০০	৫৫.০০
খাসীর মাংস	১৪২.৯০	১১০.০০	১৪৩.০০	১১০.০০	১৪৫.০০	১২০.০০	১৪৫.০০	১২০.০০
ছাগীর মাংস	১৩৪.০০	৯০.০০	১৩৫.০০	৯০.০০	১৩৮.০০	১০০.০০	১৩৯.০০	১০০.০০
গরুর মাংস	৮৭.০০	৬০.০০	৮৬.৯০	৬৫.০০	৮৮.০০	৭০.০০	৮৮.০০	৭০.০০
বেগুন	১৫.০০	৬.০০	১৫.৯৫	৮.০০	১৪.৯৮	৮.০০	১৫.৪৮	১০.০০
আলু	৯.৩৫	৪.০০	৯.০৭	৮.০০	১১.৫০	৪.০০	১২.০০	৯.০০
মিষ্টি কুমড়া	১০.৪০	৪.০০	৯.০০	৫.০০	১৩.৯৫	৪.০০	১৩.০০	৫.০০
কাঁচা পেঁপে	৯.৯০	৩.০০	৯.৭৫	৩.০০	১০.৯০	৩.০০	১১.৪৮	৩.০০
সোয়াবিন তেল	৬৪.৫০	৪৫.০০	৫৭.০০	৩২.০০	৫২.০০	৩২.০০	৫২.০০	৩২.০০
আম খড়ি	৩.০৯	১.৪০	৩.১৪	১.৫০	৩.১৬	১.৬০	৩.১৯	১.৬০
আখের গুড়	২৬.৯৫	১৮.০০	২৭.৯৮	২০.০০	২৮.৫০	১৮.০০	২৯.৫০	২১.০০

উপরে উল্লিখিত বিবরণীতে যেকটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; এছাড়াও ১৪৯টি খাদ্যদ্রব্যের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। প্রতিটি কারাগারে টেন্ডারের সকল দ্রব্যের পাসকৃত দরের ঐ একইরূপ। প্রতিবারই মঞ্চে আলোর তারতম্য ঘটে। কিন্তু বার বার একই অংক অভিনীত হয়। উপরিউক্ত দ্রব্যগুলোর প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিল প্রদানের শতকরা গড় হিসাব নিচে ১২ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ-

১২ নং সারণী
বাজারদর অপেক্ষা বেশী মূল্য প্রদানের শতকরা হিসাব

দ্রব্যের নাম	প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা বেশী মূল্য প্রদানের শতকরা হিসাব (২ বছরের গড়)
রুই মাছ	৩৫.২৪%
মৃগেল মাছ	৫৮.২১%
সিলভার কার্প মাছ	৮৯.৪০%
খাসীর মাংস	২২.০১%
ছাগীর মাংস	৩৬.৫৫%
গরুর মাংস	২৭.১৯%
বেগুন	১০৪.৮৩%
আলু	৬১.৪২%
মিষ্টি কুমড়া	১৬৫.৮৩%
কাঁচা পেঁপে	২০০.৩৭%
সোয়াবিন তেল	৬১.২২%
আম খড়ি	৬৫.১৩%
আখের গুড়	৪৮.৩৯%

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে সরবরাহকৃত প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা গড়ে ৭৫.০৬% বেশি দামে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার মালামাল সরবরাহ করলে ১,৭৫,০৬০.০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। অথচ এই টাকার সিংহভাগই কারাকর্মকর্তাগণ বিভিন্ন কায়দায় কারা-ঠিকাদারদের নিকট থেকে আদায় করে নেন। ফলে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের কারণে প্রতিবছর সরকারের কোটি কোটি টাকা তছরূপ হচ্ছে।

৪.১.৫ নিম্নমানের দ্রব্যাদি সরবরাহের উদাহরণ

খাদ্য কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে প্রবেশ করানোর সময় থেকেই চুরি শুরু হয়।[১১৬] খাবারের ক্ষেত্রে জেলে দুর্নীতির শুরু "সাপ্লাই" থেকে। ঠিকা প্রাপ্তি এসব পণ্যের পরিমাণ ও মান নির্ণয় ও সরবরাহ সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি রয়েছে। ওজন ও মাপে ব্যাপক হেরফের থাকলেও "রিসিভ" দেখানো হয় নির্ধারিত মাত্রায়।[১১৭]

কেস-৬

<u>জেলখানার খাবার সম্পর্কে ভুক্তভোগীদের কথা</u>

ঢাকা জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নিয়াজ আহমেদের বর্ণনায়- রাতে বালি আর কাঁকর মেশানো ভাত আর সব্জি। সব্জি বলতে ১মণ পানির সাথে ১ কেজি লাউ, কুমড়ো বা আলু মিশেল। দুপুরে একই প্রকার ডাল-ভাত বা রুটি-ডাল। বন্দিদের জন্য যে খাবার বরাদ্দ হয়, তার অধিকাংশই লোপাট হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে। (০৪/০৪/১৯৯৯ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা)। নিরাপদ-হেফাজত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতী বলেন- কারাগার থেকে যে খাবার দেয়া হতো তা দিয়ে ক্ষুধা মিটতো না। বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজন খাবার দিয়ে গেলেও তার ভাগ দিতে হতো ম্যাট্রনকে। তবে ভাল খাবার গোপন ব্যবস্থাও ছিল। (০৫/০৪/১৯৯৯ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা)। নিরাপদ হেফাজত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ফাহিমা বলেন-ঢাকা জেলে বন্দিদের জন্য যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা এক কথায় অখাদ্য। সকালের রুটি থাকে কাঁচা না হয় আধ-পোড়া। দুপুরের ভাতে ময়লা ও পোকায় ভরা, ডালেরও একই অবস্থা। তরিতরকারী না ধুয়েই রান্না করা হয়; কাদা, বালি, মাটি সব পাওয়া যায় (১৫/০৬/১৯৯৯ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা)। সকালে নাস্তার ছোট একটি রুটির সাথে এক চিমটি গুড়, দুপুরে ২টি রুটির সাথে সামান্য পরিমাণ ডাল এবং বিকেলে মোটা চালের ভাতের সাথে সামান্য সব্জি। বিষয়গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জানা থাকলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেন না (৩০/০৯/২০০০ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা)।

[১১৬] ২২.১২.৯৬ ইং তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[১১৭] আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫, পৃঃ-৪২।

পূর্বেই বলা হয়েছে বন্দিদের জন্য চাউল,গম ব্যতীত সকল দ্রব্যই ঠিকাদারের মাধ্যমে নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কারাগারের চাহিদা মোতাবেক ঠিকাদার মালামাল সরবরাহ করে থাকে। তবে টেন্ডার সিডিউলে উল্লিখিত দ্রব্যের মান থেকে নিম্নমানের দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। এর কারণ বহুবিধ। নিম্নে সংক্ষিপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করা হলো ঃ-

১। ধরা যাক কোন কারাগারে বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য ৪০ কেজি রুই মাছের প্রয়োজন। এর প্রেক্ষিতে ৪০ কেজি রুই মাছ সরবরাহ করার জন্য ঠিকাদারকে আদেশ দেয়া হলো। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী টাটকা ভাল প্রতিটি **১** কেজি ওজনের মাছ সরবরাহ করার কথা। ঠিকাদার তা না করে ২৫০ গ্রাম থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের ছোট ছোট রুই মাছ কম দামে কিনে ঝুড়িতে সাজানোর পর ঝুড়ির উপরের অংশে কয়েকটি বড় রুই মাছ সাজিয়ে জেল খানায় সরবরাহ করেন।

আবার কারাগার থেকে রুই মাছ সরবরাহের আদেশ দেয়া হল। কিন্তু ঠিকাদার রুই মাছ না কিনে সিলভারকার্প বা অন্য কোন কম দামের মাছ কিনে কারাগারে সরবরাহ করে থাকেন। যা সরবরাহের সময় কাগজে কলমে রুই মাছ দেখানো হয়।

২। ধরা যাক কোন কারাগারের বন্দিদের খাবারের জন্য ১০০ কেজি খাসীর মাংসের প্রয়োজন হওয়ায় তা সরবরাহ করার জন্য ঠিকাদারকে আদেশ দেয়া হলো। এখন টেন্ডারের শর্তানুযায়ী প্রতিটি খাসীর মাংস ৮/৯ কেজির কম নয় এমন সুস্থ-সবল খাসী কারা কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে কারা এলাকার নির্ধারিত স্থানে জবাই পূর্বক মাংস সরবরাহ করার কথা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার রুগ্ন, অসুস্থ, বয়স্ক ছাগী (বকরী) বা ভেড়া জবাই করে খাসীর মাংস হিসেবে কারাগারে সরবরাহ করে থাকেন।

৩। ধরা যাক কোন কারাগারের বন্দিদের খাবারের জন্য **১**০০০ কেজি করলা বা পটলের প্রয়োজন হওয়ায় তা সরবরাহ করার জন্য ঠিকাদারকে হুকুম দেয়া হলো। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বাজারের সবচেয়ে নিম্নমানের যে কোন তরকারী কিনে করলা বা পটল হিসেবে সরবরাহ করে থাকেন।

৪। নমুনার সাথে মিলিয়ে ডাল সরবরাহ নেয়ার কথা থাকলেও কোন জেলেই তা করা হয় না। ঠিকাদার নিজের ইচ্ছামত নমুনার চেয়ে অনেক নিম্নমানের ডাল সরবরাহ করেন। তবে স্টাফের রেশনের ডাল নমুনার সাথে না মিললেও কিছুটা ভাল ডাল তাঁরা দেন।

৫। যে সব কারাগারে জ্বালানি গ্যাসের ব্যবস্থা নেই; সেসব কারাগারে বন্দিদের রান্নার জ্বালানি হিসেবে আমখড়ি সরবরাহ করা হয়। খড়ি সরবরাহের সময় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার আম খড়ির সাথে অন্যান্য কমদামী খড়ি, আম খড়ি হিসেবেই সরবরাহ করেন।

৪.১.৬ নিম্নমানের দ্রব্যাদি সরবরাহের কারণ

মালামাল সরবরাহে এত অনিয়ম! তাহলে কারা-কর্তৃপক্ষ কি ঠিকাদারদের নিকট জিম্মি? আসল ঘটনা তার উল্টো। কারা-ঠিকাদারের মালামাল সরবরাহে অনিয়ম ও নিম্নমানের দ্রব্যাদি সাপ্লাইয়ের বহুবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

ক. ঠিকাদারকে বিলের উপর ৬% কমিশন প্রদান করতে হয়। এই কমিশনের টাকা [Commission Money (C.M.)] সুপার, জেলার ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা রেশিও অনুসারে ভাগ করে নেন।

খ. জেলখানায় যে কোন মালামাল সরবরাহের সময় দ্রব্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের (ফিটনেস) জন্য সুপার ও জেলারকে টাকা কিংবা সেই দ্রব্যাদি দিতে হয়। সরবরাহকৃত মালামাল ত্রুটিমুক্ত হলেও নজরানা দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। নইলে ঠিকাদার বিভিন্ন হয়রানির শিকার হন।

গ. বিশেষ করে মাছ, মাংশ সরবরাহকারী ঠিকাদারকে নিয়মিতভাবে জেলার ও সুপারের বাসার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও মাছ, মাংস কিনে দিতে হয়। অথবা মাছ, মাংস কেনার জন্য টাকা দিতে হয়।

ঘ. মাছ, মাংস ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের জন্যেও ঠিকাদারের সাথে সুপার ও জেলারের মাসিক একটা অংকের টাকার অলিখিত চুক্তি থাকে।

ঙ. ঠিকাদারের মালামাল গেটে প্রবেশ করলেই গেট রক্ষী তার প্রয়োজন অনুসারে সেখান থেকে বখরা আদায় করেন।

চ. যে সব বন্দি গেটে মালামাল ওজন করে এবং বুঝে নেয় তাদেরকে খুশি রাখার জন্য বিড়ি-সিগারেট এবং নগদ কিছু টাকা গোপনে হাতে ধরিয়ে দিতে হয়।

৪.১.৭ দ্রব্যাদি কম দেয়ার মুনাফা

আমরা প্রায়ই পত্রিকান্তরে লক্ষ্য করি যে, অনেক জেলে বন্দিদের ঠিকমত খাবার দেয়া হয় না; তারা যে খাবার পায় তাতে তাদের পেট ভরে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই বন্দিদের রেশন সামগ্রী সঠিকভাবে না দিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে কম দেয়া হয়। এখানে মজার ব্যাপার হলো খাবার জিনিস কম দেয়ার পর খাওয়া শেষ হলেই ঝামেলা শেষ। কারাগারগুলোতে চাউল, আটা ও সব্জি প্রতিদিন কম দেয়া হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য সব দ্রব্যই $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ কম দেয়া হয়। আর এই প্রতিদিন কম দেয়ার ফলে সারা মাসে সঞ্চিত দ্রব্যাদি সরবরাহ দেখিয়ে ঠিকাদারের নামে বিল করা হয়। এতে এ বিলের টাকা ঠিকাদার পায় ৪০% এবং কর্তৃপক্ষ পায় ৬০%।

হঠাৎ যে কোন লোক জেল খানা গেলে বুঝতেই পারবে না যে বন্দিদের খাবার কম দেয়া হচ্ছে। তেল কম দিয়েছে আপনি রান্নার পর বুঝবেন কি করে? মসলার পরিমাণ ঠিক আছে আপনি নিশ্চিত হবেন কি ভাবে? ডাল রান্নার পর আপনি সহজে বুঝতেই পারবেন না যে ডালের পরিমাণ কম। তরকারী তো নয় সব যেন ঘাঁটি, তাহলে পানি মিশিয়েই এর কমতি পূরণ করতে কোন অসুবিধা নেই। আসল কথা জেলখানা একটা আলাদা জগত। এখানের খোঁজ-খবর কেউ বেশি একটা নেয় না। তারপরও আমরা যে একটু আধটু জানতে পারি তা ছিটে ফোটা মাত্র। এখানে খাদ্য দ্রব্য ও টেন্ডারে হয় পুকুর চুরি।

৪.১.৮ রেশন ও খাবার পাচার

এখন বেশির ভাগ কারাগারে গম ভাংগানো মেশিন বসানো হয়েছে। যে সব জেলে গম ভাংগানো মেশিন নেই; সেখানে ঠিকাদারের মাধ্যমে বাইর থেকে গম ভাংগানো হয়। যে সব কারাগারে গম ভাংগানো মেশিন আছে, সেখানে সরকারী গুদাম থেকে চাউল, গম উঠানোর পর কারাগারে পৌঁছানোর আগেই ''ওপেন সিক্রেট'' পদ্ধতিতে কয়েক বস্তা চাউল, গম বিক্রি করে দেয়া হয়। অথবা চাউল ও গমের পুরো চালানটিই কারাগারে জমা করার পর স্টাফের রেশনের সাথে অতিরিক্ত কয়েক বস্তা চাউল, গম বাইরে এনে গোপনে বিক্রি করা হয়। আবার যেসব কারাগারে গম ভাংগানো মেশিন নেই; সেখানে বাইরে গম ভাংতে দেয়ার সময় ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশ করে অতিরিক্ত চাউল গম বাইরে নিয়ে বিক্রি করা হয়। এ ক্ষেত্রে সুপার বা জেলারের ভূমিকাই মুখ্য। তাঁরা যেভাবে তাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারেন; সেভাবেই তাঁরা উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বিক্রিত চাউল / গমের মূল্য সুপার, জেলার, জেল গুদামে নিয়োজিত কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কয়েকজন তাঁদের "রেশিও" অনুসারে ভাগ করে নেন। এ সব ঘটনা কারাগারের সাধারণ কর্মচারীরা জানতে পারে না। আবার অনেকে টের পেলেও চাকুরী যাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পায় না। দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রতিনিয়ত এসব চিত্র। বাংলাদেশের এমন কোন কারাগার নেই যেখানে বন্দিদের রেশন সামগ্রী কম দেয়া হয় না।

বন্দিদের ক্রীতদাস ছাড়া মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা বর্তমানে বাংলাদেশের কারা কর্তৃপক্ষের নেই। তাই যখন যে হুকুম তখন সেই কাজ চাই। এমনিতেই বন্দিদের পেটপুরে খাবার হয় না, তার ওপর জেলখানার কর্তাব্যক্তিদের গরু , ছাগল, হাঁস, মুরগীর খাবারের জন্য প্রতিদিন প্রতিটি কারাগার থেকে ভাত, রুটি,ডাল বাইরে আনা হয়। একেক জনের গরু ,ছাগল, হাঁস-মুরগীর বহর দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এ যেন সরকারী কোন ডেইরী বা পোল্ট্রি ফার্ম। এসব ফার্ম পরিচালনা করতে কর্তাব্যক্তিদের কোন বেগ পেতে হয় না। সাজা প্রাপ্ত বন্দি ও কারারক্ষীদের দ্বারা গরু , ছাগল, হাঁস-

মুরগীর পরিচর্যা করানো হয়। বাংলাদেশের কারা পরিবেশ এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে গরু-ছাগলকে খাওয়ানো হচ্ছে। হায়রে মানবতা, আর কোথায় মানবাধিকার !

কারাগারে রান্না পদ্ধতির জটিলতার কারণে এমনিতেই খাবারের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর চাউল, আটা কম দেয়া এবং গরু , ছাগল, হাঁস-মুরগীর জন্য খাবার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কারণে বন্দিরা যে পরিমাণ খাবার পায়, তাতে তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় না। পূর্বেই রান্না পদ্ধতির জটিলতার কথা বলা হয়েছে। এই জটিলতার কারণে রান্নার কাজে নিয়োজিত সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে একাধিক বন্দি সংশ্লিষ্ট গার্ডিং স্টাফের[১১৮] সহায়তায় ভাত, রুটি, তরকারী, মাছ, মাংস রান্নার সাথে সাথে কিছু পরিমাণ অন্যত্র সরিয়ে রাখে। এই সরিয়ে রাখা খাবারগুলো নগদ টাকা বা বিড়ি, সিগারেট, সাবানের বিনিময়ে সাধারণ বন্দিদের নিকট গোপনে বিক্রি করে থাকে। মোট কথা হলো যারা অর্থশালী তাদের জেলখানায় শুধু খাবারের নয় অন্য কোন অসুবিধাই তাদের হয় না। জেলখানার ভেতরে বসে টাকা খরচ করলে সবই পাওয়া যায়। এছাড়াও যে সব কারারক্ষী জেলের ভেতরে ডিউটি করে, তাদের সবাই নিয়মিতভাবে বন্দিদের জন্য রান্না করা খাবার খায়।

বন্দিদের রেশন সামগ্রী কম দেয়া, রান্নাকরা খাবারের একটি অংশ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর জন্য বাইরে পাচার, রান্না ঘর থেকে খাবার চুরি ও কারারক্ষীদের উদর পূর্তির পর সাধারণ বন্দিদের জন্য আর কতটুকু খাবার অবশিষ্ট থাকে? মোদ্দা কথা কারাগারের প্রথম দুর্নীতি শুরু হয় খাবার থেকে।

৪.১.৯ রান্নার মান খারাপের কারণ

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার ২ বা ৩ গুণ বেশি বন্দি প্রতিনিয়তই আটক থাকছে। কিন্তু প্রতিটি কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্দিদের রান্না ঘর তৈরী করা হয়েছে। রান্না ঘরকে জেলের ভাষায় চৌকা বলা হয়। এ সব চৌকায় ২/৩ গুণ বেশি লোকের রান্না হওয়ার কারণে রান্না করতে অনেক বেশি সময়ের দরকার হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রান্না করা খাবারের মান ঠিক থাকছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাত তিনটা থেকে সকালের নাস্তার রুটি একযোগে বানানো শুরু হয়। রুটিগুলো আগুনে বা তাওয়ায় সেকে সেকে একজায়গায় রাখা হয়। সকাল ৮টায় বন্দিদের নাস্তা দেয়ার সময় দেখা যায় নিচের রুটিগুলো ঘেমে ঘেমে কাঁচা হয়ে গেছে। তাহলে এ রুটি কি খাওয়ার যোগ্যতা রাখে ? তবুও বন্দিরা প্রতিনিয়তই এ ধরনের রুটিই খাচ্ছে। আবার ভাত বা তরকারীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নিচের অংশের ভাত পচে যাওয়ার মত হয়ে যায়। তরকারী হয়ে যায় বিস্বাদ। এটাকে তরকারী বা ঘাটি না বলে মতিয়া চৌধুরীর ভাষায় "ঘ্যাট" বলাই উত্তম। মাছ, মাংসের স্বল্পতার সমস্যা এড়াতে কারা কর্তৃপক্ষ একদিন পর পর মাছ, মাংস বিতরণ করে থাকেন। খাদ্য নিয়ে দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন সময়ই জেলে দাবী উঠেছে, আসামীদের যৌথভাবে রেশন বুঝে নেয়ার।[১১৯] ভেতরে ডিউটিরত সর্বপ্রধান কারারক্ষী ও প্রধান কারারক্ষীরা বিশেষভাবে রান্না করা খাবার প্রতিদিন খায়। একটি বিশেষ কক্ষে তাদের এ খাবারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই ঘটে চলেছে এসব বাস্তব চিত্র। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে প্রাণ বাঁচে কিরূপে?[১২০]

প্রতিটি কারাগারেই বন্দিরাই পাচকের কাজ করে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা বেতনভুক্ত কোন পাচক বা বাবুর্চি নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। ফলে খাবারের মান, স্বাদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে না। এ ছাড়াও অধিক সংখ্যক বন্দির একত্রে একটি চৌকায় খাদ্য প্রস্তুত করার ফলে রান্নার কাজ সমাধা করে বন্দিদের মধ্যে বিতরণ করতে অধিক সময় ব্যয় হয়। এতেও খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় এবং বিতরণের কাজে বিঘ্ন ঘটে। এর ফাঁকে খাবার পাচার ও চুরিও হয়।

---

[১১৮] কারারক্ষী, প্রধান কারারক্ষী ও সর্বপ্রধান কারারক্ষীদের গার্ডিং স্টাফ বলা হয়।

[১১৯] আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫,পৃ-৪৩।

[১২০] বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃ-৮৭।

৪.১.১০ বিশেষ দিনে খাবার

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে নিম্নলিখিত বিশেষ কয়েকটি দিনে বন্দিদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। এ উন্নতমানের খাবারের জন্য সরকার বন্দিদের মাথা পিছু ১০.০০ টাকা করে বরাদ্দ দিয়ে থাকেন।

১। ঈদুল ফিতরের দিন।
২। ঈদুল আযহার দিন।
৩। স্বাধীনতা দিবস।
৪। বিজয় দিবস।
৫। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর দিন।

উক্ত বিশেষ দিনগুলো আসার কমপক্ষে এক মাস আগে থেকেই বন্দিদের দৈনন্দিন প্রাপ্য বরাদ্দ হতে কিছু কিছু রেশন সামগ্রী কর্তন করে সঞ্চয় রাখা হয়। এ কর্তনকৃত সঞ্চয় দ্রব্যের মূল্য ও সরকারী বরাদ্দ দশ টাকা সহযোগে নির্ধারিত দিনে বন্দিদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। ঐ সব বিশেষ দিনগুলিতে কারাকর্মকর্তা /কর্মচারীদের মধ্যে ভুরিভোজের মহা রোল পড়ে যায়। বন্দিদের খাওয়ার আগেই অফিসারগণ অফিস কক্ষেই ভোজন পর্ব সেরে নেন। অন্যরা তাদের সুবিধামত স্থানে খাওয়ার কাজ সেরে ফেলে। আবার রমজান মাসে বন্দিদের ইফতারির জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রী হতে কর্মকর্তা / কর্মচারীরা কিছু অংশ বাইরে পাচার করে নিয়ে আসে। তবে সবাই যে এ সব করে তা ঠিক নয়। আবার ভালোর সংখ্যাও বেশি বলা যাবে না। কারাগারের ৯৫% কর্মকর্তা, কর্মচারী এই প্রাক্টিসে অভ্যস্ত । অনেক জেলে এমনও দেখা গেছে যে, অফিস চলাকালে বেলা ১১/১২টার সময় ভেতরে বিশেষভাবে নাস্তা তৈরী করে অফিসে এনে মহা উল্লাসে কর্মকর্তাগণ নাস্তা পর্ব সেরে নেন। যদিও সঞ্চয় করার কোন বিধান নেই। তবুও দীর্ঘদিন থেকে এ নিয়ম চলে আসছে। এছাড়াও রমজান মাসে রোজাদার বন্দির ইফতারির জন্য মাথাপিছু সাত টাকা করে বরাদ্দ করা হয়।

সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দুদের এবং খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কোন দিনে উন্নতমানের খাবার প্রদানের জন্য সরকারীভাবে কোন বরাদ্দ দেয়া হয় না। এই কারণে কর্তৃপক্ষও সে ধর্মের বিশেষ দিনে কোন ব্যবস্থা নেন না। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের চরম অবহেলার বহিঃপ্রকাশ এখানে পাওয়া যায়।

৪.১.১১ বন্দি স্থানান্তরকালে এবং নতুন বন্দিদের খাবার

বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের সময় খাওয়া খরচ বাবদ ৮ (আট) টাকা প্রদান করা হয়। এই দুর্মূল্যের বাজারে আট টাকায় একজনের একবেলা পেটপুরে খাওয়া তো দুরের কথা অর্ধ পেট খাওয়াও হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন বন্দির চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ট্রেনযোগে সিলেট জেলে স্থানান্তরে তিনদিন সময় লাগে। এক্ষেত্রে আট টাকায় তিনদিনে সে কি খাবে ? তখন অনাহার বা অভুক্ত থাকা ছাড়া তার কোন পথ খোলা থাকে না। কর্তৃপক্ষ বন্দিদের যে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কারাগারে সাধারণতঃ বিকাল বা সন্ধ্যায় নতুন বন্দির আগমন ঘটে। এ সমস্ত নবাগত বন্দিদের সেই রাতে কোন খাবার দেয়ার নিয়ম নেই। কাজেই নবাগতদের কারাগারে আগমনের প্রথম রাতে অনাহারে রাখা হয়। সরকার ঘোষণা দেয় দেশে কেউ অনাহারে থাকবে না। অথচ সরকারী প্রতিষ্ঠানেই না খেয়ে রাত কাটাতে হয়। তাহলে আমরা এর প্রতিকার চাইব কার কাছে? এছাড়াও বিচারাধীন বন্দিরা সকাল ১০টায় হাজিরা দেয়ার জন্য কোর্টে যায়। কোর্টে তাদের দুপুরের খাবার দেয় না। কোর্টের কাজ শেষে ফিরতে ফিরতে তাদের সন্ধ্যা কিংবা রাতও হয়ে যায়। অভুক্ত অবস্থায় কেটে যায় সারাদিন। তাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অনাহারী দীর্ঘশ্বাস বন্দিদশার প্রাচীর ভেদ করে বাইরের আলোর মুখ দেখতে পায় না। মানবাধিকার মাথা ঠুকে মরে চার দেয়ালের মাঝে। তবুও দেখার কেউ নেই এই অসহায় বন্দিদের। এমনিভাবেই চলছে বন্দিদের জীবন যাপন।

৪.১.১২ সবার গ্রহণযোগ্য খাবার ও খাবারের স্থান

কারাগারে বিভিন্ন ধর্মের লোক বন্দি হিসেবে আটক থাকে। প্রতিটি কারাগারেই সাধারণ বন্দিদের জন্য একটি রান্নাঘরে পাক-শাকের কাজ চলে। এখানে সব ধর্মের বন্দিদের জন্য একই সংগে অভিন্ন পাতিলে রান্না করা হয়। ফলে গরুর মাংস পাক হওয়ার কারণে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। তবে ১৯৯০ সনের পূর্বে কারাগারে গরুর মাংস প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৯০ সনে তদান্তীন সরকার কারাগারে গরুর মাংস প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করেন।

কেস-৭

<u>কারাগারে গরুর মাংস সরবরাহের প্রতিবাদ</u>

বরিশাল হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কারাগারসমূহে গরুর মাংস সরবরাহের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার এবং পূর্বের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার দাবী করেছে।

উৎস ঃ- ২০/০৯/৯০ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা।

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এমন কোন কাজ করা যাবে না; যে কাজ অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। কিন্তু আমাদের দেশের জেলখানা তথা সরকারী প্রতিষ্ঠানেই অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানামূলক সংবিধান বিরোধী উক্ত কাজ-কর্ম প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে।

আমাদের দেশের কারাগারসমূহে বন্দিদের খাবারের জন্য আলাদা কোন কক্ষ বা ডাইনিং রুম নেই। বন্দিরা ঘরের বারান্দায় বা গাছের নিচে কিংবা ওয়ার্কশেডে বসে তাদের খাবার খেয়ে থাকে। বর্ষা বাদলের দিনে এবং রমজান মাসে শোবার ঘরের বিছানায় বসে খাবার খেয়ে থাকে। এতে শোবার ঘরের বা ওয়ার্ডের বা শেলের পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই নোংরা হয়ে পড়ে। তবে স্বল্প সংখ্যক কারাগারে ফিডিং শেড থাকলেও তা মানবতার মানদণ্ডে বিবেচনা করা যায় না। এখানে হাঁটু গেড়ে বসে খাবার খেতে হয়। ঝড় বৃষ্টির দিনে এসব শেডে বসার উপযোগিতা থাকে না। তখন শোবার ঘরের বিছানায় বসেই খেতে হয়।

বাংলাদেশের কারাগারে বন্দিদের খাবারের জন্য জায়গা নেই বললেই চলে। কারা পরিবেশ উন্নত করার পাশাপাশি খাবারের সুন্দর জায়গাও প্রয়োজন। আইনের বেড়াজালে কষ্ট হলেও মানুষ বন্দিত্বকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। এ বন্দিজীবনেও মানুষ ক্ষণিকের জন্য হলেও সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ প্রত্যাশা করে। কিন্তু আমরা স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও সেই প্রত্যাশা কি পূরণ করতে পেরেছি ? কারাগারে বন্দিরা যে অবস্থায় খাবার খায়, তা গরু -ছাগলের পরিবেশকেও হার মানায়।

৪.১.১৩ খাবারের মান, অতিরিক্ত রেশন ও গায়ে মাখার তেল

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কারাগারসমূহে সাধারণ বন্দিদের জন্য প্রচলিত ডায়েট স্কেলে ক্যালোরিক মান হিসেবে ভিটামিন এ, বি$_2$ এবং সি নাই বললেই চলে। এর কারণে বন্দিদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরির ঘাটতি থেকে যায়।

বর্তমানে প্রচলিত ডায়েট স্কেল অনুসারে যে পরিমাণ লবণ প্রদান করা হয়; তার সম্পূর্ণটাই বন্দিদের প্রয়োজন হয় না। তাই মাস শেষে প্রতিটি কারাগারের গুদামে লবণ বেশি হয়ে যায়। তখন উদ্বৃত্ত পরিমাণ লবণ কাগজ-কলমে সরবরাহ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারের নামে বিল উঠিয়ে নেন। এছাড়াও কারাকর্মকর্তাদের গরু -ছাগলকে খাওয়ানো এবং বাসায় ব্যবহারের জন্য তাঁরা লবণ কিনেন না। ঐ লবণ পাচার করে এনে কাজ চালিয়ে নেন। বাংলাদেশের কারাগারে এমন একজনও কর্মকর্তা নেই যিনি বাজার থেকে লবণ কিনে তাঁর গরু-ছাগলকে খাওয়ান।

যতই দামী খাবার হোক না কেন; রান্না ভাল ও সুস্বাদু না হলে কেউই তৃপ্তিসহকারে খেতে পারে না। কারাগারে যে ডাল রান্না করা হয়, তাতে নিয়ম না থাকায় কাঁচা মরিচ দেয়া হয় না। ফলে ডালের স্বাদ (Taste) তত ভাল হয় না। আবার অনেক জেলের কর্তৃপক্ষ বন্দিদের প্রাপ্য ডাল থেকে

কিছু অংশ কেটে নিয়ে সেই ডালের মূল্যের সমপরিমাণ কাঁচা মরিচ ডাল রান্নার জন্য সরবরাহ করে থাকেন।

এছাড়া সাধারণ কয়েদীদের $\frac{১}{৪}$ ছটাক এবং সাধারণ হাজতীদের $\frac{১}{১৬}$ ছটাক সরিষার তেল সপ্তাহে একবার গায়ে/মাথায় মাখার জন্য প্রদানের নিয়ম আছে। এই আধুনিক যুগে হাস্যকর হলেও বাস্তব সত্য যে এক ছটাক সরিষার তেল ১৬ জন হাজতী বন্দিকে মাথায় ও গায়ে মাখার জন্য দেয়া হয়। বাস্তবে দেখা গেছে এই তেল একজন বন্দির গায়ে মাখা তো দূরের কথা মাথার এক পাশেও দেয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে অমানবিক এবং বন্দিদের সঙ্গে সরকারের ঠাট্টা করা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

৪.১.১৪ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারা-ব্যবস্থায় বন্দিদের খাদ্য

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের খাদ্য।[১২১]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

এ দেশের কারাব্যবস্থাপনায় বন্দিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে ডায়েটিশিয়ান প্রতিমাসে খাবারের মেনু তৈরী করেন। বন্দিদের খাবারের জন্য প্রতিটি কারাগারেই টেবিল, চেয়ার সম্বলিত বড় ডাইনিং হল আছে। সেখানে বসে বন্দিরা খাবার খেয়ে থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে বন্দিদের খাদ্য বাবদ মাথাপিছু দৈনিক $ ২.৯৬ ব্যয় করা হয়েছে।[১২২]

যুগোস্লাভিয়া

এ দেশের প্রতিটি কারাগারেই টেবিল, চেয়ার সম্বলিত প্রশস্ত জায়গায় ডাইনিং হল আছে। এখানের বন্দিদের সুপ, মাংস, সব্জি, মিষ্টি ও কফি খেতে দেয়া হয়। এ দেশের কারাগারের রান্নার ও খাবারের মান বাইরের যে কোন রেষ্টুরেন্টের সাথে তুলনা করা যায়।

ফ্রান্স

এ দেশের কারাব্যবস্থাপনায় বন্দিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখেই ডায়েট স্কেল তৈরী করা হয়েছে। সে অনুসারেই বন্দিদের তিন বেলা খাবার দেয়া হয়। বন্দিরা ডাইনিং হলের টেবিল, চেয়ারে বসে খাবার গ্রহণ করে। এছাড়াও জেলের ভেতরে ক্যান্টিন আছে। বন্দিরা প্রয়োজন অনুসারে ক্যান্টিন থেকে নিজ খরচে পছন্দের জিনিস কিনে নিতে পারে।

সুইডেন

এ দেশের কারাগারে বন্দিরা তিন বেলা ডাইনিং হলে চেয়ার টেবিলে বসে খাবার খায়। এখানে বন্দিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে প্রতি সপ্তাহের জন্য খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

স্কটল্যান্ড

এ দেশের বন্দিদের দিনে চার বার খেতে দেয়ার নিয়ম চালু আছে। যেমন ঃ-
সকাল ৭.৩০ মিঃ- চা, রুটি, মাখন, পোরিজ, রান্না করা শুকরের মাংস, সসিজ বা ডিম।
বেলা ১২.০০ মিঃ- প্রধানত ঃ সুপ, রোল ও মিষ্টি।
বিকাল ৫.০০ মিঃ- চা, রুটি, মাখন, জ্যাম, হটডিস ও পটেটো চিপস্।
রাত ৯.০০ মি ঃ- চা এবং বন বা রোল।

সৌদী আরব

এদেশের কারাগারগুলোকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত চাহিদার ভিত্তিতে বন্দিদের খাবার প্রদান করা হয়। যেমন - সকালেঃ- রুটি, বাটার, ডিম, তাজাফল বা ফলের জুস ও চা বা কফি। দুপুর ও রাতেঃ- ভাত বা রুটি, সব্জি, মাংস ও মিষ্টি।

[১২১] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম II।

[122] U.S. Department of Justice, BJS. State Prison Expenditures, 1996, NCJ-172211, P-V.

থাইল্যান্ড

বন্দিরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ডাইনিং হলে চেয়ার, টেবিলে বসে খাবার খায়। এদেশের কারাগারে বেতনভুক্ত পাচক দ্বারা রান্নার কাজ করানো হয়।

জাপান

জাপানীরা সময়ের অপচয় করে না। তার প্রমাণ কারাগারেও পাওয়া যায়। যাতে সময়ের অপচয় না হয় এ চিন্তা মাথায় রেখে প্রতিটি ওয়ার্ক শেডের পাশেই পরিচ্ছন্ন ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা আছে। এসব ডাইনিং-এর চেয়ার টেবিলে বসেই বন্দিরা খাবার খেয়ে থাকে।

হংকং

এদেশের কারাগারসমূহে বন্দিদের চাহিদা অনুসারে ইউরোপীয়, ভারতীয় এবং চায়নিজ এ তিন ধরনের খাবার প্রতিদিন রান্না করা হয়। এর মধ্যে যে বন্দি যে ধরনের খাবারে অভ্যস্ত সে, সে ধরনের খাবার ডাইনিং হলে বসে খেয়ে থাকে।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকার বন্দিদের জন্য খাদ্য তালিকা নিম্নরূপঃ-

সকালের নাস্তা	ঃ-	৬ আউন্স রুটি
		২ আউন্স অন্যান্য খাবার, গুড় ও চা
দুপুরের খাবার	ঃ-	৬ আউন্স ভাত
		২ আউন্স গো মাংস বা মাছ
		২ আউন্স সব্জি
রাতের খাবার	ঃ-	৮ আউন্স ভাত
		২ আউন্স গো মাংস বা মাছ
		১ আউন্স পাতাযুক্ত শাকসব্জি
		৩ আউন্স সব্জি

৪.১.১৫ গণতান্ত্রিক পন্থায় রেশন বা খাদ্য বুঝে নেয়া

খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি ও দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন সময় কারাগারের বন্দিরা যৌথভাবে দাবী তুলেছে, যৌথভাবে তাদের রেশন বুঝে নেয়ার। এ ন্যায্য দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৮০ সনের কারা-সংস্কার কমিশন বন্দিদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্য বুঝে নেয়ার সুপারিশ করেন। এর প্রেক্ষিতে তখন খাদ্যদ্রব্য বুঝে নেয়ার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে হাজতী অপেক্ষা কয়েদীর সংখ্যাই বেশি ছিল। উক্ত কমিটি দরপত্রের সিডিউল অনুসারে খাদ্য দ্রব্য বুঝে নিতে শুরু করে এবং খাদ্যের মান ও ওজনের ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এর কারণে কর্তৃপক্ষের লুটপাট করে খাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং সঠিকভাবে মালামাল সরবরাহ করার কারণে ঠিকাদারগণও ৬% কমিশন দেয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে অনেক ভেবে চিন্তে নতুন কৌশল অবলম্বন করতঃ কমিটির সদস্য কয়েদীদের বিভিন্ন কায়দায় আর্থিক লোভনীয় মাসোহারায় তাদের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে। এ মৌখিক গোপন চুক্তির ফলে তারা মাসিক একটি অংকের টাকা পাবে এবং তাদেরকে বিশেষভাবে রিমিশন বা রেয়াত দেয়া হবে। বিনিময়ে তারা পূর্বের মত মালামাল সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করবে না। কথামত কাজ হতে শুরু করে। ফলে দিন দিন আবার খাদ্যের মান নিম্নদিকে ধাবিত হয়। আর কমিটির সদস্যদের চাল-চলন, উঠাবসা ও খাওয়া-পরায় সবার মনে সন্দেহের বীজ রোপিত হতে থাকে। এভাবে কয়েক মাস চলার পর সাধারণ বন্দিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা দেখা দেয়। এ হতাশা থেকেই হাজতীদের কয়েদীদের প্রতি জন্ম নেয় ক্ষোভ। এই চাপা ক্ষোভের কারণে কারাগারে প্রায় প্রতিদিনই হাজতী-কয়েদী মারামারি বা সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। ইত্যবসরে কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ দেখিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বন্দি প্রতিনিধিদের দ্বারা খাদ্য দ্রব্য বুঝে নেয়ার বিষয়টি স্থগিত রেখে দেয়। এর পর আর বন্দিদের খাদ্য নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন কারা মহা-পরিদর্শক, ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আবুল হোসেন বন্দিদের খাদ্যের ব্যাপারে দুর্নীতি রোধ কল্পে বন্দি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে "ডায়েট স্কেল" বোর্ডে লিখে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪.১.১৬ ক্যান্টিন ব্যবস্থার প্রচলন

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানুষের চাহিদা এবং আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে ক্যান্টিন ব্যবস্থার প্রচলন করা যেতে পারে। কারাগারে সরকারী খরচে যে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়; তা ছাড়াও বন্দিদের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অপূরণীয় থেকে যায়। ফলে ঐ সব টুকিটাকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে বন্দিরা প্রতি পদক্ষেপে মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টিও আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির অন্তরায় বিবেচনা করা যায়।

৪.১.১৭ সারকথা

বন্দিদশার মানুষদের আইনের বেড়াজালে হাত-পা বাঁধা। তারা বাইরের মানুষের মত মুক্ত নয়। কারাগারে তাদের হাত-পা খোলা থাকা সত্ত্বেও তারা অসহায়। মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে অন্ন তার অন্যতম। বন্দিদশার মানুষ তথা অসহায় মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোন সভ্য জাতির কাজ নয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যত রকম পথ আছে ; এটা তার অন্যতম একটি। মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে, সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে ন্যায্য হিস্যা অনুযায়ী বন্দিদের মুখে খাবার তুলে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান বাস্তবতার তাগিদ প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে।

৪.২ কারাবন্দিদের পোশাক-পরিচ্ছদ

(4.2 Prisoners Clothing & Bedding)

৪.২.১ বন্দিদের যে পোশাক দেয়া হয়

বাংলাদেশের কারা-ব্যবস্থায় কারাগারে আটক সকল বন্দিদের সরকারী খরচে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা হয় না। শুধুমাত্র সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের কারাগারে আগমনের সাথে সাথে পরিধেয় বস্ত্র প্রদানের নিয়ম চালু আছে। তবে অনেক কারাগারেই কাপড় মজুদ না থাকার কারণে ঐ নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না।

সশ্রম কয়েদী, বিনা শ্রম কয়েদী, বিচারাধীন বন্দি, নিরাপদ হেফাজতি বন্দি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক বন্দি এবং দেওয়ানী মামলায় আটক বন্দিদের নিম্নলিখিত সামগ্রী প্রদান করা হয়।

১। কম্বল -৩ টি
২। এ্যালুমিনিয়াম থালা- ১টি
৩। এ্যালুমিনিয়াম বাটি- ১টি
৪। এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস- ১টি

সাধারণ বন্দিদের সপ্তাহে একদিন পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ১৬ জনে ৩ ছটাক অর্থাৎ প্রতিজনে ১০.৯৩ গ্রাম সোডা দেয়া হয়। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৩য় শ্রেণীর বন্দিদের উপরিউক্ত জিনিস ছাড়াও কারাগারে আগমনের পর নিম্নলিখিত সমাগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে।

পুরুষ কয়েদীদের জন্য		*মহিলা কয়েদীদের জন্য*
১. জামা (কুর্তা)	-২টি	১. ব্লাউজ-২টি
২. পাজামা	-২টি	২. শাড়ী -২টি
৩. গামছা	-২টি	৩. গামছা -২টি
৪. টুপি	-১টি	

সাজা প্রাপ্ত পুরুষ বন্দিদের পরিধেয় বস্ত্রের মাঝে নীল ডোরা (স্টাইপ) চিহ্ন থাকে এবং সাজা প্রাপ্ত মহিলা বন্দিরে জন্য ১˝ নীল রঙ্গের বর্ডারের প্লেইন সাদা শাড়ী প্রদান করা হয়।

সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের জন্য সরবরাহকৃত কাপড় কারাগারেই তৈরী করা হয়। কারা শিল্পের অব্যবস্থা ও অনুন্নয়নের কারণে তৈরীকৃত কাপড়ের মান অত্যন্ত নিম্ন। কাপড় তো নয় যেন চট। অমসৃণ খসখসে কাপড় প্রথম প্রথম বন্দিদের গায়ে দিতে বা পরিধান করতে ভীষণ কষ্ট হয়। এ ছাড়াও চাহিদার তুলনায় কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। কাজেই অনেক কারাগারে সাজা প্রাপ্ত বন্দিরা সরকারী কাপড় না পাওয়ায় নিময় বহির্ভূতভাবে লুঙ্গি, গেঞ্জি, সার্ট পরে থাকে।

৪.২.২ মশা, মশারী ও ফ্যান

কারাগারে আটক সাধারণ বন্দিদের বালিশ ও মশারী দেয়া হয় না। প্রথম প্রথম কারাগারে এসে বালিশ বিহীন কম্বলের বিছানায় একের পর এক নিদ্রাহীন রাত কেটে যায়। অবশ্য আস্তে আস্তে পরিস্থিতির কারণেই বালিশ ছাড়া ঘুমানো অভ্যাস হয়ে যায়, আর এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের কারাগারে আটক সাধারণ বন্দিদের মশারী দেয়া হয়না বলেই কারাগারে মশার উপদ্রব নেই এ কথা চিন্তা করা অবান্তর। কাপড় পরে ইজ্জত রক্ষা হয়, বেঁড়া দিয়ে ফসল রক্ষা করা যায়। কিন্তু জেলখানার প্রাচীর দিয়ে মশা রক্ষা করা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে মশার দংশনে বন্দিরা যে কারণ অবস্থার শিকার, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে মাঝে মধ্যে মশক নিধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেয়া হয়। আজ পর্যন্ত কোন সরকারই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে মশক মুক্ত শহর উপহার দিতে পারেনি। বক্তৃতা, নীতিবাক্য, আস্ফালন সব ধুলিসাৎ হয়ে গেছে মশক বাহিনীর কাছে। প্রায়ই পত্র-পত্রিকা খুললেই এসবের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কারা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বন্দিদের নিজ পয়সায় কেনা কয়েলও জ্বালাতে দেন না। ফলে বন্দিদশায় সেকেলে মানবতা বিরোধী আইনের নিপীড়ন, নির্যাতন ও মশক বাহিনীর সারাক্ষণ দংশনের জ্বালায় বন্দিদের ওষ্ঠাগত প্রাণ। একেবারে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে সাধারণ বন্দিদের জন্য ওয়ার্ড বা সেলে ফ্যান নেই। অন্যান্য দিনে তেমন অসুবিধা না হলেও মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্যানহীন ওয়ার্ড বা সেলে বন্দি অবস্থানের কারণে সৃষ্ট ভ্যাপসা উৎকট দুর্গন্ধে জানালা বা দরজার নিকট যাওয়া যায় না। বন্দিরা যখন একসঙ্গে ওয়ার্ড বা সেলে অবস্থান করে; তখন ফ্যান বিহীন ঘরের গরম, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ও ল্যাট্রিনের প্রসাব-পায়খানার দুর্গন্ধ সব একিভূত হয়ে বিশ্রী উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের বাসযোগ্যহীন পরিবেশের উদ্ভব হয়। তবুও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনিভাবেই এইসব পরিবেশে আটক থাকতে হচ্ছে বন্দিদের। বন্দিদের ওয়ার্ড বা সেলে সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা থাকলে; ভ্যাপসা গরমের কারণে সৃষ্ট দুর্গন্ধ ফ্যানের পর্যাপ্ত বাতাসের সাহায্যে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে এবং বন্দিরাও একটু স্বস্তিকর পরিবেশে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পাবে।

৪.২.৩ যাদের লজ্জা নিবারণের পথ নেই

সাজাহীন এমনও অনেক মহিলা বন্দি আছে যারা এককাপড়ে কারাগারে আসে। তাদের গোসলের পর ঐ ভেজা কাপড়ই গায়ে শুকাতে হয়। কনকনে শীতেও তাদের এ ভাবে কেটে যায়। বিশেষ করে নিরাপদ হেফাজতে আটক মহিলাদের কাপড়ের ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। কারণ প্রায়ই নিরাপদ হেফাজতি মহিলারা মাসের পর মাস একই কাপড়ে থাকে।

কেস-৮

অসহায় বন্দির ভাষ্য

নিরাপদ হেফাজত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা বলেন- অনেক হাজতীকে দেখেছি এক কাপড়ে মাসের পর মাস কারাগারে অবস্থান করতে। তাদের গোছলের পর ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প থাকে না। এমনও দেখা গেছে কনকনে শীতে এক কাপড়েই মেঝেতে শুয়ে থাকতে হয়। আবার অনেকেই লজ্জা নিবারণের জন্য নিজের জন্য বরাদ্দকৃত মাছ, মাংস অন্য বন্দির কাছে দিয়ে বিনিময়ে কাপড় কিনে নেয়। জেলের পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডে কোন ফ্যান নেই। ওয়ার্ডের অনেক উঁচুতে লাইট জ্বালানো থাকে চব্বিশ ঘন্টা। ওয়ার্ডের ভেতরে ল্যাট্রিন, তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বন্দিদের কোন বালিশ দেয়া হয় না। যারা পয়সা দিতে পারে না তাদের জন্য রয়েছে ময়লা, ছেঁড়া, রোগ জীবাণু ভর্তি পুরানো কম্বল। যারা পয়সা দেয় তাদের কপালে জোটে অপেক্ষাকৃত নতুন এবং ভাল কম্বল। পয়সা দিয়ে একাধিক কম্বল সংগ্রহ করে অনেকে। টাকার বিনিময়ে একাধিক থালাবাটিও অনেকে যোগাড় করে নেন। জেলখানায় নিরাপদ হেফাজতী ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক বন্দিরাই সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় আছে। অনেকের পরণের কাপড় পর্যন্ত নেই। সাধারণ বন্দিদের জন্য জেলে মশারীর কোন ব্যবস্থা নেই। তাই বলে মশার কমতি নেই কোন জেলেই। জেলের বন্দিরা হচ্ছে এদের স্থায়ী খাদ্য। মশার হাত থেকে বাঁচতে বন্দিদের করার কিছু নেই। কাউকে মশার কয়েলও জ্বালাতে দেয়া হয় না। কারো কাছে কয়েল পাওয়া গেলে তার রিপোর্ট হয়। এর জন্য তাকে সাজা পেতে হয়। বাধ্য হয়ে নিজেদেরকে মশার হাতে সঁপে দিয়েই কারাবন্দিদের ঘুমাতে হয়। উৎস ঃ সরেজমিন অনুসন্ধান

জেলখানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক বন্দিরাই সবচেয়ে অসুবিধায় থাকে। তাদের দু'বেলা খাবার ছাড়া কোন কিছুই দেয়া হয় না। কয়েদী বা হাজতীদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে লজ্জা নিবারণ করতে হয়।[১২৩] এছাড়াও দীর্ঘদিন হাজতবাসী এবং দুস্থ হাজতীদের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তাকানো যায় না। তারা নামমাত্র লজ্জা নিবারণের জন্য শতছিন্ন কাপড় পরতে বাধ্য হয়। যা লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস বলা যায়।

[১২৩] ১৫.০১.৯৭ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

৪.২.৪ সারকথা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারা অভ্যন্তে বন্দিদের সরকারী খরচে মশারী, মেট্রেস, বেডসীট ও কভারসহ বালিশ দেয়া হয়। এছাড়াও সে সব দেশের কারাগারে প্রতিটি ওয়ার্ডে বা সেলে প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বন্দিরাও মানুষ। তারাও এই সমাজের বাসিন্দা। এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে তাদের প্রাপ্য পরিধেয় বস্ত্রের মান উন্নয়ন করাসহ চাহিদা অনুযায়ী তাদের পোশাকের ঘাটতি রোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

৪.৩ কারাগারের আবাসিক অবস্থা

(4.3 ACCOMMODATION OF PRISONS)

৪.৩.১ প্রাসঙ্গিক কথা

ভারতবর্ষের কারাগারসমূহের অতিরিক্ত বন্দিচাপ ও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত বন্দিদের চাপা অসন্তোষের কারণে **১৯১৯** সনে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় জেল কমিটি (Indian Jail committee) গঠিত হয়। এই কমিটি বার্মা, ফিলিপাইন, হংকং, জাপান ও ব্রিটেনের কারাগার পরিদর্শন করে আমাদের দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন দাখিল করেন। কমিটির সুপারিশের আলোকে ভারত বর্ষের কারাসমূহে অবস্থানরত অতিরিক্ত বন্দি সংখ্যা হ্রাসের জন্য প্রতিটি কারাগারের নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা (Registered Accommodation) ও প্রত্যেক বন্দির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা নির্ধারণ সম্পর্কিত আইন জারী করা হয়। এরপর হতেই প্রতিটি কারাগারে প্রত্যেক বন্দির জন্য ৬ ×৬ ফুট জায়গা হিসাব করে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। এই নিয়ম আজও বাংলাদেশে বহাল আছে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরাধ প্রবণতা বাড়ার সাথে সংগতি রেখে কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়নি। ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার ২ বা ৩ গুণ বন্দি অবস্থান করছে।

পত্র-পত্রিকা খুললে প্রায়ই চোখে পড়ে বন্দিদের আবাসিক সমস্যার কথা। কারাগারে ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিনগুণ বন্দি অবস্থান করছে। ফলে তারা মানবেতর জীবন-যাপন ও অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে।

৪.৩.২ সতের বছরের বন্দি অবস্থানের হিসাব ও ১৪ জন জেল সুপারের মন্তব্য

বিগত **১৭** বছরের কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ও আটক বন্দির সংখ্যা **১৩** নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো ঃ-

<u>১৩ নং সারণী</u>

সতের বছরের কারাগারের ধারণক্ষমতা ও আটক বন্দির সংখ্যা

সন	ধারণ ক্ষমতা	আটক বন্দির সংখ্যা
১৯৮৪	১৮৯২৪	২৪৩৮৪
১৯৮৫	১৯০৩৫	২৫৫৩৭
১৯৮৬	১৯১৫৯	২৫৭৯০
১৯৮৭	১৯৬০৭	৩০৪১৮
১৯৮৮	২০২২৭	৩২৭৭০
১৯৮৯	২০৭৩১	৩৬৩৮৫
১৯৯০	২০৮১৩	৩৩২৩৬
১৯৯১	২১৫৭৩	৩৭৬৬৮
১৯৯২	২০৮৫২	৩৮৭২১
১৯৯৩	২০৯৮০	৪১৫৮৫
১৯৯৪	২১২৪৭	৪১১২৬
১৯৯৫	২১২৪৭	৪২৯৯২
১৯৯৬	২১৬২০	৪৪৭২০
১৯৯৭	২১৬২০	৪৫১৭৪
১৯৯৮	২২৪৩৯	৪৭৭৬৪
১৯৯৯	২৩৯৪২	৫২৩৭০
২০০০	২৩৯৪২	৬০৫৫৯

বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে বর্তমানে বন্দির সংখ্যা ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। বন্দিরা সার্বিকভাবে অমানবিক জীবন যাপন করছে। অনেক জেলা ভিত্তিক কারাগারগুলোতে স্থানাভাব প্রকট। অনেক সময় এই কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার ৫/৬ গুণ বেশি বন্দি রাখা হয়। কোথাও কোথাও ধারণ ক্ষমতার ১০ গুণ বেশি বন্দি রাখার খবরও পত্রিকান্তরে পাওয়া গেছে। বন্দিরা ঠিকমত ঘুমানোর জায়গা পায় না। পালা করে ঘুমায়।[১২৪]

ঢাকায় ১০ই সেপ্টেম্বর হতে ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০০০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত "Good Prison Management for Prison Personnel of Bangladesh" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় যোগদানকারী ২০জন জেলসুপারের মধ্যে ১৪ জনই কারাগারের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি চাপের (Congestion/Overcrowding) কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। [১২৫]

৪.৩.৩ বন্দিচাপের কারণ

গাণিতিক হারে বাড়ছে আমাদের জনসংখ্যা। এর সাথে সংগতি রেখে বাড়ছে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা। অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তাতে গোটা জাতি শংকিত ও বিপন্ন। তাই কারাগারেও দিন দিন বন্দির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেই হারে বাড়েনি কারাগারের আবাসন ব্যবস্থা। এই আধুনিক যুগেও বাংলাদেশের কারাগারে ধারণ ক্ষমতার ২/৩ গুণ বেশি বন্দি প্রতিনিয়তই অবস্থান করছে। ফলে কারা বিভাগের খরচও হু হু করে বেড়ে চলেছে বল্গাহীন ঘোড়ার মতো। এর জন্য আমাদের পেনাল পলিসি দায়ী। এই কারণে আধুনিক প্রযুক্তি, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের পেনাল পলিসি আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

মার্কিন সরকারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিচার পূর্ব আটককাল দীর্ঘ হয়ে থাকে।[১২৬] এ দেশে বিচার প্রক্রিয়ার গতি এত ধীর ও প্রলম্বিত যে দীর্ঘকাল ধরে দরিদ্র মানুষ মামলার খরচ বহন করে যেতে পারে না।[১২৭] ইদানিং কারাগারে বন্দিদের যে সংখ্যাধিক্য তার পেছনে রয়েছে বিচারাধীন মামলার ক্রমস্ফীতি।[১২৮] বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থার কারণে বিচারাধীন বন্দিরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকে। অনেকদিন পর যখন বিচার সমাপ্ত হয় তখন দেখা যায় এদের মধ্যে কেউ ছিল দোষী আবার কেউ ছিল নির্দোষ। আপিল শুনানির ক্ষেত্রেও বিলম্বের শেষ নেই। বিচার ব্যবস্থা অবহেলিত হওয়ার কারণেও কারাগারের আবাসন সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেকালে ইংরেজেরা এদেশের লোককে মূলতঃ অপরাধ প্রবণ বলেই মনে করত। সেজন্য তারা বিচার বিলম্ব করে বন্দিদের জেলে রেখে পাইকারিভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করত। কাজেই খেয়াল-খুশিমত কারাগারে লোক পাঠিয়ে ভীড় বাড়ানো যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

বিনাবিচারে ও বিচারাধীন কারাবন্দিদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মাঝে মাঝেই পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। লেখালেখি করা হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতি-সেমিনারে তাদের সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশ করা হয়। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। ফৌজদারী মামলা তদন্তের সময়সীমার ব্যাপারে আইনগত কড়াকড়ির অভাব। এই শিথিলতার ফাঁকে দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জেলে আটক রাখা হয়। তাই অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে একটা সময়সীমার পর স্বতঃসিদ্ধ জামিনের দাবী করা হয়েছিল আইনজীবীদের মহল থেকে। মোট কথা বিনাবিচারে বা বিচারাধীন বন্দিদের সমস্যা জরুরীভাবে পর্যালোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে।[১২৯] ব্লাকস্টোন বলেছেন-একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ভোগানোর চেয়ে দশজন দোষী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া ভাল। বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধের জন্য আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণই মূলতঃ দায়ী।[১৩০]

---

[১২৪] ০৩.০৮.১৯৯৬ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[125] **Good Prison Management, A Workshop Report, 2000, p.63-68.**

[১২৬] ০৪.০২.১৯৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[১২৭] ০২.১১.১৯৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[১২৮] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ-৪৪।

[১২৯] ১৯.১২.৯০ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[১৩০] বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫, পৃঃ-৩১৪।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে নির্দিষ্ট অপারাধীদের ছাড়াও অহেতুক অনেক বেশি লোককে জড়িত করে মামলা দায়ের হচ্ছে। আর ঐ আসামীদের কারাগারে পাঠানোর ফলে নিত্যদিনই বাড়ছে বন্দিদের আবাসন সমস্যা। এই প্রসংগে আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু বলেছেন-"৩ জন অপরাধ করলে আসামী করা হচ্ছে ১৫ জনকে।"[১৩১] সমাজ ব্যবস্থার কারণে অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া জনসংখ্যাও দিনদিন বেড়ে চলেছে। তাই বন্দির সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে।[১৩২]

৪.৩.৪ বন্দি চাপের কারণে সৃষ্ট সমস্যা

বিচার বিলম্বের কারণে দেশের প্রতিটি কারাগারেই বিচারাধীন বন্দিদের দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। মানবেতর জীবন কাটাতে হয় তাদের। ফলে বিচারের আগেই তাদের শাস্তি ভোগ হয়ে যায়। সামাজিক অবক্ষয় ও অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এ ছাড়াও জামিন দেয়ার ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়ির ফলে কারা-পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলেছে। এতে কারাপ্রশাসন, নিয়ম-শৃংখলা এবং ব্যয়ের উপরও বাড়তি চাপ পড়ছে। এর কারণে কারাগারে প্রতিদিনই নিত্যনতুন বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

আমাদের দেশের কারাগারসমূহের যে ধারণ ক্ষমতা তার প্রায় তিনগুণ বন্দি গাদাগাদিভাবে অবস্থান করছে। এর কারণ, আটক বন্দির তুলনায় আমাদের দেশের কারাগারের ধারণ ক্ষমতা অনেক কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতার উর্ধ্বগতি ও বিলম্বিত বিচারের কারণে যে ভাবে বন্দির সংখ্যা বেড়ে চলেছে সে ভাবে কারাগারের সংখ্যা বাড়েনি। কারাগারে অধিক বন্দি চাপের ফলে নিয়ম-কানুন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দুর্নীতিও ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। ভাল জায়গায় শোয়ার জন্য টাকা, পেটপুরে স্পেশাল খাওয়ার জন্য বক্শিস, চিকিৎসার জন্য অর্থ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে ফিস ছাড়া কারাগারে ভাল থাকা যায় না। যাদের এসব করার সংগতি নেই; তারা কারাগারে অবহেলিত। তাদের মনে করা হয় সমাজের নিকৃষ্টতম কীট। এদের শোয়ার জায়গা হয় পায়খানা/প্রস্রাব খানার দরজার কাছে; পেটপুরে খাবার পায় না; অসুখের সুচিকিৎসা হয় না; স্বজনের সাথে ঠিকমত দেখা করতে পারে না। আবার দেখা হলেও ভাল করে কথা বলার সুযোগ পায় না তারা। কারাগারে দুর্নীতি মুক্ত একটি কাজও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সরেজমিনে দেখা গেছে কোন কোন সময় দু'একটি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার কম বন্দি অবস্থান করে। তখন সেইসব কারাগারে তুলনামূলক দুর্নীতি অনেক কম পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই কারাগারে অতিরিক্ত বন্দি চাপ কারা-দুর্নীতির অত্যন্ত সহায়ক।

বাংলাদেশে আটক বন্দির তুলনায় কারাগারে আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় শোয়া, খাওয়া, প্রস্রাব, পায়খানা, পানীয়জল, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকট সমস্যা। ফলে কারা নিয়ম-শৃংখলার চরম অবনতি। এই সব কারণেই বন্দিদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের কারণে মাঝে মাধ্যেই কারা-বিদ্রোহের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। আবাসন সমস্যার কারণে বন্দিরা সীমাহীন দুঃখ কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে বাংলাদেশের কারাগারে। কাজেই এই সমস্যার সমাধান করা জরুরী।

৪.৩.৫ বন্দি চাপ কমানোর বিকল্প পন্থা

কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা নিম্নলিখিত উপায়ে কমানো যেতে পারে।

১। ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্তকে কারাগারে না পাঠিয়ে থানা থেকেই জামিন বা ব্যক্তিগত মুচলেকার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া।
২। অভিযুক্তদের জামিন প্রাপ্তি সহজ করা।
৩। কিছু কিছু ক্ষেত্রে "অটোমেটিক"জামিন বা মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া।
৪। বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করা।
৫। ফৌজদারী মামলার গুরুত্ব অনুসারে তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দেয়া।
৬। কারাগারের আধুনিক বিকল্প হিসেবে প্যারোল ও প্রবেশন পদ্ধতি দ্রুত প্রবর্তন ও প্রয়োগ করা।
৭। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণা করা।

---

[১৩১] ২২.১১.১৯৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[১৩২] কর্ণেল (অব) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪, পৃঃ-১০২।

৪.৩.৬ ব্যক্তিগত মুচলেকা

ক্ষেত্র বিশেষে এমনকিছু অভিযোগ দায়ের হয়; যেগুলো স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা যায়। সেই সবক্ষেত্রে অভিযুক্তকে কারাগারে না পাঠিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে থানা থেকেই জামিন বা ব্যক্তিগত মুচলেকা গ্রহণপূর্বক ছেড়ে দেয়া। এতে কারাগারের উপর চাপ কমবে এবং সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে। এছাড়াও আদালতের মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং ঝামেলা কমবে।

৪.৩.৭ জামিন প্রাপ্তি সহজকরণ

যেখানে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হওয়ার গুরুতর আশংকা আছে সেসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র উদারভাবে জামিন দেয়া বাঞ্ছনীয়। এতে কারাগারগুলোতে ভিড় কমবে, মানুষের অহেতুক দুর্ভোগও হ্রাস পাবে। আমাদের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে বছরের পর বছর চলে যায় মামলার বিচারকার্য শেষ হতে। বহু অভিযুক্ত নির্দোষ হিসেবে বিচারে ছাড়া পায়। কিন্তু ইতোমধ্যে হয়তো দীর্ঘকাল নরকবাস হয়ে গেছে। কখনও দেখা যায় পাঁচ-সাত বছর হাজত বাসের পর বিচারে সাজা হলো ছ'মাস বা এক বছর। এ পরিস্থিতি কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। দ্রুত বিচারকার্য শেষ করা এবং বিচারাধীন অভিযুক্তকে নিতান্ত অপরিহার্য না হলে হাজতে না পাঠানো, কারাগারে স্থান সঙ্কুলান সমস্যাকে বহুলাংশে কমিয়ে আনতে পারে।[১৩৩]

৪.৩.৮ অটোমেটিক জামিন

অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির লোকের অভাবে মামলার তদবির বা জামিন হয় না। আবার অনেকের সীমাহীন দারিদ্রতার কারণে মামলার খরচ যোগাতে না পারায় জামিন হয় না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জামিনদারের অভাবে বা তদবিরের অভাবে আদালত জামিন দিতে পারেন না। ফলে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদের কারাবাস ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার পর "অটোমেটিক" জামিনের নিয়ম প্রবর্তন করা। আবার ছোটখাট অপরাধে অভিযুক্তদের (যেমন কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক) ১৫/২০ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে ব্যর্থ হলে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া। এতে মানুষের হয়রানি এবং কারাগারে বন্দির চাপ কমবে।

৪.৩.৯ বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা

বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থার কারণে বিচারাধীন বন্দিরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারাগারে আটক থাকে। অনেকদিন পর যখন বিচার সমাপ্ত হয় তখন দেখা যায় এদের মধ্যে কেউ ছিল দোষী আবার কেউছিল নির্দোষ। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। কাজেই ফৌজদারী বিচারের রায় প্রদানের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। নিম্নাদালতের বিচারকদের প্রায়ই প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বিচারকাজে বিলম্ব ঘটা স্বাভাবিক। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিচারিক কাজে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা হয়। এতে বিচার বিলম্বিত হয় ও কলুষিত হওয়ার আশংকা থাকে। কাজেই সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনের আওতামুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে দীর্ঘকাল ক্ষেপণ; সাক্ষীদের হাজিরায় গড়িমসি, বিচারকের স্বল্পতা বিভিন্ন কারণে বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটছে। এসব কারণে কারাগারে বন্দির চাপ অহরহ বেড়েই চলেছে। কাজেই বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির অন্তরায়সমূহ জরুরী ভিত্তিতে পরিচ্ছন্ন করে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। কারাগার থেকে হাজতী হ্রাস করতে; বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথও আসলে এটিই।[১৩৪]

৪.৩.১০ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা

প্রায়ই দেখা যায় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে অনেক বিলম্ব ঘটে। এর কারণে বিচারে বিলম্ব ঘটে এবং অভিযুক্ত আটক থাকলে তার বন্দিত্বকাল দীর্ঘায়িত হয়। কাজেই ফৌজদারী মামলার গুরুত্ব অনুসারে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা বেঁধে দেয়া থাকলে এমনটি হওয়ার

---

[১৩৩] ০৬.০৪.১৯৯১ তারিখের "দৈনিক সংবাদ " পত্রিকা।

[১৩৪] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ-৩।

সুযোগ থাকবে না। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মামলার সাক্ষীদের আদালতে সময়মত হাজির হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩.১১ প্যারোল

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের নরফক দ্বীপের প্যানাল কলোনীর প্রধান আলেকজ্যান্ডার মেকনকী প্যারোল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ইংল্যান্ডের অপরাধীদের নরফক দ্বীপে নির্বাসন দেয়ার পরও যখন তাদের আচরণ সংশোধন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি; তখন আলেকজ্যান্ডার মেকনকী অপরাধীদের সংশোধনের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর এ সাফল্য প্যারোল পদ্ধতির জনপ্রিয়তা এনে দিলে ১৮৭৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের এলমিরা রিফরমেটরী কর্তৃক প্যারোল ব্যবস্থা চালু হয়।[১৩৫] আবার অধ্যাপক N.V Paranjape ও বোরহান উদ্দীন খান বলেন, ১৮৬৯ সনে ঐ একই প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম প্যারোল প্রথা চালু হয়।

কারাগারের বিকল্প হিসেবে মিলিটারী আইন থেকে প্যারোলের ধারণা জন্মে। সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সাজার মেয়াদের অংশ বিশেষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর শর্তসাপেক্ষে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়। আবার কোন কোন দেশে বন্দিদের সাজার $\frac{১}{৩}$ অংশ মেয়াদ শেষে শর্তাধীনে প্যারোলে মুক্তি দেয়।[১৩৬]

অপরাধ বিজ্ঞানী আহমদ ছিদ্দিক বলেন, ১৮৪২ থেকে ১৮৫৩ সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কারাগারসমূহে বন্দি চাপ দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কারাগারের বন্দির সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে শর্তাধীনে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মুক্তি দেয়। তখন থেকেই প্যারোল প্রথার চিন্তাভাবনা শুরু হয়।[১৩৭]

প্রফেসর জিলিনের মতে সাজা ভোগরত কোন অপরাধীকে জেলখানা থেকে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে মুক্তিদানের নাম প্যারোল।[১৩৮] আবার ডঃ মোহাম্মদ সাদেকের মতে শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে একজন কয়েদীকে কারাগার থেকে শর্তাধীনে মুক্তি দেবার প্রক্রিয়াকে প্যারোল (parole) বলা যায়।

Parole is the release of a prisoner under supervision before the expiration of his/her sentence, With the provision that he/she may be returned to the prison if he/she violates the condition of his/her parole.[16] ১৯৯২ সনে correctional service of Canada সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তি ও তাদের দেখাশোনার উপর নিরীক্ষা চালায়। উক্ত নিরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।[১৭]

মোট কথা সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সাজার মেয়াদের অংশবিশেষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংশোধনের নিমিত্তে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়াকে প্যারোল বলা হয়। বাংলাদেশে এই নিয়ম নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একান্ত বিশেষ কারণে প্যারোল দেয়ার বিধান আছে। আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী একটানা একাধিক দিনের জন্য প্যারোল দেয়া যায় না। কারাগারের আধুনিক বিকল্প হিসেবে প্যারোল প্রথার দ্রুত প্রবর্তন ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্যারোল প্রথা প্রবর্তনে আমরা নিম্নলিখিত সুফল/সুবিধা ভোগ করতে পারি।

ক. কারাগারসমূহে বন্দি চাপ হ্রাস পাবে।

খ. সরকারের কারা-বাজেটে খরচ কমবে।

গ. অপরাধী সংশোধন হওয়ার সুযোগ পাবে।

ঘ. অপরাধী সমাজে খাপ-খাওয়ানো ও পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

ঙ. সাজা দেয়ায় অপরাধী সংশোধন হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা যাবে।

---

[১৩৫] সৈয়দ শওকুতজ্জামান, সমাজ কল্যাণ সমীক্ষণ, ২য় খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ-২৫৮।

[১৩৬] Prof. N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 10th Edition, P-340/341.

[১৩৭] Ahmad Siddique, Criminology, 4th Edition, p-146.

[১৩৮] বি.এল.দাস, অপরাধ বিজ্ঞান (১ম খণ্ড), ১৯৯৮, পৃঃ-৩০০।

[16] Walter A. Fried Londer & Robert Z. Apte, Introduction to Social welfare, 5th Edition, 1982, p-478

[17] FORUM, 1/98, Vol-10, No-1, P-44.

৪.৩.১২ প্রবেশন

বর্তমানকালের আধুনিক ধ্যান-ধারণায় কারাগারের বিকল্প হিসেবে প্রবেশন একটি আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি। প্রবেশন পদ্ধতি আধুনিককালের অপরাধীদের সংশোধনমূলক যুগোপযোগী কৌশল। ল্যাটিন শব্দ "probar" থেকে প্রবেশন শব্দের উৎপত্তি। probar অর্থ "To test" অথবা "To prove". probation is a matter of discipline and treatment. একজন অপরাধীর প্রবেশন পদ্ধতির আওতায় থেকে সংশোধন হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজতর হয়। এছাড়াও তার পরিবারের সংগেও যোগাযোগ বিচ্ছেদ ঘটে না। মধ্যযুগের সময় হতেই প্রবেশন পদ্ধতির ধারণা জন্মে। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এর প্রচলন হয়।[১৮] এ প্রসংগে অপরাধ বিজ্ঞানী বোরহান উদ্দীন খান বলেন যে, ১৮৭৮ সালে আমেরিকার Massachusetts রাজ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশন আইন পাস হয়।

প্রবেশন বলতে অপরাধীকে সংশোধন করার এমন একটি কর্মসূচী বা প্রক্রিয়া যেখানে অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ প্রদান। বস্তুতঃ প্রবেশন হচ্ছে অপরাধীর বিশৃংখল আচরণের সংশোধনের লক্ষ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি।[১৯]

প্রবেশন ব্যবস্থায় আদালত দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি স্থগিত রেখে তাকে সংশোধন হবার একটি সুযোগ দেন। আদালতের আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে কোর্ট বা আইন দ্বারা নিযুক্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অপরাধী জেলখানার বাহিরে নিজের সমাজেই স্বাভাবিক মানুষের মতই বসবাসের সুযোগ পায়।[২০]

মোট কথা দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে কারাগারে না পাঠিয়ে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ দানকেই প্রবেশন বলা যায়। প্রবেশন পদ্ধতি সাধারণভাবে সমাজের জন্য বিশেষ মঙ্গলজনক এবং অপরাধীর জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মামলা চলাকালেই প্রবেশন অফিসার অপরাধীর বিষয়ে বিশদ তদন্ত করে পূর্ব বিবরণসহ মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগেই আদালতে পেশ করেন। আদালত সববিষয় বিবেচনা করে মামলার রায় ঘোষণার সাথে অপরাধীর সংশোধনের লক্ষ্যে শর্তসহ প্রবেশন মঞ্জুরির কথাও ঘোষণা করেন। এ প্রসংগে ডঃ মোহাম্মদ সাদেক বলেন যে, যেসব অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রবেশন পদ্ধতিতে উপকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে শুধুমাত্র তাদেরকেই প্রবেশনে মুক্তি দেয়া বাঞ্ছনীয়।

সুইডেনে বন্দির ৮০% প্রবেশন ও প্যারোলের আওতায় মুক্তি দেওয়া হয়। জাপানে বন্দির ২০% প্রবেশনে মুক্তি দেয়া হয়। এর মধ্যে ৮০% তদারকির শর্ত ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশেও ১৮৯৮ সনের ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের ৫৬২ ধারায় প্রবেশনের বিধান থাকলেও তা কোন দিনই কার্যকারিতায় রূপলাভ করেনি।

আইন বিশারদ Howard Jones বলেন যে, অপরাধীদের অনুকূলে প্রবেশন মঞ্জুরির পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত ঃ-

১) তাকে ন্যূনতম শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

২) অপরাধীর সংশোধনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

৩) প্রবেশনাধীন সময়কালে প্রবেশন অফিসার ২টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিবেন-

ক. আদালতের আদেশমত তার অগ্রগতি সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করা।

খ. তাকে যথাযথ সাহায্য করা এবং তার সংশোধনের জন্য সুযোগ করে দেয়া।

৪) তার অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে আদালতে সোপর্দ করা এবং মূল অপরাধের ঘোষিত শাস্তি কার্যকর করা।[২১]

---

[18] Prof. N.V. Paranjape, Criminology & Penology, 10th Edition, P-308.
[১৯] বোরহান উদ্দিন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫, পৃ-২৬১।
[20] বি.এল. দাস, অপরাধ বিজ্ঞান (১ম খণ্ড), ১৯৯৮, পৃ-২৯৯।
[21] Prof. N.V. Paranjape, Criminology & Penology, 10th Edition, P-307.

আমাদের দেশে কারাগারের আধুনিক বিকল্প হিসেবে প্রবেশন পদ্ধতি প্রবর্তন করলে আমরা নিম্নলিখিত সুফল পেতে পারিঃ-

১। কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দিচাপ কমবে।
২। অপরাধীদের কারাগারের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে রাখা যাবে।
৩। অপরাধীর চরিত্র সংশোধন ও সমাজে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ দেয়ার পথ সুগম হবে।
৪। সরকারের কারা-বাজেটে ব্যয় অনেক কমে যাবে।
৫। কারাগারের আবাসিক সমস্যার কারণে সৃষ্ট অনেক প্রশাসনিক সমস্যা দূরিভূত হবে।

৪.৩.১৩ ক্ষমা (PARDON)

বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগ থেকে কারাগারের অতিরিক্ত বন্দি চাপ কমানোর জন্য ক্ষমা করার প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। এই ক্ষমার মধ্যে ২ রকমের ক্ষমা করা হয়ে থাকে। যেমন-

ক) শর্তাধীনে ক্ষমা বা প্যারোল।
খ) শর্তহীন ক্ষমা।

এছাড়াও কোন কোন দেশে কোন কোন সময় বন্দিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মুক্তি দেয়া হয়। এ ক্ষমাকে গণমুক্তিও বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে এ ধরনের গণমুক্তি দেয়ার রেওয়াজ আছে।

৪.৩.১৪ সারকথা

কারাগারের সব সমস্যার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত বন্দিচাপ। মানবাধিকার প্রশ্নে ও বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে বন্দিচাপ কমানোর প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। বিচারাধীন স্তূপীকৃত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে কারাগারের বন্দিচাপ কমানো যায়। সমস্যা ও দুর্নীতির আবর্তে নিমজ্জিত কারা প্রশাসনকে দেশ ও জাতির স্বার্থে রাহুগ্রাসমুক্ত করতে হলে জরুরীভাবে কারাগারের অতিরিক্ত বন্দিচাপ কমানো দরকার।

৪.৪ বন্দিদের চিকিৎসা

(4.4 Medical Treatment in Prison)

৪.৪.১ বন্দিদের চিকিৎসায় ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও বেড সংখ্যা ঃ-

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্ব স্ব জিলার সিভিল সার্জনগণ পদাধিকার বলে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে জেলা সদরে অবস্থিত কারাগারের মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান কারাবিধি অনুযায়ী তাঁর দৈনিক কারাগার পরিদর্শন ও অসুস্থ বন্দিদের খোঁজ-খবর নেয়ার কথা। কিন্তু তিনি সারাদিন নিজ দায়িত্বেই ব্যস্ত থাকার কারণে প্রতিদিন তো দূরের কথা সপ্তাহেও একদিন কারাগারে আগমনের সুযোগ পান না। তবে কারা-বন্দিদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে দেখা শোনার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সার্বক্ষণিক ডাক্তার নিয়োজিত আছেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনজন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দুইজন, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে দুইজন, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনজন ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই জন ডাক্তারের পদ আছে। রাজশাহী, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে দুইজন করে ডাক্তারের পদ (Post) থাকলেও বরাবরই একজন করে ডাক্তার পোষ্টিং দেয়া হয়। এ ছাড়া প্রতিটি জেলা সদরে অবস্থিত কারাগারসমূহে একজন করে সার্বক্ষণিক ডাক্তার কর্মরত আছেন। তবে নব ঘোষিত দু'একটি জেলা কারাগারে ডাক্তারের পদ এখনো খালি আছে। ইদানিং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনজন ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে দুইজন ডাক্তার নিয়োজিত আছেন।

কেস-৯

<u>চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে ৪০০০ বন্দির জন্য মাত্র একজন ডাক্তার</u>

অধিকাংশ বন্দি রোগাক্রান্ত হয়েও ডাক্তারের দেখা পায় না। এজন্য মন জয় করতে হয় ওয়ার্ডের মেট-রাইটারদের। তাদের মর্জি না হলে ডাক্তার পর্যন্ত পৌঁছানোর সৌভাগ্য কারও হয়না। ফলে বিনাচিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয় তাদেরকে। আর বিত্তবান ও ক্ষমতাবান বন্দিরা আরাম-আয়েশের মধ্যে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয় হাসপাতালের বেডে। এজন্য কারাগারের উর্ধতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সঙ্গে এদের গোপন লেনদেন হয়।

উৎস ঃ- ০৩/০২/১৯৯৯ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা।

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে একজন করে ফার্মাসিস্ট ছাড়া কোন কারাগারেই কোন প্রকার টেকনিশিয়ান নেই। ফলে প্যাথলজি, রেডিওলজি ইত্যাদি রিপোর্টের অভাবেও বন্দিদের চিকিৎসা ব্যাহত হয়। এ ছাড়াও ডাক্তারের স্বল্পতা কিংবা অনুপস্থিতি ও বন্দি চাপের কারণে ফার্মাসিস্টগণ ডাক্তারের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ কারণে অনেক সময় গ্রামের হাতুড়ে (Quack) ডাক্তারের মত ভুল চিকিৎসার পরিণতি ঘটতেও দেখা গেছে। কারা-হাসপাতালে বন্দিদের দিয়েই নার্সের কাজ চালানো হয়। কারাগারে বন্দি চাপ বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অসুস্থ বন্দির সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই কারা-হাসপাতালের বেড অনুযায়ী রুগী ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটি কারাগারেই বন্দির তুলনায় বেড সংখ্যা অতি নগণ্য। এ কারণে প্রায় কারা-হাসপাতালেই সাধারণ বন্দিরা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৪.৪.২ কারাব্যবস্থায় বন্দিদের চিকিৎসা

সাধারণ বন্দিদের অসুস্থতার বেলায় নামমাত্র নিম্নমানের ওষুধ দিয়ে বিদায় করা হয়। অনেক সময় জরুরী ক্ষেত্রেও এদের ভর্তি করা হয় না। অধিকাংশ কারাগারের হাসপাতালই মূলতঃ স্বচ্ছল বন্দিদের দখলে। টাকা খরচ করে অসুস্থ দেখিয়ে হাসপাতালের বেড কিনে নেয় এরা।[১৩৯] দু'হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে হাসপাতালে সিট

[১৩৯] ৯/১/৯২ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থা হয় আবার বিভিন্ন মেয়াদী। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় টাকা দিতে হয়। মূল কারাহাসপাতালকে মনে হবে একটা পেয়িং গেস্টহাউস।[১৪০]

কেস-১০

খুলনা জেলা কারাগারে ক্যাডারদের জন্য দুধ, কলা, মাখনের ব্যবস্থা

নরক যন্ত্রণায় ছটফট করছে খুলনা কারাগারের প্রায় ২০০০ কারাবন্দি। ধারণক্ষমতার চেয়ে প্রায় ৩ গুণেরও বেশী বন্দিকে অবস্থান করতে হচ্ছে এখানে। এর ফলে চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া, জন্ডিসসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা। নিম্নমানের খাবার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অমানবিক আচরণ, চিকিৎসার অপ্রতুলতা, বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে কারাবন্দিদের। কারাগারে টাকার বিনিময়ে 'বউ' ছাড়া সব কিছুই পাওয়া যায়। গ্রেফতারকৃত টপটেরর ও ক্যাডাররা দুধ,কলা,ডিম, মাংস, মাখন খাচ্ছে।
উৎস ঃ- ২৯/০৯/২০০০ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা।

সমাজের বিত্তবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা বন্দি হিসেবে কারাগারে আগমন করলেই ভাল খাওয়া এবং আরামে থাকার জন্য অসুখ ছাড়াই রুগী হিসেবে কারাহাসপাতালে ভর্তি হন। অবশ্য এই ভাল থাকা-খাওয়ার জন্য তাদের টাকা খরচ করতে হয়। এ প্রসংগে বি, বি, বিশ্বাস বলেছেন, ডাক্তারকে খুশি করতে পারলেই প্রত্যহ ৪-৬ অথবা ৮ ছটাক খাসীর অথবা মুরগীর মাংস পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অন্য তরিতরকারীও পাওয়া যায়। দামী সিগারেট বা অন্য কিছুর বিনিময়ে এগুলোর ব্যবস্থা করা যায়।[১৪১] কারাগারের পদে পদে টাকার লীলা-খেলা। টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না। তাই সাধারণ বন্দিরা অর্থের অভাবে অসুস্থ হয়েও চিকিৎসা পায় না। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু বলেন যে, বিত্তবান কারাবন্দিরা অসুস্থতার অজুহাতে কারাগারের হাসপাতালে অবস্থানের সুযোগ নিচ্ছে।[১৪২] জেনেভা ইউনিভারসিটির মেডিসিন ফ্যাকাল্টির লেকচারার Dr. T.W. Harding "Health in prisons" প্রবন্ধে লিখেছেন-"A prison is not a Hospital. It is a place where society inflicts a punishment and where the objectives of difference, punishment and rehabilitation are pursued with a view to maintaining the social order. It may be questioned as to how for these objectives are attained, but that is to beyond the scope of this article. In any event, those objectives are based on two values : justice and security. The addition of a third value, health, almost inevitably creates a potential conflict"[143]

কারাহাসপাতালে মেয়ে বন্দির জন্য আলাদা ওয়ার্ড নেই। অসুস্থতার ক্ষেত্রে জেল হাসপাতালে ভর্তি দেখানো হলেও তাদের রাখা হয় স্ব স্ব ওয়ার্ডেই। এ ছাড়াও মহিলা বন্দিদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নেই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে। এ নারী প্রগতির যুগেও নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কারাগারে মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করা হয়নি। মহিলা বন্দিদের ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে সেনেটারী প্যাড সরবরাহ করা হয় না। ফলে তারা নোংরা কাপড় বা যে ভাবে পারে দায়সারা কাজ সমাধা করে। এর কারণে মহিলা বন্দিরা বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব অবহেলার কারণে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে।

বন্দিদশার মানুষ বড়ই অসহায়। তার উপর সে অসুস্থ হলে তার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবুও অনেক আকুতি-মিনতি, আবেদন-নিবেদনের পর কর্তৃপক্ষের মর্জি হলে ঐ বন্দিকে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারের কাছে। অনেক কারাগারে দেখা গেছে ডাক্তার বন্দির শারীরিক সমস্যার কথা মনোযোগ সহকারে না শুনেই চোখ-রাঙ্গানী, ধমকানীর পর যেনতেনভাবে চিকিৎসা দিয়ে বিদায় করেন। এমনকি বন্দি মানুষটির গায়ে হাত দিতেও বিরক্ত বোধ করেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব আচরণকে কিভাবে আখ্যায়িত করা যাবে তা এখন বিচার্য বিষয়।

---

[১৪০] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃ - ১১।

[১৪১] বি, বি, বিশ্বাস, কারাগারের বিভীষিকাময় দিনগুলি, ১৯৯৪, পৃঃ- ৪৭।

[১৪২] ১১/৯/২০০০ তারিখের "দৈনিক মানব জমিন" পত্রিকা।

[143] COUNCIL OF EUROPE, Prison Information Bulletin, No - 10, December /87, P-9.

কোন বন্দি হঠাৎ ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা মুমূর্ষু রুগীর সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে বাইর হাসপাতালে জরুরীভাবে পাঠানোর সময় চাহিদামত এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। কাজেই রুগীকে রিক্সা বা ভ্যানে করে হাসপাতালে নিতে হয়। হাসপাতালে পৌঁছাতে বিলম্ব এবং রিক্সা বা ভ্যানের ঝাঁকুনিতে রুগীর অবস্থার বারটা বেজে যায় কিংবা ঐ বাহনেই তার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটে।

৪.৪.৩ নয় বছরে বন্দি মৃত্যুর হিসাব

বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি মৃত্যুর বছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে ১৪ নং সারণীতে উল্লেখ করা হল। কারাগারে কোন বন্দি মারা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজ-কলমে দেখানো হয় যে, বাইরের হাসপাতালে নেয়ার পথেই মারা গেছে।[১৪৪] নিজেদের অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার জন্যই এমন প্রয়াস চালানো হয়।

১৪ নং সারণী

বন্দি মৃত্যুর হিসাব

বছর	*কয়েদী*	*হাজতী*	*ডিটেনু*	*নিরাপদ হেফাজতী*	*সর্বমোট*
১৯৯২	৩৫	৪৬	-	১	৮২
১৯৯৩	৩৩	৫৯	-	২	৯৪
১৯৯৪	৪৫	৫৪	-	-	৯৯
১৯৯৫	৪৭	৫৬	১	-	১০৪
১৯৯৬	৬৬	৬৯	-	৫	১৪০
১৯৯৭	৪২	৬০	-	১	১০৩
১৯৯৮	৫২	৭৯	-	-	১৩১
১৯৯৯	৫৫	৮৮	-	-	১৪৩
২০০০	৬৮	১২৫	-	-	১৯৩

৪.৪.৪ কারাহাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ

কারাহাসপাতালে কাগজে কলমে নামী-দামী কোম্পানীর ওষুধ সরবরাহ দেখানো হলেও প্রকৃত পক্ষে অতিনিম্নমানের ওষুধ নেয়া হয়। আবার অনেক কারাগারে দেখা গেছে, কাগজ-কলমে যে পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ দেখানো হয়; তার $\frac{১}{৪}$ অংশ বা আরো কম ওষুধ নেয়া হয়। তাহলে বন্দিরা প্রয়োজনীয় ওষুধ পাবে কি ভাবে! এসব বিষয় সুপার ও জেলারের দেখার দায়িত্ব থাকলেও তাঁরা দেখেও দেখেন না, কারণ ডাক্তার সাহেব তাঁদের অপকর্মে বাধার সৃষ্টি করেন না এবং ওষুধের বিলের উপর ৬% কমিশন আদায় করেন তাঁরা।

মানুষের জীবন রক্ষাকারী হিসেবে ওষুধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বন্দিদের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কি মানুষের কাজ? বন্দিদশা ছাড়া বাইরে একজনের অসুখ হলে এ ডাক্তার না হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাবে; এক জায়গায় ওষুধ না পেলে অন্য জায়গায় পাবে। কিন্তু বন্দিরা অসুখে ওষুধ না পেলে কি করবে; কোথায় যাবে তারা? বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরা ছাড়া তাদের কি কোন পথ খোলা আছে? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলে বিদ্রোহ হয়েছে। তখন সুষ্ঠু চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের দাবী উঠেছে। তবুও এসবের সমাধান হয়নি। অনেক রাজনীতিবিদ, অনেক নেতা দীর্ঘকাল জেলে থেকেছেন। বাস্তবে দেখে এসেছেন এসব বাস্তব চিত্র এবং পদে পদে সহ্য করেছেন নিপীড়ন। কিন্তু অসহায় বন্দিদের ঐসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁদের সচেষ্ট ভূমিকা রাখার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। ক্ষমতার বাইরে থেকে অনেকেই অনেক কিছু বলেন। তদুপরি ক্ষমতায় গেলেই সব বেমালুম ভুলে যান।

---

[১৪৪] ২২/৫/৯৩ তারিখের " দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

৪.৪.৫ সারকথা

বন্দিদশার মানুষ বন্দিশালায় স্বজনহীন। একমাত্র কারাকর্তৃপক্ষই এদের অতি নিকটের মানুষ। কারাগারের সববন্দিই তাদের কাছ থেকে সবক্ষেত্রেই আপনজনের মত আচরণ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বর্তমানের কারা প্রশাসন কি পেরেছে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে? রোগ-ব্যাধি, জ্বরায় বন্দিরা চিকিৎসা ও সেবা থেকে বঞ্চিত হোক এটা কেউ চায় না। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা ও সেবা করা মহৎ আচরণ। তার উপর বন্দিদশার মানুষের চিকিৎসা ও সেবা নিশ্চিত করা আরও বিরাট কিছু। আর এটা করতে পারলেই আমাদের ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

৪.৫ বন্দিদের শিক্ষা

(4.5 Education in Prison)

৪.৫.১ প্রাসঙ্গিক কথা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে রয়েছে বহুবিধ উদ্যোগ, রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিদের পড়ার অধিকার সংক্রান্ত এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে বন্দিদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৯ সনে আইন পাস করেছে। সাধারণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনই শিক্ষা প্রাপ্ত বা শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় বলে ধরে নেয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা উভয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ধারায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলার কারণে মানুষের জীবন পরিবেশকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

সম্প্রতি সরকার বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে। এতে অশিক্ষিত সব শ্রেণীর বন্দির অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে কারাগার থেকে মুক্তির সময় সববন্দিই নির্ধারিত রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে পারছে। এর আগে অশিক্ষিত বন্দিরা মুক্তির সময় স্বাক্ষর করতে না পারায় তাদের টিপ নেয়া হত।

কারাগারে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একটি মহৎ উদ্যোগ। এ জন্য সরকার প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। কিন্তু কারাগারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সংশোধন করা এবং কর্মমুখী করে সুনাগরিক তৈরী করা। এজন্য বিভিন্ন তথ্যগত শিক্ষা, কর্মমুখী ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন ও নৈতিক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অপরাধীদের মনোযোগী করে তোলা; তাদের মনে অপরাধ বোধের অনুভূতির বীজ বপন করা।

৪.৫.২ কারাব্যবস্থায় শিক্ষা

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে হাল কালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে। এর আগে মাত্র পাঁচটি কারাগারে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বেহাল ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া প্রতিটি কারাগারে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় বক্তব্য প্রদানের নিমিত্তে অবৈতনিক শিক্ষক নিয়োগের প্রথা চালু আছে। সেই ধর্মীয় শিক্ষক সপ্তাহে মাত্র একবার স্বল্পসময়ের জন্য বক্তব্য দিয়ে থাকেন। সংখ্যালঘু ধর্মের বন্দিদের জন্য সরকার কোন ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করে না। এছাড়া কোন বন্দি ইচ্ছা করলে নিজ খরচে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তাদের ক্ষেত্রে আলাদা কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। জেলের বাইর থেকে বই-পত্র এনে পড়া-লেখা করতে হয়। সশ্রম সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের পড়া-লেখা করার জন্য আলাদা কোন সময় দেয়া হয় না।

খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও নৈতিক বক্তব্য প্রদান এবং নম্র-ভদ্র আচরণ প্রদর্শনের ফলে অপরাধীদের মনমানসিকতা সুস্থ না হলেও কিছুটা ফুরফুরে থাকাই স্বাভাবিক। এর পাশাপাশি কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা একাডেমিকভাবে বাধ্যতামূলক করণের ব্যবস্থা করা যায়। একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের বেলায় অনেক পড়া-লেখা, দীর্ঘ মনোযোগ ও অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। পড়া-লেখায় দীর্ঘ মনোযোগ ও সময়ের ব্যবধানে আপরাধীর মনে অপরাধ বোধের জন্ম নেয়াই স্বাভাবিক।

বন্দিদের কর্মমুখী শিক্ষা সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেন, “বন্দিরা কারা জীবন যাপনকালে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কারাগারের নিয়ন্ত্রণে শিল্প কারখানাগুলোতে যাতে কাজ করতে পারে এবং এই কাজের বিনিময়ে তাদের প্রাপ্ত মজুরি যার যার হিসেবের খাতায় লিখে আয়-এর একটি অংশ জমা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েদিরা জেল জীবন শেষ করে বের হওয়ার পর কপর্দকশূন্য থাকে । তাই আয় উপার্জনহীন জীবনে নতুন করে পুরাতন অপরাধ জগতের সঙ্গে সংস্রব স্থাপন করতে বাধ্য হয় । কারা অভ্যন্তরে উৎপাদনমুখী কার্যে নিয়োজিত হয়ে অনেক সাজা প্রাপ্ত কয়েদী পরবর্তী জীবনে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে ব্রতী হতে পারে। কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।”[১৪৫]

---

[১৪৫] আলতাব পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃ.-১৬৪।

৪.৫.৩ অন্যান্য দেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বন্দিদের কম্পিউটার শিক্ষাসহ সকল প্রকার আধুনিক শিক্ষা মেধা ও ইচ্ছা অনুযায়ী প্রদান করা হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সব বন্দি শিবিরে আধুনিক লাইব্রেরী সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরীগুলোতে তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, কারিগরি ও বিনোদনমূলক বই পড়ার সুযোগ আছে।[১৪৬] লাইব্রেরীগুলোতে বই ছাড়াও ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ এবং অডিও-ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিদের লাইব্রেরীর বই-পত্র কেনার নিমিত্তে বার্ষিক প্রতি ৯০০ জন বন্দির জন্য ২২,৭৪০ ডলার বাজেট বরাদ্দ করা হয়।[১৪৭]

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে অপরাধীদের সামগ্রিকভাবে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে কারাগারে সাংস্কৃতিক, কারিগরি, খেলাধুলা, নৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে লেখা-পড়া করানো হয়। এছাড়াও ঐ সব দেশের কারাগারে পর্যাপ্ত লাইব্রেরী সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে।[১৪৮] নির্ধারিত কোর্সে পড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কোন বন্দি মুক্তি পেলে বাইরে এসেও সেই কোর্স সমাপ্ত করা যায়। বিশ্ব বাজারের চাহিদার সংগে সঙ্গতি রেখে কারাগারে কারিগরি শিক্ষার উপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় । বর্তমান চাহিদা অনুসারে তারা যেন নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে নিতে পারে ।

এসব বিবেচনা করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারাগারে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সেসব দেশের কারাগারে বসেই লেখা পড়া করে বন্দিরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে । অনেকেই আবার উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করছে। উচ্চতর ডিগ্রীও লাভ করেছে অনেকে। ঐ সকল দেশে বন্দিদের লেখা-পড়ায় কৃতিত্বের জন্য প্রতি বছর পুরস্কার দেয়া হয়।

৪.৫.৪ সারকথা

অপরাধীদের সংশোধন ও তাদেরকে সুশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন করা হলে কেবল বন্দিরাই উপকৃত হবে তা নয়; এতে দেশের জনগণও বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা কার যায় ।

---

[146] Library Standards for Adult Correctional Institutions /1992, USA, P-6.

[147] Library Standards for Adult Correctional Institutions /1992, USA, P-17.

[148] COUNCIL OF EUROPE, Education in Prison, R(89)12,P-7/8.

অধ্যায়-৫

বন্দিদের সংশোধন পদ্ধতি ও ভোকেশনাল ট্রেনিং

৫.১ কারাশিল্প ও বন্দিশ্রম
(5.1 Prison Industry and Prison Labour)

৫.১.১ প্রাসঙ্গিক কথা

স্মরণাতীতকাল হতে বন্দিদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করার কথা জানা যায়। এককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বন্দিদের দাসে পরিণত করা, ঘানি জাহাজের দাঁড় টানার কাজ ও সম্মুখ যুদ্ধে নিয়োগ করা হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, জঙ্গল পরিষ্কার এবং সরকারী ইমারতাদি নির্মাণের জন্য কারাবন্দিদের নিয়োগ করত। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশের কারাগারে আটক সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের যেসব কাজে বা শিল্পে নিয়োগ করা হতো তা নিম্নে ১৫ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

১৫ নং সারণী

কাজের বা শিল্পের বিবরণ

কাজের বা শিল্পের নাম	**কাজের বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ**
সরিষা পিষানো ঘানি	বন্দিদের দ্বারা টানা ঘানিতে সরিষার তেল উৎপাদন করা।
কম্বল ফ্যাক্টরী	পশমী কম্বল ও পশমী মোটা কাপড় উৎপাদন করে কারাগার ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে সরবরাহ করা।
মৃৎ শিল্প	মাটির থালা, বাটি, কলস ও ইট তৈরী করা।
বিড়ি শিল্প	জনসাধারণের নিকট বিক্রির জন্য বিড়ি তৈরীর কাজ।
রেশম শিল্প	রেশমের গুটি উৎপাদন ও তাঁতে কাপড় তৈরীর কাজ।
ছাঁচ ঢালাই শিল্প (Moulding)	চৌকিদার, দফাদার, কারারক্ষী ও কয়েদী মেটদের জন্য পিতলের ব্যাজ তৈরী করা।
বস্ত্র বয়ন শিল্প	জনসাধারণের কাছে বিক্রির জন্য শাড়ী, লুঙ্গি, বিছানার চাদর, গামছা, সার্টিং কাপড়, ডাস্টার এবং বন্দিদের পরিধানের জন্য কাপড় তৈরী।
সুতা ও পাট শিল্প	কার্পেট, দড়ি (রশি), ব্যাগ, ওয়ালম্যাট, টেবিল ম্যাট, মোড়া, জায়নামাজ ইত্যাদি তৈরী করা।
বাঁশ ও বেত শিল্প	বেত ও প্লাস্টিক কেইনের মোড়া, চেয়ার, ফুডকভার, সাইকেল ঝুড়ি, বুক সেল্ফ, ট্রে, দোলনা, ওয়েস্ট পেপার ঝুড়ি ইত্যাদি।
চামড়া শিল্প	চৌকিদার, দফাদার, এক্সসাইজ পিয়ন, কারারক্ষী ও কয়েদী মেটদের বেল্ট এবং সেন্ডেল তৈরী।

কাজের বা শিল্পের নাম	কাজের বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
দর্জির কাজ	চৌকিদার, দফাদার, এক্সসাইজ পিয়ন, কারারক্ষীদের ইউনিফর্ম তৈরী ও সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের পোশাক তৈরী করা। এছাড়াও কারাকর্মকর্তাদের/ কর্মচারীদের সিভিল পোশাক তৈরীর কাজ।
সাবান ও ফিনাইল শিল্প	জনসাধারণের নিকট বিক্রির জন্য কাপড় কাচার সাবান ও কারাগারসমূহে সরবরাহের জন্য ফিনাইল তৈরী করা।
এ্যালুমিনিয়াম শিল্প	বন্দিদের জন্য থালা ও বাটি তৈরী করা।
কাঠ শিল্প	কারাগারে বন্দিদের এবং কর্মকর্তাদের বাসায় ব্যবহারের জন্য কাঠের আসবাবপত্র।
পাম্প মেশিনে পানি তোলার কাজ	হস্তচালিত পাম্প মেশিনে পানি উঠানোর কাজ।
ছোবড়ার কাজ	নারিকেলের ছোবড়ার পাপোশ তৈরীর কাজ।
কর্মকার	বন্দিদের ব্যবহারিক তৈজষপত্র এবং কারাকর্মকর্তা / কর্মচারীদের জন্য দা, বটি, কুড়াল, খন্তা ইত্যাদি।
লন্ড্রি বা ধোপার কাজ	কারাহাসপাতাল ও অফিসের কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করা। কারাকর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাপড় ধোলাই ও ইস্ি করা।
ক্ষৌর কাজ	বন্দি ও কারাকর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চুল, দাড়ি কাটা।
কৃষি কাজ	বিভিন্ন চাষাবাদের কাজ।
মালী	ফুলের চারা উৎপাদন, ফুলগাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা এবং মালা গাঁথা, ফুলের তোড়া তৈরী করার কাজ।
সুইপার	ড্রেন ও ল্যাট্রিন পরিষ্কারের কাজ।
ঝাড়ুদার	কারাগারের সব জায়গায় ঝাড়ু দেয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ।
রাজ মিস্ত্রির কাজ	কারাগারের বিভিন্ন রাস্তা মেরামত ও নির্মাণের জন্য ইট ভাঙ্গা, সুরকি তৈরী ও রাজমিস্ত্রির কাজ।
সাধারণ শ্রমিক	মালামাল পরিবহন, ওজন করা ও গুদামজাত করা, খড়ি ফাড়াই ইত্যাদি কাজ।
পাচক/ বাবুর্চির কাজ	বন্দিদের খাবার প্রস্তুত, রান্না ও বিতরণ করা।
পশু পালনের কাজ	কারাগারের গরু , মহিষ এবং কারাকর্মকর্তাদের গরু, ছাগল লালন-পালন ও দুধ ছাঁকার কাজ।
চাকী ঘুরানোর কাজ	চাকী (জাঁতা)তে গম পিষে আটা এবং কলাই (puls)পিষে বিভিন্ন জাতের ডাল উৎপাদন করা।
জুতা পলিশের কাজ	কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জুতা ও বুট পলিশের কাজ।
সহায়তাকারী	কারাকর্তৃপক্ষ কয়েদীদের রাইটার[১৪৯], মেট[১৫০], পাহারা[১৫১], সর্দার[১৫২] ইত্যাদি পদে নিয়োগ করে প্রশাসনিক সহায়তার নামে বন্দিদের উপর জুলুম ও নির্যাতন চালায়। অনেক ক্ষেত্রে এদের মাধ্যমেই বন্দিদের উপর নির্যাতন করে টাকা বা কারেন্সি আদায় করা হয়।
বাসাবাড়ীর কাজ	কারাকর্মকর্তাদের সন্তান-সন্ততিকে কোলে রাখা, বাসার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, থালা-বাসন মাজা, রান্না করা, খড়ি ফাড়াই, ঘর মোছাসহ যাবতীয় সাংসারিক কাজ করা।
বাতির কাজ	জেলখানায় আলোর ব্যবস্থার জন্য হারিকেন, ডে-লাইট, হ্যাচাক লাইট পরিষ্কার ও তেল উঠানোর কাজ।
তুলাধুনার কাজ	কারা হাসপাতাল ও শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি এবং কর্মকর্তাদের লেপ-তোষকের জন্য তুলাধুনা ও এগুলো সেলাইয়ের কাজ।

১. কর্তৃপক্ষের হয়ে খাতাপত্রের কাজ করে যে বন্দি।
২. Convict Overseers, কারাপরিভাষা-মেট।
৩. Convict Watchman ,কারাপরিভাষা-পাহারা।
৪. কর্মশালায় নিয়োজিত বন্দিদের প্রধান।

কাজের বা শিল্পের নাম	কাজের বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
সুতা ও পাট রং করার কাজ (Dying)	রঙ্গিন সুতা ও পাটের কাজের জন্য সুতা ও পাট রং করার কাজ।
ধান ভানার কাজ	ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ।
পাখা টানার কাজ	অফিসে, কারাহাসপাতাল ও কেসটেবিলে হাত পাখা এবং দড়ি টেনে পাখার বাতাস করার কাজ।
দড়ির ফেঁসো তৈরী কাজ	জাহাজ বা নৌকার পাটাতনের ফাঁক বা ছিদ্র বন্ধ করার জন্য দড়ির ফেঁসো তৈরীর কাজ।
মহিলাদের কাজ	বন্দিদের খাবারের চাউল, গম ঝেড়ে পরিষ্কার করা এবং অফিসারদের বাসার জন্য কাঁথা ও অন্যান্য সেলাইয়ের কাজ।

১৯৮০ সন থেকে ১৯৮৫ সনের মধ্যে বাংলাদেশের কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বন্দিদের জন্য ১৬ নং সারণীতে উল্লিখিত নতুন কাজ চালু করা হয়।

১৬ নং সারণী

নতুন শিল্পের বিবরণ

কাজের নাম	কাজের বিবরণ
প্রিন্টিং প্রেস (লেটার প্রেস)	কারাগারসমূহের ফরম ও রেজিস্টার ছাপানোর কাজ
বুক বাইন্ডিং	খাতাপত্র, রেজিস্টার বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।
মোজা ও সুয়েটার বুনন	কারারক্ষীদের জন্য মোজা ও সুয়েটার বুননের কাজ।
গম ভাঙ্গানো	বৈদ্যুতিক মেশিনে গম ভাঙ্গানোর কাজ।

৫.১.২ অনেক কাজ বা শিল্প বন্ধের কারণ

অপরাধীদের শাস্তি প্রদান বা ইংরেজ বিরোধী ভারতীয়দের শাস্তি প্রদানের জন্য তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী ১৮ শতকের শেষের দিকে এদেশের কেন্দ্রীয় কারাগারসমূহে সরিষার তেল উৎপাদনের নিমিত্তে তেল মিল {Mustared seed pressing Ghani (oil Mills)} স্থাপন করে। ঐ সব তেল মিলে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের নিয়োগ করে অমানবিক কায়দায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে সরিষা পিষানোর (seed pressing) কাজ করানো হতো। দৈনিক লক্ষ্যমাত্রার তেল উৎপাদনে ব্যর্থ হলে কারখানায় নিয়োজিত বন্দিদের বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো। বিংশশতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম পর্যায়ে বন্দি অসন্তোষ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার বিরোধিতা এবং চাপের মুখে বন্দিদের দ্বারা তেল মিলের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ সব তেল মিল বা ঘানি মিলের কোন চিহ্নই এখন কোন কারাগারে নেই। তবুও কারাগারের যে এলাকায় ঘানি মিল ছিল, সেই এলাকা এখনও " বিঘানী" নামে স্মৃতি বহন করছে।

কম্বল ফ্যাক্টরী বা কম্বল তৈরীর কারখানা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত। শুরু থেকেই এখানে পশমী কম্বল ও মোটা পশমী কাপড় তৈরী হতো বলে জানা যায়। উৎপাদিত কম্বল দ্বারা কারাগারসমূহের চাহিদা মিটানোর পর অবশিষ্ট কম্বল অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হতো। স্বাধীনতার পর তদারকী ও সরকারী নীতি নির্ধারণে ব্যর্থতার কারণে কারখানাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকে। এর পর ১৯৮৩-৮৪ সালে কারাখানাটি ব্যক্তিমালিকানায় দীর্ঘমেয়াদী ইজারা(Lease) দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ঐ কারখানায় নিয়মিত কম্বল উৎপাদন করে তাদের নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশের কারাগারসমূহে সরবরাহসহ খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বর্তমানে কারখানাটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎ শিল্পের কাজ শুরু হয় রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। এ শিল্পে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের নিয়োগ করে উন্নতমানের মাটির থালা, বাটি, কলস ও ইট তৈরী করা হতো। এছাড়াও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বন্দিদের তৈরী ইট ও বিড়ি খোলা বাজারে বিক্রি করার কথা জানা যায়। ১৯৬৫ সনে এ শিল্প দু'টি হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

পূর্ব পাকিস্তান তথা রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী রেশম কাপড়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সনে তৎকালীন কারামহাপরিদর্শক ডাঃ নাসির উদ্দীন সরকার রেশমের গুটি উৎপাদনের জন্য "রেশম প্রকল্প" এর কাজ হাতে নেন। এই কাজে দক্ষ শ্রমিকদের রাজশাহী অঞ্চলে অত্যধিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বন্দিদের দক্ষ করে তোলার মানসে ঐ সনেই রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পরীক্ষামূলকভাবে রেশম গুটি উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়। এ কাজে বন্দিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। এরপর ১৯৬৩ সন থেকে বাজেট বরাদ্দের অভাবে প্রকল্পটি মুখথুবড়ে পড়ে এবং ১৯৬৯ সনে প্রকল্পটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর পঞ্চাশের দশকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে "ছাঁচ ঢালাই শিল্প" (Moulding) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে চৌকিদার, দফাদার, কারারক্ষী ও কয়েদী মেটদের পিতলের ব্যাজ তৈরী করে বিভিন্ন কারাগারে সরবরাহ করা হতো। বন্দি শ্রমের ভিত্তিতে এ ঢালাই শিল্পের কাজ চলতো। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে হঠাৎ করেই কারাকর্তৃপক্ষ এ শিল্পটির প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে সে সময়েই শিল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮ শতকের সত্তর থেকে শেষ দশকের মধ্যে বন্দিদের খাবারের জন্য আটার রুটি ও ডাল পরিবেশন এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থার নামে পর্যায়ক্রমে বড় বড় কারাগারসমূহে গম ও কলাই (Pulse) ভাঙ্গানো চাকী এবং হস্তচালিত পানির পাম্প স্থাপন করা হয়। চাকী ও পাম্প মেশিনের চাকা ঘুরানোর কাজে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের নিয়োগ করা হতো। চাকী বা পাম্পের চাকা ঘুরানোর কাজে একটু তারতম্য ঘটলেই বেত্রাঘাতসহ পায়ে ডাণ্ডা বেড়ী লাগানো হতো। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর্বে সত্তরের দশকের প্রথম পর্যায়ে গম পিষানো ও হস্তচালিত পাম্প মেশিনে পানি উঠানোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একই শতাব্দীর আশির দশকের শেষ পর্যায়ে বন্দিদের ক্ষোভ ও দাবীর মুখে কর্তৃপক্ষ চাকীতে ডাল উৎপাদনের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানের শুরু থেকেই উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজন না থাকায় দড়ির ফেঁসো তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও ১৯৪৯-৫০ সনের মধ্যে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে কারাগারসমূহে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ কারণে ডে-লাইট ও হ্যাচাক লাইটের প্রয়োজনীয়তা হারায়। কিন্তু বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে হারিকেন এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। কারাগারসমূহে বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন হওয়ায় দড়ি টানা পাখা ও হাত পাখার কদর কমে গেছে। তবুও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় অনেক কারাগারে বন্দিদের দিয়ে কর্মকর্তাদের পাখার বাতাস করাতে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশের কারাহাসপাতাল ও শ্রেণী প্রাপ্ত বন্দিদের নারিকেলের ছোবড়ার মেট্রেস সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে কারাগারসমূহে তুলাধুনার কাজ না থাকলেও অনেক জেলে অফিসারদের লেপ-তোষক তৈরীর কাজ বন্দিদের দিয়ে করানো হয়।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ পর্যায় থেকে নব্বইয়ের দশকের প্রথম পর্যায়ের মধ্যে বন্দিদের চাপা অসন্তোষ ও বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সরকার বাসাবাড়ীর কাজে বন্দি শ্রম ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই বন্দিদের দিয়ে বাসাবাড়ীর কাজ করানো হয় না।

বহুপূর্ব থেকেই সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের দিয়ে কারাগারে কর্মকারের কাজ করানো হতো। কারাগারে ব্যবহারের জন্য তৈজষপত্র, কারাকর্মকর্তাদের সাংসারিক লোহার জিনিস পত্র ও ডাণ্ডাবেড়ী কামারশালায় তৈরী হতো। ১৯৯৬ সনে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের বিদ্রোহ দমনের পর হতে নিরাপত্তার কারণে সরকারীভাবে কামারশালার কাজ পরিহার করা হয়েছে। আবার দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর রাজশাহী, বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে ১.৭.২০০১ তারিখ হতে বন্দিদের দিয়ে কর্মকারের কাজ করানোর নির্দেশ জারী করা হয়েছে।[১৫৩]

৫.১.৩ চামড়া ও ফিনাইল শিল্প

বহুপূর্ব থেকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চামড়া শিল্প চালু আছে। এ কাজে নিয়োজিত বন্দিরা দেশের চৌকিদার, দফাদার, এক্সসাইজ বিভাগের পিয়ন, কারারক্ষী ও কয়েদী মেটদের চামড়ার বেল্ট ও সেন্ডেল তৈরী করত। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ শিল্পের উপযুক্ত টেকনিশিয়ান, বন্দিদের কাজ শেখানোর মত উপযুক্ত প্রশিক্ষক না থাকার কারণে শিল্পটি জন্ম থেকেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছিল।

[১৫৩] কারাঅধিদপ্তরের স্মারক নং পিডি/এমডি-৪(২)/২০০১/৮৪৯(৬৪) তাং ৩/৫/২০০১

এছাড়াও চাহিদা মোতাবেক কাঁচামালের অপ্রতুলতা। আবার এ শিল্পের জন্য যেটুকু কাঁচা মাল সরবরাহ হয় তা অনেক নিম্নমানের। যুগোপযোগী মেশিন ও যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বর্তমানে এ চামড়া শিল্পে কাজ হয় না বললেই চলে। আমাদের দেশে চামড়া শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং এ কাজে দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা কম নয়। তবুও কারাকর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা ও উদ্যোগহীনতার কারণে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের চামড়া শিল্পটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর মূলতঃ চৌকিদার, দফাদার, এক্সসাইজ বিভাগের পিয়নদের কারাগারে ইউনিফর্ম তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রথম দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের দ্বারা কাপড় কাচার সাবান ও ফিনাইল উৎপাদন করানো হতো। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালে রাজশাহী ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরীক্ষামূলকভাবে ফিনাইল উৎপাদন শুরু হয় এবং ঐ সনেই কাপড় কাচা সাবানের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমান বাজারে যে ফিনাইল পাওয়া যায়; তা অপেক্ষা কারাগারে উৎপাদিত ফিনাইলের মান অনেক ভাল। কিন্তু ঠিকাদারের মাধ্যমে অনেক চড়ামূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ নেয়ার কারণে উৎপাদিত ফিনাইলের মূল্য অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে এই ফিনাইল খোলা বাজারে চড়ামূল্যে বিক্রি করার উপযুক্ততা থাকে না। বর্তমানে শিল্পটি দেয়ালির মত টিপ টিপ করে জ্বলছে, বাতাসে যে কোন সময় এ ক্ষীণ আলোটুকুও নিভে যেতে পারে।

৫.১.৪ কারাব্যবস্থায় বন্দি শ্রম

সশ্রম সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের কারাগারে কাজ করা বাধ্যতামূলক। তাই বলে তাদের অমানবিক বা ব্যক্তিগত কাজে নিয়োগ করা যায় না। এছাড়াও এমন কাজে তাদের নিয়োগ করা উচিত নয়; যে কাজের সমাজে বা শ্রম বাজারে কোন চাহিদা নেই। বাংলাদেশের কারাগারে যে ধরনের কাজে বন্দিদের নিয়োগ বা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা সবই সেকেলে। এ ধরনের কাজের দক্ষতা শ্রম বাজারে মূল্যহীন। বরং প্রচলিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বন্দিদের চরিত্র সংশোধন না হয়ে দালাল, তোষামোদকারী, প্রবঞ্চক, টাউট ইত্যাদি চরিত্রে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। এখনো বন্দিদের দিয়ে কারাগারে অনেক কাজ করানো হয়, কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে কারাবন্দিদের দায়িত্বশীল নাগরিক করে গড়ে না তুলে বানানো হচ্ছে আজ্ঞাবহ দাস।[১৫৪] বর্তমান বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে অপরাধীদের সে সব কাজে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে পারলেই মুক্তির পর তাদের আয়-রোজগারের পথ করা সহজ হবে এবং তারা সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারবে বলে আশা করা যায়। আধুনিক কালে বন্দিদেরকে মুক্তির পরে কর্মজীবী ও পুনর্বাসনের জন্য কারাগারে বর্তমানে প্রচলিত ও সকল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যথাযথ কার্যকরী বলে বিবেচিত হচ্ছে না।[১৫৫] বাংলাদেশের কারাগারসমূহে অধিকাংশ সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের উৎপাদন বিমুখ কাজে নিয়োগ করা হয়। ফলে ঐ সব কাজে নিয়োজিত বন্দিরা মুক্তির পর বাইরে এসে অকর্মন্য হয়ে পড়ে নয়ত অপরাধ জগতের সাথে পুনরায় সম্পৃক্ত হয়। কাজেই উৎপাদন বিমুখ কাজে বন্দিদের নিয়োগ প্রথা বাতিল করা যেতে পারে। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে Glad Stone কমিটি বন্দিদের উৎপাদন বিমুখ শ্রম বন্ধের জন্য জোর সুপারিশ করে। [১৫৬]

তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার সাজা প্রাপ্ত ভারতীয় বন্দিদের মধ্য থেকে রাইটার, সর্দার, মেট, পাহারা নির্বাচন করে, তাদের দ্বারাই সাধারণ বন্দিদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, জুলুম করার জন্য পাকাপোক্তভাবে আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন এখনো আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন কারাগারে মেট, পাহারাদের দ্বারা সাধারণ বন্দিদের নিগৃহীত হওয়ার খবর পত্রিকান্তরে জানা যায়। সরেজমিন অনুসন্ধানে এসব ঘটনার সত্যতাও পাওয়া যায়।

কারাগারের ভেতরে ব্রিটিশ আমল থেকেই দুর্ধর্ষ কয়েদীদের থেকে বেছে সরকার অনুগত সর্দার, পাহারা, মেট তৈরী করা হয়। এই সর্দাররা অভ্যন্তরস্থ কারারক্ষীর নির্দেশে এবং সহযোগিতায় সাধারণ কয়েদীদের শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকে। তাদের মধ্য থেকে জল্লাদ, বেত্রাঘাতকারী ও পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী বা শিকলবেড়ী পরানোর জন্য নিয়োগ করা হয়। শৌচাগার পরিষ্কার করার জন্য বাইরে

---

[১৫৪] কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪, পৃঃ- ১০৪।

[১৫৫] কারাকর্মকর্তা সম্মেলন পুস্তিকা, ১৯৯৪, পৃষ্টা- ২৫।

[১৫৬] Prof. N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 10th Edition, P-257.

থেকে কোন লোক নিয়োগ করা হয় না।[১৫৭] কাজেই যুগের চাহিদায় এ অমানবিক ও দালাল সৃষ্টি প্রথা বাতিল করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

৫.১.৫ উৎপাদিত পণ্য এবং তার মান, মূল্য ও ক্রেতা

কারাগারে বর্তমানে যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার মধ্যে কুটির শিল্পই অন্যতম। এই শিল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদনের চেয়ে ব্যক্তিগত কাজের জিনিস পত্রই বেশি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর মধ্যে কর্তৃপক্ষের গরুর দড়ি, হাঁস-মুরগীর ঘর, গরু ঘরের বেড়া, গরুর ঘাস রাখা ঝুড়ি, বাসার আবাদ ঘেরার বেড়া, কাপড় শুকানোর জন্য রশি ইত্যাদি অন্যতম। এসব দ্রব্যাদি পেতে কর্মকর্তাদের কোন পয়সা ব্যয় করতে হয় না। ফলে কারাগারে স্থাপিত কুটির শিল্প বৃত্তিমলক প্রশিক্ষণের ব্যানারে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন করে। সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত বন্দিদের দিয়ে যা-তা করানো হয়। কয়েকজন বন্দিকে দিয়ে জমিতে মই টানানোর দৃশ্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।[১৫৮]

বাংলাদেশের কারা শিল্পে যেসব পণ্য তৈরী হয় তার মান অত্যন্ত নিম্ন এবং দামও অনেক বেশি। মূল্যবিহীন বা বেগার খাটুনির শ্রমে নির্মিত জিনিসের দাম কোন ক্রমেই বেশি হওয়ার কথা নয়; তবুও কারা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দাম অনেক চড়া। কারণ উৎপাদনের জন্য যে কাঁচা মাল দরকার, তা ঠিকাদারের মাধ্যমে কেনা হয়। সরবরাহকৃত কাঁচামালের মান খুবই নিম্ন এবং ঐ সব দ্রব্যের মূল্য প্রচলিত বাজারের তুলনায় অনেক বেশি। উৎপাদন বিভাগের বিলের উপর ১০% কমিশন আদায় করে কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও মালামাল সরবরাহের সময় ফিটনেসের জন্য আলাদা টাকা দিতে হয়। ফলে বিভিন্ন খরচের বোঝা মাথায় নিয়ে ঠিকাদার মানসম্পন্ন কাঁচামাল সরবরাহে আগ্রহী হয় না। অপরপক্ষে পকেট ভর্তি ও সুবিধা লাভের কারণে কর্তৃপক্ষও নীরব ভূমিকা পালন করে। তাই ঐসব কাঁচামালে উৎপাদিত নিম্নমানের পণ্য অত্যধিক চড়া মূল্যের জন্য তেমন বিক্রিও হয় না।

৫.১.৬ কারাব্যবস্থায় দেয়া বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও সংশোধন পদ্ধতি

আমাদের দেশের কারাশিল্পে বন্দিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে সব টেকনিশিয়ান বা প্রশিক্ষক নিয়োজিত আছে তারা সবাই হাতুড়ে (Quack) প্রশিক্ষক। ফলশ্রুতিতে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের মান অনেক নিম্ন। এ কারণে কারা পণ্য ও বন্দিদের অর্জিত দক্ষতা প্রচলিত বাজারে গ্রহণযোগ্যতা পায়না। এছাড়াও বর্ধিত সংখ্যক কর্মোপযোগী বন্দির কাজের ব্যবস্থা নেই। কারাগারে কাজের অভাবে অনেক বন্দিকেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ দেয়া সম্ভব হয় না। মানুষ এখানে কাজের অভাবে আলস্য পরায়ণ হয়ে পড়ে। অলসতা মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলে। যে সব হাজতী বন্দি স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায় তাদের কাজ দেয়া উচিত। বন্দিদের আধুনিক শিল্প প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে, সে সব কাজে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়।

বেগার খাটুনি কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা আনেনা এবং আলস্য পরায়ণতার যোগান দেয়। যে কাজে শ্রমের কোন মূল্য নেই, সে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় না। কাজের গতি হয় মন্থর। এখানে শ্রমিক পক্ষের কাজে ফাঁকি ও অনীহার জোয়ার তাদের অদক্ষ করে রাখে। ফলে অদক্ষতার কারণে তাদেরকে দেয়া প্রশিক্ষণের কোন মূল্যই থাকে না। অপরদিকে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের প্রতি দরদ ও পারিতোষিকহীন বাধ্যতামূলক কাজের জন্য শ্রম বিনিয়োগে অমনোযোগিতার ফলে তেমন উৎপাদনও হয় না। ফলশ্রুতিতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ভাবেই বাংলাদেশের কারা প্রতিষ্ঠান সরকারের রাজস্ব খাতে মাথা ভারী প্রশাসন হিসাবে শুরু থেকেই চিহ্নিত হয়েছে। তবে বিশ্বের অনেক দেশের কারাগার লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই আধুনিক যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অপরাধ প্রবণ আচরণ বা অসামাজিক আচরণকে সমাজের কেউ ভাল চোখে দেখে না বা সমর্থন করে না। কাজেই কারাগারে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের আধুনিক শিল্প প্রযুক্তির উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে তারা খারাপ চিন্তা করার অবকাশ পাবে না। এর মাঝে নিয়োজিত কাজে একাগ্রতার ফলে সে দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে। আর এই অর্জিত দক্ষতার

---

[১৫৭] ২২.১২.৯৬ তারিখে " দৈনিক জনকণ্ঠ " পত্রিকা।

[১৫৮] ৩.৮.৯৬ তারিখের " দৈনিক সংবাদ " পত্রিকা।

কারণে তার মাঝে সততার বীজ অংকুরিত হতে শুরু করবে। এর কারণে তার আচার আচরণও পরিবর্তন হতে শুরু করাই স্বাভাবিক। শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ বন্দিদের আচরণ পরিবর্তনের কারণে মুক্তির পর তারা সহজেই সমাজে খাপ-খাওয়াতে পারবে এবং তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ না করে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের চিন্তা মাথায় নিয়ে তাদের সার্বিক যোগ্যতা অনুসারে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করতে হবে। কাজের মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে তাদের দুশ্চিন্তা ও হতাশা দূর করা সম্ভব। আধুনিককালের চিন্তাচেতনায় অপরাধীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করাই সব কাজের লক্ষ্য হওয়াই উচিত।

৫.১.৭ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বন্দি শ্রম ও তাদের প্রশিক্ষণ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের বন্দিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বন্দিশ্রম ও কারাশিল্প পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ-

কানাডা [১৫৯]

১৮৩৩ সনে কিংস্টোন (kingston) এলাকার কারাগারে দক্ষ মিস্ত্রি ও শ্রমিকদের দ্বারা কারাপণ্য তৈরী করে বিক্রির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬৭ সালে কারাবন্দিরা বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানা ফার্মে (Private-sector firms) কাজ করতে শুরু করে। ১৯১৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণে কারাপণ্যের কদর হ্রাস পায়। ১৯২১ সালে Biggar কমিটি পেনিটেনশিয়ারী এ্যাক্ট সংশোধন পূর্বক সরকারীভাবে কারাপণ্য ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব সরকারীভাবে গৃহীত হয়। ১৯৬০ সন থেকে কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৯ সালে Ouimet কমিশন মুক্তির পর বন্দিদের পুনর্বাসনের চিন্তা মাথায় নিয়ে আধুনিক শিল্প প্রযুক্তির সাথে পরিচয়সহ বন্দিদের ব্যক্তি মালিকানার ফার্মে কাজ করানো এবং যুগোপযোগী চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের পরামর্শ দেন। ১৯৭৭ সনে MacGuigan সংসদীয় সাব-কমিটি কারাবন্দিদের উন্নত প্রশিক্ষণ দান, জাতীয় কারা শিল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, বন্দিদের কাজে উৎসাহ দানের জন্য বেতন ও বোনাস প্রদান এবং সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বন্দিদের শ্রমে কারাশিল্প কর্পোরেশন চালু করার সুপারিশ করেন। এর পর উক্ত কমিটির প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হওয়ায় কানাডার জাতীয় কারা শিল্প কর্পোরেশন “CORCAN” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮১ সালে CORCAN ৮০ রকমের পণ্য বাজারজাত করে। ১৯৮৯ সনে বন্দিদের উচ্চহারে পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ ছাড়াও তাদের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য লাভের একটি অংশ বোনাস হিসেবে প্রদানের নিয়ম চালু করা হয়।

১৯৯২-৯৩ সনে CORCAN কর্তৃক বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তিন মিলিয়ন ডলার। এ পণ্য সামগ্রীর মধ্যে অফিস ফার্নিচার অন্যতম বলে জানা যায়। [১৬০]

সৌদি আরব [১৬১]

কারাবন্দিদের সুন্দর পরিপাটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে কাঠের কাজ, দর্জি, প্লাম্বিং, অটোমোবাইল, লন্ড্রি এবং মেরামত সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। বন্দিকে তার নির্ধারিত শ্রমের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা হয়। মুক্তির সময় বন্দিরা তার পারিতোষিকের অর্থ একসংগে নিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখে।

পশ্চিম জার্মানী [১৬২]

পেনিটেনশিয়ারীতে আটক বন্দিদের বাধ্যতামূলক সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়। জার্মানীর কারাগারসমূহে বন্দিদের বিভিন্ন বিষয়ে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বন্দিরা প্রাপ্ত

---

[১৫৯] FORUM, JANUARY/96,V0L-8, NO-1,P-6/7.
[১৬০] FORUM, Sep./ 97, VOL-9, NO-3, P-25.
[১৬১] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১১০।
[১৬২] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১১১।

পারিতোষিকের দুই-তৃতীয়াংশ কারাগারেই খরচ করতে পারে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ তার নামে ব্যাংকে জমা রাখা হয়। এই জমাকৃত টাকা বন্দির মুক্তির সময় তাকে প্রদান করা হয়।

ফ্রান্স [১৬৩]

কারাবন্দিদের কারাশিল্পের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন পণ্য তৈরী করে নেয়ার জন্য অগ্রিম অর্ডার দিয়ে থাকেন। ক্রেতাগণ উৎপাদন খরচ জমা দেয়ার পর উৎপাদনের কাঁচা মালও সরবরাহ করেন। উৎপাদন খরচের (Cost of Production)২০% বন্দির পারিতোষিক প্রদান (Wages), ৩০% তাদের খাদ্য বাবদ খরচ এবং ৫০% সাধারণভাবে ব্যাংকে জমা করা হয়।

স্কটল্যান্ড [১৬৪]

বন্দিদের সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়। বিচারাধীন বন্দিরা ইচ্ছা করলে প্রচলিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারখানায় কাজ করতে পারে। বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং, অটো মেশিন, কাঠের কাজ, প্রিন্টিং, ডেকোরেটিং, গৃহসজ্জা, নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়। স্কটিশ কারাগারের শিল্প কারখানায় ফার্নিচার ও পুতুল নির্মাণ এবং ফ্যাশন বিষয়ে বন্দিরা কাজে নিয়োজিত থাকে। তবে সেখানে পোশাক-পরিচ্ছদ উৎপাদনই প্রধান পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারী বিভাগসমূহেই (Government Departments) উৎপাদিত পণ্যের বৃহৎ ক্রেতা।

শ্রীলংকা [১৬৫]

কৃষিকাজ, পশুপালন, ক্ষুদ্রশিল্প, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, জুতা তৈরী, প্রিন্টিং প্রেস, বেকারী, লন্ড্রি ইত্যাদি কাজে বন্দিদের নিয়োগ করা হয়। তাদের কাজের দক্ষতা অনুসারে ১০ থেকে ১৫ সেন্ট পারিতোষিক প্রদান করা হয়ে থাকে। বন্দিরা অবসর সময়ে চিত্রাংকন ও হস্তশিল্পের কাজ করে। অবসর সময়ে দুশ্চিন্তা বা হতাশা বন্দিদের যেন গ্রাস করতে না পারে সে জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে অবসর সময়ে উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৮০% বন্দিদের প্রদান করা হয়।

থাইল্যান্ড [১৬৬]

কারাগারে কাজ করা বাধ্যতামূলক। বন্দিদের বিভিন্ন ধরনের কারখানার কাজে নিয়োগ করা হয়। তাদের কাজের জন্য পারিতোষিক প্রদান করা হয়। কারাশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% বন্দিদের এবং ১৫% কর্মে নিয়োজিত স্টাফদের প্রদান করা হয় বলে জানা যায়। কাজের প্রতি বন্দিদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য লভ্যাংশ প্রদানের উক্ত নিয়ম চালু করা হয়েছে। বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুসারে বন্দিদের বিভিন্ন শাখায় ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়, যেন ঐ বন্দিটির মুক্তির পর রোজগারের পথ করতে অসুবিধা না হয়।

সিঙ্গাপুর [১৬৭]

সিঙ্গাপুরে বন্দি এবং স্টাফদের সব সময়ই উৎপাদনমুখী মনোভাব। কারাশিল্পে বর্তমান যুগোপযোগী বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়। এই সব উৎপাদিত পণ্য প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী করে কমপক্ষে এক মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার বছরে আয় হয়। এছাড়াও তৈরীকৃত পোশাক, লন্ড্রি ও প্রিন্টিং কাজের জন্য বছরে দুই মিলিয়ন ডলার কারাবিভাগ আয় করে থাকে। সিঙ্গাপুরের কারাবিভাগ রাজস্ব খাতের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। কারাবন্দিরা তাদের প্রাপ্ত পারিতোষিকের ৬০% কারাগারের ক্যান্টিনে খরচ করে এবং অবশিষ্ট ৪০% পোষ্ট অফিস সেভিং ব্যাংকে (POSB) জমা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। POSB তে জমাকৃত সমুদয় অর্থ তার মুক্তির সময়

[১৬৩] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১১৬।
[১৬৪] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১২৫/১২৬।
[১৬৫] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১৩৩/১৩৪।
[১৬৬] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১৩৫/১৩৬।
[১৬৭] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১৪১।

এক সংগে প্রদান করা হয়। এ কারণে বন্দিদের মুক্তির পর পুনর্বাসনের বিষয়টি সহজতর হয় বলে জানা যায়।

হংকং [১৬৮]

কারাশিল্পে জুতা, কাঠের কাজ, হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্নিচার, গার্মেন্টস ও ইউনিফর্ম এবং রাস্তায় প্রদর্শনের জন্য ব্যানার ও ফ্লাগ, রেডিও/ টেলিভিশন মেরামতের কাজ করানো হয়। এসব কাজে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বন্দিরা তাদের প্রাপ্ত পারিতোষিক থেকে ৭৫% কারাঅভ্যন্তরে ক্যান্টিনে খরচ করতে পারে। অধিক নিরাপত্তার কারাগারে "মেটাল ওয়ার্ক" নিষিদ্ধ। অন্যান্য সরকারী বিভাগের সহায়তায় বন্দিরা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র [১৬৯]

স্মরণাতীতকাল থেকে বন্দিদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ করানোর কথা জানা যায়। ১৮২৪ সনে নিউইয়র্কের অবার্নে (Auburn) ১ম কারাশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানে পেনসিলভিয়া পদ্ধতিতে কারাগারের ভেতরেই পৃথকভাবে কাজ করার নিয়ম চালু করা হয়। বন্দিদের স্বাবলম্বী ও বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলার জন্য তখন থেকেই গঠনমলক চিন্তা-ভাবনা শুর হয়। এ যুগে কর্মবিমুখ ও অলস জাতি প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হতে পারে না। তাই বন্দিশ্রমকে কর্মবিমুখ ও অলসতায় পর্যবসিত না করে বৃহৎ কারাবাসীর শ্রমকে কাজে লাগানোর বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৯ শতকে কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তি মালিকানা ফার্মে বন্দিদের কাজ করানো হতো। তবে কারাশিল্প ব্যক্তি-মালিকানা ফার্মের সাথে সংযুক্ত বা যৌথ ব্যবসার বিষয়টি নতুন নয়। বন্দিদের শ্রমের পারিতোষিক ফার্মের পক্ষ থেকে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হতো বলে জানা যায়। ঐ সময় শিল্প বিপ্লবের কারণে হস্তশিল্পের জায়গায় যন্ত্রশিল্প জায়গা করে নেয়। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত কারখানাসমূহে শুরু গম্ভীরভাবে চলতে থাকে। ফলে ঐ সময় কারা শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বিগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মালিকানা ফার্মের যৌথ ব্যবসায় বিভিন্ন রাজ্যের কারাশিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ঐ যৌথ মালিকানার কারাশিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতার খোলা বাজারে বিক্রি করে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া গেছে। এ সব আধুনিক শিল্প-কারখানায় একাগ্রতার সাথে কাজ করার ফলে কারাবাসিন্দাদের চারিত্রিক সংশোধনের বিষয়েও আশাতীত অগ্রগতি হয়েছে। বন্দিদের ব্যক্তি মালিকানা ফার্মে কাজের অভিজ্ঞতা, তাদের মুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক জীবন যাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। তবে প্রাপ্ত পারিতোষিকের একটি অংশ সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট পাঠানোর অধিকার রাখে।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে কারাবন্দিদের কাজে লাগানো বা বন্দি শ্রম সঠিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। [১৭০]

- ▲ বন্দিদের সার্বিক যোগ্যতা অনুসারে কাজে নিয়োগ করা।
- ▲ বন্দিদের চারিত্রিক সংশোধন ও পুনর্বাসনের চিন্তা মাথায় নিয়ে তাদের কাজে নিয়োগ করা এবং কোনক্রমেই তাদের মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন না করা।
- ▲ সবকাজ বা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হবে বন্দির মুক্তির পর তাকে পুনর্বাসিত করা।
- ▲ কারা ব্যবস্থাপনায় বন্দি ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুস্পর্ক বজায় রাখা।
- ▲ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য বন্দিকে কষ্ট না দেয়া।
- ▲ কোন ক্রমেই বন্দিদের ব্যক্তিগত কাজে বা উৎপাদন বিমুখ কাজে নিয়োগ না করা।
- ▲ সব বন্দিকে সমতার চোখে দেখা।
- ▲ বন্দিদের কাজের অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন করা।
- ▲ প্রত্যেক বন্দির সংশোধনের নিমিত্তে তার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

---

[১৬৮] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II, পৃ-১৫৩/১৫৫।

[১৬৯] Barbara J. Auerbach, George E. sexton, Franklin C, Farrow, Ph.D. and Robert H. Lawsom. Work in American
Prisons, The Private Sector Gets Involved, May, 1988. Publised by National Institute of Justice, USA.

[১৭০] K.J. Neale, Work in Penal institutions, COUNCIL OF EUROPE, 1976.

- ▲ বন্দিদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য পারিতোষিক প্রদানের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া।
- ▲ বাইরের শ্রম বাজারের সাথে সমতা রেখে বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা।
- ▲ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা।
- ▲ নতুন ধ্যান-ধারণায় উৎপাদনের নীতিমালা গতিশীল করা।
- ▲ যৌথ মালিকানা ফার্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই জনসাধারণের মতামতের গুরুত্ব দেয়া।
- ▲ যৌথ মালিকানায় কারাশিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মাঝে মতবিরোধ না রাখা।

৫.১.৮ যৌথভাবে শিল্প-কারখানা পরিচালনা

বাংলাদেশের কারাগার অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বাজেটের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কাজেই আয় বৃদ্ধি করে এই প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে না পারলে অপরাধীদের সংশোধন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে না। সঠিক পরিকল্পনা ও আর্থিক সংকটের কারণে কারা জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কারাবন্দিদের উৎপাদনশীল ও প্রশিক্ষণমূলক কাজে নিয়োগ করে আয়বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে আধুনিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করায় নিম্ন লিখিত সুবিধা পাচ্ছে।

কারাগারে যৌথভাবে শিল্প-কারখানা পরিচালনার সুবিধাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

১। বর্ধিত সংখ্যক বন্দির কাজের ব্যবস্থা করা যায়।
২। আর্থিক ঝুঁকি অত্যন্ত কম।
৩। বন্দি মুক্তির পর দক্ষতা অনুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়ার পথ সুগম হয়।
৪। নিরাপদ ও উপযুক্ত জায়গায় মেশিন-পত্র স্থাপন করা যায়।
৫। কারাশিল্প যৌথ পরিচালনার বিষয়টি উৎপাদনমুখী শিল্পোদ্যোগ।
৬। উৎপাদনমুখী কাজের জন্য বন্দিরা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।
৭। শ্রমিকদের সঠিক উপস্থিতির ঘাটতি হয় না।
৮। সরকারী বিভাগসমহ কারাপণ্য কিনলে আকস্মিকভাবে বিক্রি বৃদ্ধি পায়।
৯। বাইরের শ্রমিকদের চেয়ে কারাশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি কম।
১০। অপ্রত্যাশিত ধর্মঘট বা হরতালের কারণে কারখানা বন্ধ থাকে না।
১১। বন্দি শ্রম উৎপাদনমুখী কাজে লাগানোর বিষয়টি জনসমর্থন পায় এবং গণযোগাযোগ বৃদ্ধিপায়।
১২। দীর্ঘমেয়াদী সাজা প্রাপ্ত বন্দিরা দীর্ঘদিন কারখানায় কাজ করার ফলে সুদক্ষ (Highly Skilled) হয়ে উঠে।
১৩। বন্দিদের মুক্তির পর পুনর্বাসনের প্রত্যাশাকে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে।
১৪। বেগার খাটুনির পরিবর্তে পারিতোষিক প্রদান করায় বন্দিদের কাজে মনোযোগ বাড়ে।
১৫। কাজের অভ্যাস, দক্ষতা ও একাগ্রতা বাড়ায়, এ দক্ষতা ও একাগ্রতা কারা শৃংখলা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

যৌথভাবে কারাগারে শিল্প কারখানা পরিচালনার অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ-

১। শিল্পোদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ, টেকনিশিয়ানদের কারাগারে প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় হয়।
২। কারখানায় কাজ করার কারণে বন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ঝুঁকি নেয়া।
৩। মালামাল প্রবেশ ও বের করার সময় নিরাপত্তার কারণে বিলম্ব ঘটে।
৪। অনেক সময় নতুন উদ্যোগের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আইনগত জটিলতা দেখা দেয়।

সর্বোপরি বলা যায় কারাগারে যৌথভাবে শিল্প-কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি লক্ষণীয়। কাজেই কারাগারের আয় বৃদ্ধি, বন্দিদের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ ও আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে কারাশিল্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

পরিশেষে বলা যায় যে, কারাগারকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঃ-

ক. *সরকারী ও রাজনৈতিক দৃঢ় সমর্থন থাকতে হবে।*

খ. *অর্থনৈতিক গতিধারা সচল রাখতে হবে।*

গ. *কারাশ্রমিকদের প্রতি নমনীয়তা ও দরদী মনোভাব থাকতে হবে।*

৫.১.৯ সারকথা

জাতীয় স্বার্থে সুপরিকল্পিতভাবে কারাশিল্পকে গতিশীল ও উৎপাদনমুখী করা অত্যাবশ্যক। আর এ জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতঃ পুরাতন বিধির সংশোধন অপরিহার্য। কারা শিল্পের বাস্তবমুখী উন্নয়ন ও অপরাধীদের সংশোধনের লক্ষ্যে আমাদের দেশের সরকারকে সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সে সাথে কারা কর্তৃপক্ষকে স্বীয় স্বার্থে মগ্ন না থেকে কারাবিভাগ তথা দেশের উন্নতিকল্পে আত্মসচেতন হয়ে কারাশিল্পের উন্নয়ন, বন্দিদের প্রতি আইনসঙ্গত আচরণ ও মানবিক সুদৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই আমাদের দেশের কারাগার রাজস্ব খাতের বোঝা না হয়ে সমাজ তথা জাতীয় উন্নয়নে উত্তরোত্তর কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

৫.২ বন্দিমুক্তি ও তাদের পুনর্বাসন

(5.2 PRISONER ON RELEASE AND THEIR REHABILITATION)

৫.২.১ প্রাসঙ্গিক কথা

বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের দুইভাবে মুক্তি দেয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু মুক্তির পর তাদের দেখা শোনা ও পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে আজও প্রচলন হয়নি। বন্দিদের মুক্তি দেয়ার নিয়ম ২টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

▲ শাস্তি বা সাজা ভোগের পর মুক্তি।

▲ আদালতের আদেশে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে মুক্তি।

বিচারে দোষী সাব্যস্তে সাজা প্রাপ্ত হয়ে যে সব বন্দি কারাগারে আগমন করে; তাদের সাজা ভোগের পর নির্দিষ্ট দিনে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এতে সাধারণত কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অপরপক্ষে কোন বন্দি সাজা প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আগমনের পর উচ্চতর আদালতে আপিল করে। অনেক ক্ষেত্রে আপিল শুনানিকালে সংশ্লিষ্ট বন্দির জামিনে মুক্তির আদেশ হয়। এই ক্ষেত্রে জামিন সংক্রান্ত আদেশনামা নির্দিষ্ট সময়ে জেল গেটে পৌছার পর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বন্দিটির মুক্তি দেয়া হয়। আবার আপিলকারী বিচারে খালাস পেলেও তাকে জেলখানা থেকে ঐ একই নিয়মে মুক্তি দেয়া হয়।

বিচারাধীন বন্দিরা কারাগারে আগমনের পর আদালতের সন্তুষ্টিক্রমে যে কোন সময় জামিনে মুক্তি পেতে পারে। এ ছাড়াও বিচারাধীন বন্দি বিচারে অব্যাহতি বা খালাস প্রাপ্ত হয়ে মুক্তি পেতে পারে। তবে ডিটেন্যু বন্দিদের আটকাদেশের মেয়াদ শেষে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে তারা মুক্তি লাভ করে।

৫.২.২ কারাব্যবস্থায় বন্দিমুক্তি

কয়েদী বা হাজতীদের জামিনের আদেশ বা খালাসের আদেশ যাহাই হোক না কেন "কোর্ট-জেলের" গ্যাড়াকলে তাকে পড়তেই হয়। খেলতে হয় হাত বদলের খেলা। আদালতের কেরানী, পিয়ন থেকে শুরু করে জেলখানার সংশ্লিষ্ট শাখার ডেপুটি জেলার পর্যন্ত সকলকে কম-বেশি টাকা দিতে হয়। জামিন বা খালাসের আদেশ প্রাপ্ত বন্দির আত্মীয়-স্বজনের নিকট টাকা আদায়ের জন্য ডেপুটি জেলারের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক কারারক্ষী জেল গেটের সামনে নিয়োজিত থাকে। আর টাকা না দিলেই বিভিন্ন অজুহাত, যেমন-এখন সময় নেই, কাগজে ভুল আছে, মামলা নাম্বার ঠিক নেই, পিতার নামে গরমিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ওপেন-সিক্রেট ঘটনা প্রতিটি কারাগারেই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অনেক কাকুতি-মিনতি করেও এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। সরেজমিন অনুসন্ধানে এসবের নিম্নলিখিত কারণ উদঘাটিত হয়েছে।

১। আদালত থেকে সময়মত জামিন বা খালাসের আদেশনামা পাঠাতে বিলম্ব।

২। জেল সুপার ও জেলারের তদারকীর অভাব।

৩। দুর্বল প্রশাসন।

কেস-১১

জামিন প্রাপ্তির পর আটক রাখার অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার কসবা থানার মোঃ আব্দুর রউফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করা মামলার আর্জিতে অভিযোগ করেন যে, বাদীসহ অপর ৭ জনের আদালত কর্তৃক জামিনের আদেশ হয় এবং উক্ত আদেশনামা যথাসময়ে কারাগারে পাঠানো হয়। কিন্তু কারাকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে তাদের জামিনে মুক্তি না দিয়ে অতিরিক্ত ৩ দিন আটক রাখে। উৎসঃ- ২৭/০২/১৯৯০ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা।

জেলসুপার ও জেলার আন্তরিকতার সাথে তদারকি করলে নিম্ন কর্মচারীরা ঐসব অপকর্ম করার সাহস পাবে না। কিন্তু তাঁরা জেনেও না জানার ভান করেন। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ওসবের সাথে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। কারণ নিম্ন কর্মচারীরা ঐসব আর্থিক সুবিধা ভোগ করায় সুপার, জেলারের অপকর্মে বাধার সৃষ্টি করে না। ফলশ্রুতিতে বন্দি ও বন্দির আত্মীয়-স্বজনদের সীমাহীন নিপীড়ন ও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় খবর আসে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসবের কোন প্রতিকার করেছেন বলে জানা যায় না। কাগুজে রিপোর্ট কাগজেই থেকে যায়; বন্দিদের দুঃখ-বেদনায় কেউ মাথা ঘামায় না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় বিচার বিভাগ ও জেলা প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করলে এবং জেলখানার স্পর্শকাতর বিষয়গুলো ঠিকমত মনিটরিং করলে ঐ সব সমস্যাগুলোর প্রতিকার হতে পারে বলে আশা করা যায়।

সর্যাস্তের কিছু পূর্বেই বন্দিদের তালা বন্ধ করে দেয়া হয়। এই কারণে তালা বন্ধের কমপক্ষে তিন ঘন্টা পূর্বে আদালত থেকে কাগজ-পত্র জেল গেটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলে অহেতুক জনগণের হয়রানি কমবে এবং “সময় নেই” অজুহাত দেখানোর সুযোগ বন্ধ হবে।

৫.২.৩ মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা

অপরাধ দমন বা প্রতিরোধের জন্য প্রতিশোধমূলক শাস্তি বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বা পাল্টা দুর্ব্যবহারের পদ্ধতি এযুগে অচল। বর্তমান ধ্যান-ধারণায় উন্নত বিশ্বে অপরাধ যাতে না ঘটে তার জন্য বাধা সৃষ্টি এবং অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। অপরাধীকে শাস্তি বা কারাদণ্ড দিলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেয়া দরকার। ১৯ শতকের প্রথম দশকে গঠনমূলক শ্রমনীতি ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরাধীদের সংশোধন পদ্ধতি প্রবর্তন হতে শুরু করে। দীর্ঘ দুই শতাধিক বছর পরেও আমাদের দেশে অপরাধীদের মুক্তির পর দেখা-শোনা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। একজন অপরাধী কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার কারণে স্বাভাবিক সম্ভাষণ সে পায় না। আত্মীয়-স্বজন এদের সহজে গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি এদের কেউ কোন কাজে নিযুক্ত করতেও চায় না। এছাড়াও দীর্ঘদিন কারা ভোগের পর বাইরে এসে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে না। এমনকি প্রিয়জনকেও পাওয়া যায় না। আবার কেউ কারাভোগ শেষে বাইরে আসার পর ঐ এলাকায় কোন অপরাধ সংঘটিত হলে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মোদ্দাকথা আমাদের দেশের সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনই যে, একবার কোন অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হলে বার বার তাকে জেলে যেতে হয়।

“সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কেবল দাগী হওয়ার অপরাধে তাদেরকে আশপাশের প্রতিটি অপরাধ ও দুষ্কৃতির জন্য দায়ী করা হয়। শেষ পর্যন্ত হয়ত সেসব অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু টানা-হেঁচড়ার ফলে হতভাগ্যের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। অনেক খেসারত দিয়ে ,অনেক হস্তকে সন্তুষ্ট করে হয়ত সে সাময়িক মুক্তি পায়। দু’দিন পর পুনরায় একই অংক অভিনীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিলোভী অর্থলোলুপ পশুরা ওদেরকে চুরি-ডাকাতি করার জন্য রীতিমত উস্কানী দেয়। এদের প্রভাবে দারিদ্র্যের চাপ এবং সর্বোপরি সৎ জীবন-যাপনের পরিপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ ওদের বাধ্য করে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে। পিঠে পড়বে, পেটে পড়বে না- এ ব্যবস্থা ওরা মেনে নিতে পারে না।[১৭১]”

আমাদের দেশে অপরাধীদের মুক্তির পর দেখা-শোনা ও পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। এরপরও সামাজিক অবহেলা ও প্রশাসনিক প্রতিকূলতার কারণে তারা সৎ জীবন যাপনে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়াও অপরাধীদের কারাবাসকালে যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানপূর্বক দক্ষ করে তোলা হয় না। ফলে তারা কারাগার থেকে বাইরে এসে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। যুগোপযোগী কাজের দক্ষতা অর্জন করে কারাগার থেকে বেরুতে পারলে এবং সহযোগিতা পেলে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

---

[১৭১] শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নিত্য কারাগারে , ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ ১১৫/১১৬।

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কারাগার থেকে সাজাভোগ শেষে মুক্তি প্রাপ্তদের সমাজ ভালভাবে গ্রহণ করে না এবং তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। হীনমন্যতায় বশিভূত হয়ে তাদেরকে আমরা সমাজের নিকৃষ্ট জীব বা জঞ্জাল বলে মনে করি এবং তাদেরকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। এই সব কারণে উক্ত ব্যক্তি মুক্তির পর সহজে সমাজে খাপখাওয়াতে (Adjust) পারে না। এ ছাড়াও কিশোরীরা মুক্তির পর সামাজিক অবহেলার কারণে দালালের খপ্পরে পড়ে। কেউ যখন অপরাধ করে, তখন তার মনের অবস্থা, পরিবেশ ও কারণ জানলে আর তার প্রতি ঘৃণা আসে না।[১৭২] পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আর্থসামাজিক কারণে অনেকেই অপরাধ করে। তখন আমরা সেই বিশ্লেষণ না করে; তাকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এই মনোভাব আমাদের সামাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। যার কারণে আমরা নিজের মুখ আয়নাতে না দেখে অন্যের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণে সদাই পঞ্চমুখ হয়ে থাকি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ফলে দেশে এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে আমাদের উন্নয়ন নিম্নমুখী। সার্বিকভাবে বলা যায় হীনমন্যতা আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। আমাদের দেশের তথা জাতির মঙ্গলের জন্য সকলের এই মানসিকতা পরিবর্তন করা অপরিহার্য।

মানুষ ভুল করে, মানুষ অপরাধ করে, পরিণামে তার শাস্তি হয়। কিন্তু তাকে ঘৃণা করা আমাদের উচিত নয়। তাকে মানুষ হিসেবে আমাদের দেখা উচিত। সেও তো সংশোধন হয়ে আপনার মত সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে; তাকে সে সুযোগ দেয়া দরকার।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক উদাসীনতার কারণে অপরাধীরা কারাভোগ শেষে বাইরে এসে সৎ জীবন যাপনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন Shelter পায় না এবং তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। ফলে তারা পুনরায় অপরাধ জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই সব কারণ বিবেচনা করে অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ার চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিপ্রাপ্তদের (Ex-Prisoner) প্রয়োজন অনুসারে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের (Shelter) ব্যবস্থা করা এবং দক্ষতা অনুযায়ী রোজগারের পথ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা যতই কথা বলি না কেন; যত মিটিং, মিছিল, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম করি না কেন; এসব ব্যাপার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক শক্ত সিদ্ধান্ত (Concrete Decision) দরকার। তাছাড়া এসব সমস্যার সমাধান আশা করা আর আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো একই কথা।

৫.২.৪ কর্মমুখী কাজে বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও অর্জিত দক্ষতা

বর্তমানে বাংলাদেশের কারাগারে সেকেলে পন্থায় বন্দিদের কিছু কিছু কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বন্দিরা মুক্তির পর সেইসব কাজের দক্ষতায় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায় না বা ঐ দক্ষতার বলে রোজগারের পথ যোগাড় করতে পারে না। ফলে তাকে দেয়া প্রশিক্ষণ ও অর্জিত দক্ষতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কাজেই বর্তমান যুগে যেসব কর্মমুখী কাজের চাহিদা প্রবল; সেসব কাজের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বন্দিদের দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারলেই তাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসন করা সহজতর হবে।

একটা এনজিও ভবঘুরে কেন্দ্রে মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়। বাস্তবে এ ধরনের প্রশিক্ষণ চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগে না। বরং তারা যে সার্টিফিকেট দেয় সেটা দেখালে যৌনকর্মীদের কেউ চাকুরীও দিতে চায় না। ভবঘুরে কেন্দ্রগুলো যৌনকর্মী বানানোর কারখানা[১৭৩]। এ ধরনের ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার মানসিকতা আমাদের পাল্টাতে হবে। আন্তরিকতা, মানবতাবাদি ও দরদী মন নিয়ে এদের পাশে এসে দাঁড়ালে; এরাও সংশোধিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থানের জায়গা অতিনগণ্য। কাজেই আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছি না। ফলে দিন দিন বেকারত্বের বোঝা গাণিতিক হারে বেড়েই চলেছে। এর মাঝেও যোগ্য ও দক্ষ লোকের খুবই অভাব। তবে দক্ষ ও যোগ্য লোকের চাহিদা যুগে যুগে সব দেশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। Only the skilled

---

[১৭২] ১/৭/৯৭ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[১৭৩] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা ও কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃ-২৮।

person would be in demand. কাজেই বাংলাদেশের কারাগারসমূহে শাস্তি বা দণ্ড ভোগরত অপরাধীদের বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে কর্মমুখী শিক্ষার তত্ত্ব জ্ঞানে ও হাতেকলমে দক্ষ (skilled) করে তুলতে পারলে, মুক্তির পর তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা রোজগারের পথ করে দেয়া সহজতর হতে পারে।

৫.২.৫ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বন্দি মুক্তি ও তাদের পুনর্বাসন

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ও ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে অপরাধীদের সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা মাথায় নিয়ে তাদের বর্তমান যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষার তত্ত্ব জ্ঞান ও হাতে কলমে দক্ষ করে তোলা হয়। এর পর অপরাধীদের আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে সমাজে খাপ খাওয়ানো ও পুনর্বাসনের জন্য মুক্তির কিছুকাল পূর্বে (Pre-Release) শর্তাধীনে তদারকির মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেয়া হয়। তদারকির মাধ্যমে সাময়িক মুক্তিকালের রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে তাদের চূড়ান্ত মুক্তি (Final Release) দেয়া হয়। ঐসব দেশে অপরাধীদের মুক্তির পর দেখা-শোনা (After care service) করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে অপরাধীর দণ্ডের $\frac{১}{৩}$ অংশ খাটার পর তার ব্যক্তিত্ব, চাহিদা ও সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করে "শর্তাধীনে মুক্তি" (Conditional Release) মঞ্জুর করা হয়। এই সাময়িক মুক্তিকালীন সময় তার আচরণ ও চলাফেরা সন্তোষজনক বিবেচিত হলে তাকে চূড়ান্ত মুক্তি বা Final Release দেয়া হয়।[১৭৪]

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্যারোল ও প্রবেশন পদ্ধতির চেয়ে তদারকির মাধ্যমে অপরাধীদের মুক্তির (Supervision Release or Community Supervision) বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবেশন ও প্যারোল প্রথার চেয়ে Federal Community Supervision এর অধিক গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে Sentencing Reform Act of 1984 অনুমোদন করে। এই আইন ১.১১.৮৭ হতে প্রচলিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়ার কথা জানা যায়। বিগত সাত বছরে Community Supervision Release পদ্ধতিতে মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা নিম্নে ১৭নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো-[১৭৫]

১৭ নং সারণী

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক তদারকিতে সাত বছরের মুক্তির হিসাব

সাল (Year)	সামাজিক তদারকিতে মুক্তি (Community Supervision Release)
১৯৯০	৫২৭৭
১৯৯১	১১৩৪৪
১৯৯২	১৮৯৩২
১৯৯৩	২৫৯৩০
১৯৯৪	৩৩০৬৩
১৯৯৫	৩৯০৮৫
১৯৯৬	৪৫৬৬২

কানাডায় অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে Full Parole এবং Day Parole এর বিধান চালু আছে। কোন অপরাধীর ব্যক্তিগত চাহিদা, ব্যক্তিত্ব, অপরাধের ধরন ও সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করে কানাডার জাতীয় প্যারোল বোর্ড চার ধরনের প্যারোল মঞ্জুর করে থাকে। যথা ঃ-

---

[174] Report of the European Committee on Crime problems, Council of Europe, 1970, P-21-23.

[175] US Department of Justice, Bureau of Justice Statistic, Special Report, August, 1998, NCJ- 168636.

A. Short Parole.
B. Gradual Parole.
C. Temporary Parole.
D. Minimum Parole.

কানাডায় Full Parole এবং Day Parole মঞ্জুরের (Pre-Release Decision) বিগত ১০ বছরের হিসাব নিম্নে ১৮ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো।[১৭৬] কোন অপরাধীর Day Parole রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে তার Full Parole মঞ্জুর করা হয়।

১৮ নং সারণী

কানাডায় প্যারোল প্রথায় দশ বছরের মুক্তির হিসাব

অর্থ বছর (Fiscal Year)	ফুল প্যারোল (Full Parole)	ডে প্যারোল (Day Parole)	সর্বমোট (Grand total)
১৯৮৮-৮৯	২৭৯০	৪৬৩১	৭৪২১
১৯৮৯-৯০	২৭৫২	৪৫৮৭	৭৩৩৯
১৯৯০-৯১	২৯৫৮	৫২১৪	৮১৭২
১৯৯১-৯২	৩১৬৬	৫৫৪০	৮৭০৬
১৯৯২-৯৩	৩৪৭৮	৫৫৯৫	৯০৭৩
১৯৯৩-৯৪	৩৩৭১	৪৮৪৪	৮২১৫
১৯৯৪-৯৫	২৮৩১	৪৩০৯	৭১৪০
১৯৯৫-৯৬	২৪০২	৩৪৫১	৫৮৫৩
১৯৯৬-৯৭	২২০০	২৯৭২	৫১৭২
১৯৯৭-৯৮	২৩১৯	৩৮৬১	৬১৮০

কানাডার Day Parole প্রথাকে যুগোপযোগী ও আরও সংশোধন করে ১৯৯২ সনে Corrections and Conditional Release Act জারী করা হয়েছে। এরপর থেকে কানাডায় অপরাধীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে বলে জানা যায়।

ইংল্যান্ডে মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের দেখাশোনা ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে Criminal Justice Act জারি করা হয়। সেই সময় থেকেই মুক্তি প্রাপ্তদের দেখা শোনা (After-Care Service) ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। After-Care Association মুক্তি প্রাপ্তদের দেখা-শোনা ও পুনর্বাসনের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করে। ফলে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এ অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আশানরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।[১৭৭] এছাড়াও চার বছর বা তার অধিক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের Pre-Release Scheme এর অধীনে কারাগারের বাইরের কল-কারখানায় কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। [১৭৮]

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উত্তর প্রদেশে (U.P) প্রতিজেলায় After-Care Service and Rehabilitation কমিটি আছে। অপরাধ প্রতিরোধ সংস্থা জেলা কমিটির মাধ্যমে After-Care Service এর কাজ করে থাকে। জেলা কমিটি মুক্তি প্রাপ্তদের প্রয়োজন অনুসারে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের (Shelter) ব্যবস্থা করে দেয়। এরপরও ভারতের বিশাল বেকার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মানবিক কারণে এবং অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি প্রাপ্তদের দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এছাড়াও বিশাল বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুক্তিপ্রাপ্তদের আর্থিক সহযোগিতাসহ দক্ষতা অনুযায়ী রোজগারের পথ করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে।[১৭৯]

---

[176] FORUM, May/98, Vol- 10, No-2, P-7.

[177] Ahmad Siddique, Criminology, 4 th Edition, P- 180.

[১৭৮] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৮।

[179] Ahmad Siddique, Criminolgy , 4th Edition, P- 179/180.

বৃটিশ প্রিজন কমিশনের চেয়ারম্যান Sir Lional Fox বলেন, সমাজ যদি পুনরাবৃত্তিকারী অপরাধীদেরকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে তাহলে অপরাধ পুনরাবৃত্তি সমস্যা কমে আসবে।[১৮০]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে প্রবেশন অফিসার বা কমিউনিটি সুপারভিশন অফিসার বা আফটার কেয়ার অফিসার পদে সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজকর্ম বিভাগের ডিগ্রীধারী মেধাবী লোকদের নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়াও তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচুতে বিবেচিত হয় বলে জানা যায়। তাদের সার্বিকভাবে ওভার-টাইম কাজের মূল্যায়ন করা হয়।

৫.২.৬ সারকথা

আমাদের দেশে বেকার সমস্যা সমাধান কল্পে শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সরকারী উদ্যোগে "কর্ম সংস্থান ব্যাংক" নামে অর্থায়ন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এটার জন্য সরকার প্রশংসা পাওয়ার দাবীদার। ঠিক এই ধরনের কর্মসূচীর আওতায় যুগোপযোগী ও Demandable কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ বন্দিদের সহজ শর্তে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও তাদের আবাসিক (Shelter.) সমস্যা নিরসন কল্পে হোস্টেল বা ডরমেটরীর ব্যবস্থা করা যায়। আধুনিক সংশোধন পদ্ধতিতে তদারকী, শর্তাধীনে মুক্তি, প্যারোল ও প্রবেশন প্রদানের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলেই মুক্তি প্রাপ্তদের সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করা সহজতর হবে।

---

[১৮০] বোরহানউদ্দীন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫, পৃঃ- ২২৯।

অধ্যায়-৬ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দি

৬. কিশোর বন্দি

(Juvenile Prisoners)

৬.১ সামাজিক অবস্থা ও কিশোর অপরাধ

আজকের তরুণ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; তারাই দেশ ও জাতির কর্ণধার। তরুণ-তরুণীদের সঠিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাঝেই দেশের কল্যাণ নিহিত। আর তাদের বিপথগামিতার অর্থই দেশের জন্য অনিবার্য বিপদ। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই গতানুগতিক কাজের দিকে ঝোঁকে বেশি। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে, সে নিজের অজ্ঞাতসারে পথ হারিয়েছে অথবা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঐ পথ ধরছে অথবা স্বেচ্ছায় ঐ ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের পশ্চাতে ঐ কারণসমূহ দায়ী। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। বেকারত্ব, রাজনৈতিক কু-প্রভাব, সন্ত্রাস, অপসংস্কৃতি ও আর্থিক দৈন্যতা ইত্যাদি তরুণ সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুঁকে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধ জগতের দিকে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কিশোর অপরাধের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতা অতি বেগবানের কারণে মহাবিপদের আশংকায় জাতি আজ শঙ্কিত।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ১৬ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে শিশু এবং ২১ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে কিশোর হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন বাক্তিকে সাবালক হিসেবে ধরা হয় না। তবে উভয় শ্রেণীকেই আমরা এখানে তরুণ হিসেবে আখ্যায়িত করব।

আমাদের সমাজের নানা অবক্ষয়ের কারণে আমরা আমাদের তরুণ সমাজের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের ন্যূনতম অধিকার পূরণ করতে পারছি না। আমাদের দেশে নৈতিক আদর্শের বড় অভাব। বর্তমানে তরুণ সমাজ বড়দের কাছ থেকে ভাল কিছু শিখতে পারছে না। বড়রা যা করছে তরুণেরা তাদের কাছ থেকে তাই শিখছে। তারা অহরহ দেখতে পাচ্ছে রাজনীতির নামে মিথ্যাচার, সমাজ সেবার নামে স্বেচ্ছাচার, আদর্শের নামে প্রতারণা, জীবনের উন্নতির নামে অবৈধ টাকা ও প্রতিপত্তি। এসব দেখে দেখে তরুণ সমাজ আজ অশান্ত। যে তরুণ তার পিতাকে কাজে ফাঁকি দিতে দেখে; অবৈধভাবে অর্থ রোজগার করতে দেখে; আদর্শের নামে মানুষের সাথে প্রতারণা করতে দেখে; সে কিভাবে ভাল জিনিস শিখবে ? সেই তরুণের কাছে আমরা কি নৈতিকতা আশা করতে পারি ? মূলতঃ সমাজের সকল স্তরে মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞদের মতে সামাজিক অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক বিশৃংখলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, পারিবারিক হতাশা, ডিটেকটিভ বই, হরর ফিল্ম, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন আজগুবি সিরিজের প্রভাব, প্রলোভন, অভিভাবকদের সঠিক ট্রিটমেন্টের অভাব ইত্যাদি কারণে আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে ''বিপথগামিতা'' ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে।

৬.২ আইনগত অধিকার ও প্রয়োগ

বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনের দায়ে মামলায় জড়িত হয়ে বা অন্যবিধ কারণে তরুণেরা বন্দি হয়ে কারাগারে আগমন করে থাকে। ১৯৭৪ সনের শিশু আইনের ৫০ ধারা অনুসারে আটককারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন কিশোর সম্পর্কে প্রবেশন অফিসারকে বিস্তারিত জানানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারেরা নিয়মমত কিশোর অপরাধীর অপরাধ ও গ্রেফতার সম্পর্কে সমাজ কল্যাণ অফিসার বা প্রবেশন অফিসারকে জানান না। এ সুযোগে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তারা গরজ করে আটক কিশোরদের কোন খোঁজ খবর নেন না।

১৯৭৪ সনের শিশু আইন অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত বা আটককৃত শিশু-কিশোরদের কারাগারে আটক না রেখে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। কিশোর বন্দি কারাগারে আগমন করলে পারত:পক্ষে তাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দেখানো হয় না। অর্থাৎ ১৮ বছর বা তার উর্দ্ধে খাতা কলমে বয়স দেখানো হয়। কারণ কিশোরটিকে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ঝামেলা এড়ানোর জন্যই মূলতঃ এসব করা হয়। ৭৪ সনের আইন অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের আলাদা আদালতে বিচার হওয়ার কথা। বিংশ শতাব্দীর আগে বয়স্ক অপরাধী ও কিশোর

অপরাধীকে একই দৃষ্টিতে দেখা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে অপরাধ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলশ্রুতিতে ঐ ধারণা পাল্টে যায় এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক অপরিপক্কতা, অধিকার ও বিকাশের জন্য আলাদা আদালতে বিচার-কার্য পরিচালনা পদ্ধতি গৃহীত হয়। ঐ সময়ই বিশ্বে প্রথম কিশোর আদালত গঠিত হয়। এর পর থেকে অপরাধ জগতে কিশোর শব্দটি অন্যান্য অপরাধ থেকে পৃথক পরিচিতি লাভ করে।[১৮১] শিশু-কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের বিচার যৌথভাবে করার বিধান আমাদের দেশে নেই। তবুও তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের সাথে রাখা হচ্ছে। এমনকি আদালতে হাজির করার জন্য কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের একই সংগে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়।

কিশোর অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে, তাদেরকে সংশোধন করে সুশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এ পদ্ধতি সফল করার জন্য কিশোর অপরাধীদেরকে পরিপক্ক ও পেশাদার অপরাধীদের সংস্পর্শে আসতে না দেয়া। কিশোর অপরাধীরা যাতে স্কীল্ড অপরাধীদের কাছ থেকে দূরে থাকে এবং নিজেরা পরিপক্ক অপরাধীতে পরিণত না হয়, সে জন্যই কিশোর আইন জারী করা হয়েছে। এ আইনে কিশোর অপরাধীদের কারাগারে বয়স্ক বন্দিদের সংগে না রেখে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিশোর অপরাধীদের বেলায় ঐ আইনের বিধান কোন স্তরেই অনুসরণ করা হচ্ছে না। ফলে প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন ও ফলাফল শূন্যের কোঠায়।

"অবস্থা শুনে মনে হতে পারে কিশোর অপরাধ দমন, প্রতিরোধ ও সংশোধনের ক্ষেত্রে যে চরম অবস্থা বিরাজ করছে, তা শুধু পাকিস্তান আমল নয়, বৃটিশ আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যার পরিণতি গুরুতর সামাজিক সংকট ডেকে আনতে পারে।"[১৮২]

ইউনিসেফের নীতি অনুযায়ী সকল শিশু-কিশোর তাদের অধিকার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আমাদের দেশের কারাব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের ন্যূনতম অধিকার পূরণ করতে পারছে না। কিশোর বন্দিদের কিশোর আদালতে বিচার এবং তাদের সংশোধনের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে একটি ও যশোর জেলার পুলেরহাটে একটি মোট ২টি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির উল্লেখযোগ্য তৎপরতা না থাকায় কিশোর-কিশোরীরা বিষাক্ত পরিবেশে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।[১৮৩] সাবেক বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন "দণ্ডিত কিশোরদের ব্যাপারে সংশোধন ও পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম।"[১৮৪] কতক মহিলা বন্দিদের সাথে থাকা তাদের অপরিণত সন্তানেরা অস্বাভাবিক পরিবেশে কারাগারে বেড়ে উঠে। বন্দি মায়েদের সাথে বসবাসরত শিশুদের লেখা-পড়ার ন্যূনতম শিশু অধিকার বিষয়ে কারা-কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। অনেক শিশুর জন্ম হয় কারাগারেই। জন্মের পর তারা জেলখানার চার দেয়াল ছাড়া বাইরের পৃথিবী দেখার সুযোগ পায় না। তাদের মায়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণে তাদেরও জেলজীবন নির্ধারিত হয়ে যায়।

৬.৩ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির

আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সময় বিষয়টি সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় না। ফলে অনেক নিরপরাধ তরুণকে বিনা দোষে দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়। বিনাদোষে দীর্ঘদিন জেলে থেকেছে এবং তাদের মুক্তির বিষয় নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এমন মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণের বিবরণ ১৯ নং সারণীতে নিচে উল্লেখ করা হল। সুপ্রিমকোর্ট নিজে উদ্যোগী না হলে তাদের মুক্তি কবে হত কে জানে। নিরপরাধ ব্যক্তির জেল খাটার কোন ক্ষতিপূরণ হয়না। কে ফিরিয়ে দিবে তাদের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ?

[১৮১] বি,এল, দাস, অপরাধ বিজ্ঞান (১ম খণ্ড), ১৯৯৮, পৃঃ- ১৭৪।
[১৮২] ২২.১২.৯৬ তারিখের " দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।
[১৮৩] ১৪.৭.৯০ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।
[১৮৪] ১১.৩.৯০ তারিখের " দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

১৯ নং সারণী

বিনাবিচারে জেলে থেকেছে এমন ৬ জন শিশুর বিবরণী

নাম	কারাগারে আগমনের সময় বয়স	কারাগারে আগমনের সন	কারাগার হতে মুক্তি লাভের সন	বিনা বিচারে আটক থাকার সময়কাল	উৎস
নজরুল ইসলাম	১২ বছর	১৯৮০	১৯৯২	১২ বছর	*৩১.১২.৯২ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা*
আতিকুর রহমান	১২ বছর	১৯৮৩	১৯৯২	১০ বছর	*১১.১২.৯২ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা*
বেলাল উদ্দিন	৯ বছর	১৯৯৫	১৯৯৫	৩ মাস	*০৭.০৬.৯৫ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা*
মজিবর রহমান	৮ বছর	১৯৯৫	১৯৯৫	৩ মাস	*০৭.০৬.৯৫ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা*
রফিকুল ইসলাম	৮ বছর	১৯৯৫	১৯৯৫	৩ মাস	*০৭.০৬.৯৫ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকা*
শাহআলম ওরফে হানিফ	১২ বছর	১৯৯৫	২০০০	৫ বছর	*২৮.০২.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা*

সম্প্রতি নীলফামারীতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, ছিনতাই ও চুরির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় চার্জশীটভুক্ত আসামী ৪ বছরের শিশু লেবু মিঞা বাবার কোলে জামিন নিতে গিয়েছিল।[১৮৫] এছাড়াও অন্য একটি চুরির মামলায় ৮ বছরের শিশু মোরসালিনকে বিনা অপরাধে চার্জশীটভুক্ত আসামী করা হয়েছিল।[১৮৬] গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার গাবগাছি গ্রামে পুকুরের পাহারাদারকে মারপিট করে ছয় হাজার টাকার মাছ চুরির দায়ে ১২ জন আসামীর মধ্যে ৬নং আসামী হিসেবে ৩ বছর বয়সী শিশু মাহাবুবকে অন্তর্ভুক্ত করে চার্জশীট দেয়া হয়।[১৮৭] বোমাসহ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চিংড়ি ঘেরে হামলা করার দায়ে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানায় দুগ্ধপোষ্য ৬টি শিশুকে আসামী করে আদালতে হাজির করা হয়। চিংড়ি ঘের লুটের মামলায় যে সব শিশুদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল তারা সকলেই ২ হতে ১১ বছর বয়সী শিশু। আবার কক্সবাজারে বনভূমি দখলের দায়ে ৫ বছরের শিশু ফয়সালকে অস্ত্র মামলায় আসামী করা হয়।[১৮৮] ঠিক এমনিভাবে হয়ত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কতশত শিশু-কিশোর অহেতুক কুচক্র মামলার আসামী হয়ে নিদারুণ ক্লেশে জীবন কাটাচ্ছে। যে দেশে, যে সমাজে এত অরাজগতা ও অমানবিক আচরণ, সে দেশের মানুষের জীবন আর যাপন যোগ্য থাকতে পারে না।

যে সব শিশুদের ঐসব মামলায় আসামী করা হয়েছে, তাদের পক্ষে কথিত অপরাধ সংঘটিত করা আদৌ সম্ভব কি না? মামলা নেয়ার সময় বা চার্জশীট দেয়ার সময় পুলিশ একবারও এ মানবিক বিষয়টি ভেবে দেখার অবকাশ পেল না। এরকম আরো হাজারও ন্যক্কারজনক ঘটনায় এদেশের মানুষ পুলিশকে বন্ধু না ভেবে কখনও কখনও প্রতিপক্ষ মনে করে। সরকারীভাবে বলা হয়, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। জনগণ পুলিশকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। তাই জনগণের কাছে পুলিশের "ইমেজ" এখন শূন্যের কোঠায়।[১৮৯]

[১৮৫] ১৬.০১.২০০১ তারিখের "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকা।
[১৮৬] ২৩.০১.২০০১ তারিখের "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকা।
[১৮৭] ০১.০৩.২০০১ তারিখের "দৈনিক মানবজমিন" পত্রিকা।
[১৮৮] ৩১.০১.২০০১ তারিখের "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকা।
[১৮৯] ০৩.০২.২০০১ তারিখের "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকা।

৬.৪ কারাব্যবস্থা ও কিশোর বন্দি

আটককৃত তরুণেরাও প্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের সংগে কারাগারে একইভাবে বন্দিত্ব জীবন যাপন করে। সকলে একত্রে থাকার কারণে একজন তরুণ অপরাধী পরিপক্ক অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে তার মন-মানসিকতা ও আচরণ পরিপূর্ণ অপরাধীর মত হয়ে যায়। ফলে তরুণ বন্দিদের কারাগারে আটক রেখে তাদের পেশাদার অপরাধী বানানোর প্রক্রিয়া চলছে আমাদের দেশে।

তরুণেরা সাজা প্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আগমন করলেই তাকে কর্মমুখী শিক্ষা বা উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ না করে নিম্নলিখিত কাজে নিয়োগ করা হয়।

১। ফুল গাছে পানি দেয়া।
২। জুতা পালিশ করা।
৩। অফিসারদের গরুর ঘাস কাটা।
৪। ব্রতচারী[১৯০]
৫। ভৃত্য।

এমনিতেই কারাগারের বাইরের তরুণ সমাজ অশান্ত। ফলে অনেক তরুণ বিপথগামী হয়ে অপকর্মের কারণে বন্দি হয়ে কারাগারে আগমন করে। অপরিপক্ক মন-মানসিকতার সুযোগে উপরিউক্ত কাজসমূহে নিযুক্ত করার ফলে তাদের মানসিক অবনতি ঘটে বা মুক্ত চিন্তাশক্তি বাধাগ্রস্ত হয়। কোন তরুণ ঐসব কাজে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকলে তার কাছে আমরা ভাল কিছু আশা করতে পারিনা। কারণ ঐ কাজগুলো তরুণদের জন্য কল্যাণের ও গতানুগতিক নয়। এতে করে অনেক তরুণ সংশোধনের সুযোগ না পাওয়ায় (Scope of correctional Treatment) হতাশায় ভুগতে থাকে। হতাশা ও বন্দি জীবনের মানসিক ভার নিরসনের জন্য এরা সিনিয়র অপরাধীদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে তারা ঘাঘু অপরাধীদের কাছ থেকে অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও অন্ধি-সন্ধি রপ্ত করে এবং পরিপক্ক অপরাধীর মনোভাব নিয়ে বাইরে এসে বীর দর্পে অপকর্মে লিপ্ত হয়। আবার অনেক তরুণ ঐসব কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে তারা গতানুগতিক কাজের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। তাদের মনমানসিকতা আজ্ঞাবহ দাসের মত হয়ে যায়। এরা বাইরে এসে সমাজে খাপ-খাওয়াতে পারে না। সমাজ এদের উচ্ছিষ্ট মনে করে। এর কারণে তাদের আয়-রোজগারের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে এরা সমাজে তোষামোদকারী, টাউট, দালাল, প্রবঞ্চক হিসেবে আখ্যায়িত হয়।

বাংলাদেশের কারাগারে আটক তরুণদের উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করা হয় না। তরুণদের উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করলে, তারা কাজ করে আনন্দ পাবে এবং সে সাথে স্বাভাবিকভাবেই কাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং দায়িত্ব জ্ঞান বাড়বে। ফলশ্রুতিতে তারা এই প্রতিযোগিতার যুগে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়াও কিশোরদের নৈতিক স্খলন থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য নৈতিক শিক্ষা দানের সব ধরনের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শিশু, কিশোর ও যুবকেরা কারাগারে এসে ঘাঘু ও মারাত্মক অপরাধীদের সংস্পর্শে থাকায় দিনে দিনে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে। সার্বক্ষণিক মিলামেশা এবং সখ্যতার সুযোগে স্বাভাবিকভাবেই পরিপক্ক অপরাধীদের আচরণ তরুণদের আকৃষ্ট করে। এর কারণে তরুণদের মাঝে বড়দের মত অপরাধ সংঘটনের স্পৃহা তীব্রতর হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে তরুণেরা পরিপক্ক অপরাধীর মানসিকতা নিয়ে বাইরে এসে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে পুনরায় জড়িয়ে পড়ে।

৬.৫ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিশোর বন্দি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে যে ধরনের ব্যবস্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

---

[১৯০] কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান করাকে কারা পরিভাষায় ব্রতচারী বলে।

যুক্তরাজ্য[১৯১]

পূর্বের ধ্যান-ধারণা পরিহার করে আধুনিক সভ্যতা ও বর্তমান বৃটেনের সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে নতুন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতি রেখে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের বিষয়ে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যুক্তরাজ্যে ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সী কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য ব্রোস্টাল ইন্সটিটিউটে রাখা হয়। ব্রোস্টাল ইন্সটিটিউটসমূহ হাসপাতাল মডেলে পরিচালনা করা হচ্ছে। বাসিন্দাদের সংশোধনের জন্য ব্রোস্টাল জেলসমূহে মনোবিশ্লেষক পদ্ধতি (Psychoanalytic theory) অবলম্বন করা হচ্ছে। কিশোরদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের বিষয় বিবেচনায় রেখে বাইরের মত তাদেরকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেয়া হয়। তারা যেন বাইরে এসে ভুল পথে না চলে বা খারাপ কাজে লিপ্ত না হয়; এ সব চিন্তা মাথায় রেখে যুক্তরাজ্যের কারা বিভাগ নৈতিক শিক্ষাসহ অন্যান্য গঠনমূলক শিক্ষায় কিশোরদের শিক্ষিত করে তোলে। ২১ বছর বা তার কম বয়সী কিশোরদের বিচারে সাজা হলে তাকে কারাগারে না রেখে প্রবেশন অফিসারের তদারকির অধীনে তাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তার গতিবিধি ও চলাফেরার উপর লক্ষ্য রেখে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

ফ্রান্স [১৯২]

নিম্নলিখিত বয়স অনুসারে কিশোর অপরাধীদের সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রেখে তাদের সংশোধনের নিমিত্তে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

১। চৌদ্দ বছর হতে ষোল বছরের নিম্ন বয়সের কিশোর।
২। ষোল বছর হতে আঠার বছরের নিম্ন বয়সের কিশোর।
৩। আঠার বছর হতে পঁচিশ বছরের নিম্ন বয়সের কিশোর।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র [১৯৩]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অপরাধীর বয়স ১৮ বছর বা তার নীচে তারা কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। আলাদা প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার কিশোর আদালতে নিষ্পত্তি করা হয়। কিশোরদের কর্ম-সময়ে (working hour) কর্মমুখী কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং রাতের বেলায় নিয়মিত ছাত্রের মত তাদের পড়া-লেখা করতে হয়। এছাড়াও তারা অবসর সময়ে লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন বই-পত্র পড়ার সুযোগ পায়। এভাবেই তাদের আইন মান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

শ্রীলংকা [১৯৪]

কিশোর অপরাধীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের বিভিন্ন কর্মমুখী কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শ্রীলংকার কারাগারে কিশোর বন্দি আগমন করলে ১ম একমাস তাকে পরীক্ষাধীনে (Observation) রাখা হয়। এরপর তার মন মানসিকতা ও চাল-চলন বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তাকে উপযুক্ত কর্মমুখী কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ট্রেনিং স্কুলে অবস্থান ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে কিশোর অপরাধীর আচরণ কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রুটিমুক্ত ও সন্তোষজনক মনে হলে তার মুক্তির এক বছর পূর্বেই তাকে শর্তাধীনে মুক্তি দেয়া হয়। শ্রীলংকার কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য ট্রেনিং স্কুলগুলো মুক্ত কারাগার (Open type) মডেলে স্থাপিত।

থাইল্যান্ড [১৯৫]

কিশোর বন্দিদের আলাদা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। থাইল্যান্ডের কোন কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার বেশি বন্দি রাখা হয় না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখে। কিশোর বন্দিদের সংশোধন ও আইন মান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে সমাজেও পুনর্বাসিত করার জন্য তাদের Observation and

---

[১৯১]। বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১১৮।
[১৯২].বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১১৬।
[১৯৩].বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১১৯।
[১৯৪]. বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১৩২।
[১৯৫]. বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১৩৫।

protection কেন্দ্রে রেখে বিভিন্ন কর্মমুখী কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়। এতে করে তারা বাইরে এসে সহজেই সমাজে খাপ খাওয়াতে পারে এবং রোজগারের পথ করে নিতে তাদের তেমন বেগ পেতে হয় না।

সিঙ্গাপুর [১৯৬]

সিঙ্গাপুরে কিশোর বন্দি ও জেল স্টাফের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। কিশোর অপরাধীদের শর্তাধীনে মুক্তি দেয়ার পর কমপক্ষে এক বছর তাকে তদারকির অধীনে রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে সে কোন অপরাধ করলে অবশিষ্ট সাজা তাকে ভোগ করতে হয়। কিশোর বন্দিদের দ্বারা রপ্তানীযোগ্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সন্নিবেশিত (Assembling) করা হয়। এসব কারখানায় কিশোরদের ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োগ করা হয় না। উৎপাদিত পণ্যের মান কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে।

জাপান [১৯৭]

জাপানে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ ক্যাটাগরির Juvenile Training school আছে।

1. Medical treatment
2. Vocational training
3. Academic training
4. Remedial education
5. Guidance

কারাগারে আগত বন্দিরা শ্রেণী বিন্যাস কেন্দ্র থেকে কিশোর হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর তাদের Juvenile training school-এ পাঠানো হয়। জাপানে উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করায় কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে বর্তমানে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে কিশোর অপরাধের সংখ্যা এখন অনেক কম।

ভারত[১৯৮]

কিশোর বন্দিদের সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ দেয়াল দিয়ে ঘেরা ওয়ার্ডে রাখা হয়। অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের সাথে তাদের সংশ্রবের কোন সুযোগ নেই। কিশোরদের চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নির্বাহের জন্য ''হলরুম'' এর ব্যবস্থা আছে। কিশোরদের অবাধে লেখা-পড়ার জন্য পর্যাপ্ত বই-পত্রের যোগান রয়েছে। ভারতে ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সীদের কিশোর এবং এর নিম্ন বয়সীদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত কিশোরদের পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। শিশুদের জন্য রয়েছে সমাজ কল্যাণ বিভাগের ''চাইল্ড হোম''।

৬.৬ কিশোরদের সংশোধনে কারাগারের বিকল্প

বাংলাদেশের কারাগার অপরাধী বানানোর কারখানা। সব অপরাধের মেরুকরণ হয় কারাগারে। এখানে কিশোর অপরাধীদের না পাঠিয়ে কারাগারের বিকল্প হিসেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

A. Probation.
B. Conditional Release.
C. Semi custodial Penalties.
D. Suspended sentence.
E. Community service order.
F. Binding over.

---

[১৯৬]. বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১৪০।
[১৯৭]. বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১৫০।
[১৯৮]. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, অতিরিক্ত কারা মহা-পরিদর্শক, ভারতের ইয়ারাভাদা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শনের বিবরণী, পৃঃ -৩।

সামাজিক প্রতিরোধসহ উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করলে বাংলাদেশের অশান্ত তরুণ সমাজে শান্তির বাতাস বইতে পারে। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের তরুণেরা সুশীল নাগরিক হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৬.৭ কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের পথ

বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কিশোর ও যুবক অপরাধীদের সংশোধন করে আইন মান্যকারী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের। কাজেই চলমান বিশ্ব ও আধুনিক সভ্যতার সাথে সংগতি রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সরকারী নীতিমালা ও সকলের আন্তরিক সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

৬.৮ সারকথা

তরুণদের আচরণ ও চরিত্র সংশোধন না হয়ে কারাগার থেকে দক্ষ ও পরিপক্ক অপরাধীর মন-মানসিকতা নিয়ে তারা বাইরে আসুক, এটা কোন সভ্য জাতির কাম্য নয়। আমাদের সমাজ বা দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য তরুণদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি সুদৃষ্টি দিতে হবে। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং সুনিশ্চিত পরিকল্পনার দ্বারা বিপথগামী তরুণদের সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করতে পারি; তাহলেই বাংলাদেশের অশান্ত তরুণ সমাজে স্বস্তি ফিরে আসবে।

অধ্যায়-৭ঃ বন্দিদের মানবিক অধিকার

৭.১ বন্দিদের দেখা-সাক্ষাৎ

৭.২ বন্দি অধিকার

৭.১ বন্দিদের দেখা-সাক্ষাৎ

(7.1 Visiting Facility of Prisoners)

৭.১.১ বিধিগতভাবে সাক্ষাতের নিয়ম

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে আটক সাধারণ বন্দিদের নিম্নলিখিত নিয়মে দেখা করানোর বিধান প্রচলিত আছে ।

ক. তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বা সাধারণ কয়েদী ঃ- মাসে একবার ।

খ. দ্বিতীয় শ্রেণীর হাজতী বা সাধারণ হাজতী ঃ- প্রতি পনের দিনে এক বার।

গ. ডিটেন্যু বন্দিঃ- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রসাশক বা সরকারের অনুমতিক্রমে পুলিশের বিশেষ শাখার উপস্থিতিতে ।

ঘ. নিরাপদ হেফাজতী বা Victim ঃ- সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আদালত বা জেলা প্রশাসক তাঁদের এখতিয়ার বলে হাজতী বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখা করার অনুমতি দিয়ে থাকেন ।

উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে সাক্ষাতের জন্য বন্দির আত্মীয়-স্বজনকে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত আবেদন করতে হয় । লিখিত দরখাস্ত জমা দেয়ার পর অপেক্ষা করতে হয় । কয়েক ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত বন্দির সাথে দেখা করার জন্য ডাকা হয়। দেখার ঘরে একযোগে অসংখ্য মানুষের ভিড় ও হাঁক-ডাক চলে। ফলে বন্দির সাথে গল্পগুজব তো দরের কথা; কোন কথাবার্তা বোঝার উপায় থাকে না। এর মাঝেই কয়েক মিনিট পরই বলা হয় সময় শেষ; আর দেখা হবে না-বলে বন্দিকে নিয়ে কারাভ্যন্তে চলে যায়। আবার দেখা শেষে বন্দিকে বিড়ি, সিগারেট, মুড়ি, চিড়া, গুড় ইত্যাদি জিনিস পত্র প্রদানের সময় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ঐগুলো ফেরৎ দেয়া হয়। তবে টাকা দিয়ে দেখা করলে, টাকার পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। টাকা খরচ করলে সংগে সংগে দেখা করা এবং জিনিস পত্র প্রদানেও কোন বাধা আসে না। কারাগারের আঞ্চলিক অবস্থান ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বিবেচনায় একেক জেলে একেক রকম টাকা নেয়া হয়।

৭.১.২ সরেজমিনে ৯টি কারাগারের বাস্তব চিত্র

সম্প্রতি বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের বিষয়ে বাংলাদেশের ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে সরেজমিনে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

সাধারণ সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে ৪০ টাকা করে নেয়া হয়। আর অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে সাক্ষাতের জন্য অবস্থা ভেদে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা আদায় করা হয়। ঢাকা জেল গেটের দক্ষিণ পাশেই দেখার ঘর। যেকোন দিন দেখার ঘরের গেটের পাশে রাস্তায় দাঁড়ালেই চোখে পড়বে নির্লজ্জভাবে অসহায় মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করার চিত্র। এখানে গড়ে প্রতিদিন ৫৫০ জন সাধারণ বন্দির দেখা হয়। দেখার ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশ্রী গন্ধ, উঠতি বয়সের যুবকদের আড্ডা। এরা আগত যুবতী ও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে। এমনকি গায়ে হাত লাগাতেও বাকি রাখে না। ঢাকা জেলে টাকা ছাড়া কোন দেখা হয় না।

কেস-১২

দেখা করতে আসা এক বৃদ্ধার বর্ণনা

দেখা গেল এক বৃদ্ধা তার ছেলের সাথে দেখা করার জন্য খুব কষ্টে মানিকগঞ্জ থেকে এসেছে। সে ভিক্ষুক। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে তার শরীর। অবস্থা দেখে বাসেও তার ভাড়া নেয়নি বলে জানাল মহিলা। বৃদ্ধার কাছে অতি যত্নে আঁচলে বাঁধা আছে ৪২ টাকা। সেখান থেকে ২০ টাকা বের করে এক কারারক্ষীকে দিয়ে বৃদ্ধা কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো "বাবা আমার কাছে আর বাইশ টাকা আছে। আমি দুপুরে খাব আর বাড়ী যাওয়ার জন্য এ টাকা রেখেছি, দয়া করে আমার ছেলের সাথে দেখা করিয়ে দাও।" কে শোনে কার কথা। কারারক্ষী হুংকার দিয়ে উঠলো-এ টাকায় দেখা হবে না। বৃদ্ধার অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরও যখন কারারক্ষী রাজি হলো না; তখন বৃদ্ধা অগত্যা অবশিষ্ট কুড়ি টাকা দিয়ে দেখার জন্য নাম লেখালো।

উৎস ঃ সরেজমিনে অনুসন্ধান।

ঢাকা জেলের দেখার ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। হাঁক-ডাক, হৈচৈ-এর কারণে কোন কথা-বার্তা বোঝার উপায় নেই। তবুও স্বজনেরা তার কাঙ্ক্ষিত বন্দিকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এখানে মানবতার কোন ঠাঁই নেই। দেখার ঘরে বন্দিদের জিনিস পত্র দিতেও আলাদাভাবে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে জিনিসপত্র দেয়া হয় না। এখানে টাকা হলে সবই সম্ভব। যতবার ইচ্ছা দেখা করা যায়।

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা করে নিয়ে দেখা করানো হয়। এখানে অফিসে বসে দেখা করানো হয় না। গড়ে প্রতিদিন ২০০ জন বন্দির দেখা হয়। জিনিস-পত্র দিতেও টাকা লাগে। দেখার ঘর পরিচ্ছন্ন না হলেও নোংরা নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ছাড়া কোন দেখা হয় না। টাকা দিয়ে যে কোন দিন দেখা করা যায়।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায়ের বিনিময়ে দেখা করানো হয়। বেলা দু'টার পর অফিসের চেয়ার টেবিলে বসিয়ে বিত্তবানদের দেখা করানো হয়। পরিণামে আদায় করা হয় দু'শ থেকে এক হাজার টাকা। এখানে টাকা দিয়ে অনেক বিত্তবান বন্দি Conjugal Injoy করে থাকে বলে জানা যায়। গড়ে প্রতিদিন ২০০ সাধারণ বন্দির দেখা হয়। দেখার ঘর নোংরা, বিকট দুর্গন্ধযুক্ত। জিনিস-পত্র দিতে বন্দি প্রতি দশ টাকা দিতে হয়। টাকা দিয়ে যেকোন দিন কয়েক ঘন্টা ধরে দেখা করা যায়।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে নিয়ে সাধারণ বন্দিদের দেখা করানো হয়। তবে অবস্থাশালী ও বিত্তবানদের কথা আলাদা। তারা চাহিদা মাফিক টাকা খরচ করে প্রায় অফিসে বসে পরিবারের সবার সাথে দেখা করে থাকে। এখানে টাকা ছাড়া কোন দেখা হয় না। জিনিস-পত্র দিতেও অবস্থাভেদে টাকা দিতে হয়। টাকা দিয়ে যে কোন দিন যতক্ষণ ইচ্ছা দেখা করা যায়। এখানে গড়ে প্রতিদিন ১৯০ জন বন্দির দেখা হয়। দেখার ঘর নোংরা ও আলো বাতাসহীন এবং ভ্যাপসা দুর্গন্ধময় পরিবেশ।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার

বন্দিদের সাথে দেখা করার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা করে আদায় করা হয়। টাকা দিতে না পারলে তাকে দেখা করার কোন সুযোগ দেয়া হয় না। এখানে মাঝে মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় অফিসে দেখা করানো হয়। তবে টাকা না দিলে কোন দেখাই সম্ভব নয়। ময়মনসিংহ জেলে গড়ে প্রতিদিন ১৮০ জন বন্দির দেখা হয়। দেখার ঘরে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার কোন ছাপ লক্ষণীয় নয়। জিনিস-পত্র দিতে প্রতিজনে দশ টাকা করে দিতে হয়। এখানে অর্থের বিনিময়ে দিনে একাধিকবারও দেখা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সময়েরও কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা করে নিয়ে দেখা করানো হয়। টাকা ছাড়া দেখার কোন সুযোগ নেই। মাঝে মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় বিত্তশালীদের অফিসে দেখা করানো হয়। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বসার ঘর (Waiting Room)-কে ডি, আই, জি প্রিজনের অফিস বানানো হয়েছে। দর্শনার্থী পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের অসুবিধাই প্রকট। কারণ তাদের টয়লেটের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মহিলারাই বেশি ভোগান্তির শিকার। এখানে দেখার ঘরে আলোর ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ চলে গেলে ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ছেলেরা তখন মেয়েদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এছাড়াও এখানে পকেট মারের আনাগোনা বেশি। সুযোগ পেলেই পকেটের মানিব্যাগ উধাও হয়ে যায়। জিনিস পত্র দিতে গেলেই টাকা লাগে। তাছাড়া বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হয়। এখানে গড়ে প্রতিদিন ১৭০ জন বন্দির দেখা হয়।

কেস-১৩

স্বামীর সাথে দেখা করতে আসা এক মহিলার বর্ণনা

দেখার ঘরের (Interview Room) বাইরে এক মহিলার সাথে আলাপ করে জানা গেল যে, তার স্বামী মারামারি মামলায় জড়িত হয়ে সাতদিন যাবৎ জেলে আছে। সে দিনমজুরের কাজ করতো এবং সাত ও চার বছরের দুটি পুত্র সন্তানের জনক। ছোট ছেলেটিকে কোলে এবং বড় ছেলের হাত ধরেই মহিলা অঝর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, বাড়ীতে ৪ কেজি চাউল ছিল তার মধ্যে তিন কেজি ৩৬ টাকায় এবং তিন হালি মুরগীর ডিম ৩০ টাকায় বেচে মোট ৬৬ টাকা যোগাড় করেছিলাম। এর মধ্যে স্বামীর জন্য দু'প্যাকেট বিড়ি ছ'টাকা, হাফ কেজি চিড়া আট টাকা এবং এখানে আসতে বাস ও রিক্সা ভাড়া দশ টাকা; আর দেখা করার জন্য ত্রিশ টাকা দেয়ার পর আমার কাছে বার টাকা ছিল। আমার স্বামীকে বিড়ি, চিড়া দেয়ার সময় টাকা চাইলে আমি দু'টাকা বের করে দিলাম। দু'টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো জিনিস দিতে হলে দশ টাকা লাগবে, তাছাড়া কিছু দেয়া যাবে না। আমি আমার স্বামীর সামনেই তাদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করে জিনিসগুলো দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করে ধমক দিয়ে আমাকে বের করে দিচ্ছিল। আমি কোন উপায় না দেখে অগত্যা তাদের দাবীকৃত দশ টাকা দিয়ে জিনিসগুলো দিয়েছি। এখন আমার কাছে মাত্র দু'টাকা আছে। এ মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে আমি এখন কেমন করে বাড়ী যাব? মেয়েটির অবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল যে, ক্ষোভ, দুঃখ, আতংক ও হতাশায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ব্যথার প্রতিকারের জন্য কাউকে জানাতে পারছে না। এসব অসহনীয় জুলুমবাজদের প্রতি ঘৃণায় তার মন বিষিয়ে উঠেছে।

উৎস ঃ সরেজমিনে অনুসন্ধান।

এ ধরনের চিত্র বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই অহরহ ঘটছে। এসব ঘটনা কর্তৃপক্ষ সবাই জানে আবার না জানার অভিনয়ে পারদর্শী অভিনেতা সকলেই। প্রতিদিন টাকা দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী দেখা করা অসম্ভব নয়।

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা করে নিয়ে দেখা করানো হয়। টাকা ছাড়া দেখা করার কোন সুযোগ নেই। টাকা দিয়ে প্রতিদিন বহুবার সাক্ষাৎ করা যায়। এক্ষেত্রে সময়েরও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এখানের Waiting Room খুব নোংরা। দেখার ঘরের কথা তো বলাই যায় না; বিশ্রী গন্ধ ও আলো-বাতাসের অপ্রতুলতা। অর্থ ব্যতীত জিনিসপত্র প্রদানে বাধা। অন্যান্য কেন্দ্রীয় কারাগারের তুলনায় এখানে সহায়-সম্বলহীন দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশি। তবুও দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে করুণা আশা করা মূল্যহীন। এখানে গড়ে প্রতিদিন ১৩০ জন বন্দির দেখা হয় বলে জানা যায়।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার

বন্দিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দর্শনার্থীদের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা করে আদায় করা হয়। বেলা দু'টার পর কিছু কিছু বন্দির দেখা অফিসে করানো হয়, এর বিনিময়ে দু'শ থেকে পাঁচশ টাকা অবস্থাভেদে আদায় করা হয়। গড়ে প্রতিদিন ১৬০ জন বন্দির দেখা হয় বলে জানা যায়। টাকা দিয়ে প্রতিদিন দেখা করতে কোন বাধা নেই। টাকা ছাড়া কোন জিনিস দেয়া যায় না। দেখার ঘর অপরিস্কার। আলো-বাতাসের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার

এখানে সাধারণ বন্দিদের দেখার জন্য চল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করা হয়। ১৯৯৬ সালের কারা বিদ্রোহের আগে ত্রিশ টাকা করেই নেয়া হতো। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর থেকে বন্দিদের দেখার রেট এভাবে বাড়ানো হয়েছে। জিনিস-পত্র দিতেও বিশ টাকার নিচে পার পাওয়া যায় না। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ৯৬ সনের কারা বিদ্রোহের পর অফিসে দেখা করানোর ব্যবস্থাটি কর্তৃপক্ষ এখনো পরিহার করে চলেছে। যশোর জেলে গড়ে প্রতিদিন ১৮০ জন বন্দির দেখা হয়। এখানে দেখার ঘর পরিষ্কার নয় এবং আলো-বাতাসের অভাব। মেঘলা দিনে ভেতরে অন্ধকার হয়ে যায়। এখানে টাকার বিনিময়ে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ করা খুবই সহজ।

৭.১.৩ আদায়কৃত টাকার বাটোয়ারা ও সরকারী নির্দেশ

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারের দেখার ঘরের (Interview Room) পরিসর অত্যন্ত কম। বন্দিদের দেখার সময় দর্শনার্থীদের হাঁক-ডাক, কথা-বার্তা, কাঁন্নাকাটিতে দেখার ঘরের মধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। ফলে কেউ কারো কথা বুঝতে পারে না। এর উপর আবার উপচে পড়া ভিড়। মোদ্দা কথা দেখার ঘরগুলো শব্দ দূষণের আখড়া ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

ঐ ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে সরেজমিনে গিয়ে বন্দিদের দেখার জন্য আদায়কৃত টাকার ভাগ বাটোয়ারার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা গেছে। ঐ পদ্ধতি বা রেশিও ২০নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো -

২০ নং সারণী

আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ও বাটোয়ারা

কারাগারের নাম	একজন বন্দিকে দেখার জন্য আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার বাটোয়ারা			
		ডিউটি অফিসার	রিজার্ভ সর্বপ্রধান বা প্রধান কারারক্ষী	রিজার্ভে ডিউটিরত কারারক্ষীগণ	গড়ে প্রতিদিন আদায়কৃত মোট টাকার পরিমাণ
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার	৪০.০০	৩০.০০	-	১০.০০	২২০০০.০০
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৪০.০০	২০.০০	৭.০০	১৩.০০	৮০০০.০০
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৫০.০০	২৫.০০	১০.০০	১৫.০০	১০০০০.০০
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	৫০.০০	২৫.০০	১০.০০	১৫.০০	৯৫০০.০০
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৪০.০০	২০.০০	৭.০০	১৩.০০	৭২০০.০০
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৩০.০০	১৫.০০	৫.০০	১০.০০	৫১০০.০০
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	২৫.০০	১৫.০০	৫.০০	৫.০০	৩২৫০.০০
বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৩০.০০	১৫.০০	৫.০০	১০.০০	৪৮০০.০০
যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগার	৪০.০০	২০.০০	৫.০০	১৫.০০	৭২০০.০০

উপরে উল্লেখিত ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারকে মডেল হিসেবে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সকল কারাগারেই বন্দিদের সাক্ষাৎকার পদ্ধতির একই চিত্র। সরেজমিনে দর্শন, বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্যসমূহ পেশ করা হয়েছে। কারাগারসমূহে দর্শনার্থীদের নিকট থেকে টাকা আদায়ের বিষয়ে সরকারের গোচরীভূত হওয়ায় তা বন্ধ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২১.১১.৯২ তারিখে এক নির্দেশ জারী করে।[১৯৯] কিন্তু কাগুজে নির্দেশ কাগজেই থেকে গেছে। বাস্তবতায় কার্যকারিতা লাভ করেনি। বরং দিন দিন বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেনের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এর কারণে বন্দিরা মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। ১৯৮০ সনের কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্টে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।[২০০]

৭.১.৪ বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য ও দু'জন লেখকের বই থেকে

বন্দিদের দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য ও দু'জন ভুক্তোভোগী লেখকের লিখিত বইয়ের পাতা থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

দৈনিক ইত্তেফাক

সাক্ষাৎ প্রার্থীদের নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ আদায় করা হয়। জামিন প্রাপ্তদের নিকট হতেও টাকা নেয়া হয়। অন্যথায় নানা অজুহাতে আসামীকে মুক্তি দেয়া হয় না। [২০১]

দৈনিক জনকণ্ঠ

একজন কর্মকর্তার কক্ষে বন্দিদের বিনোদন ও সাক্ষাৎ সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম। ধনাঢ্য বন্দিদের ব্যাপক মালামাল সরবরাহ করা হয় অবৈধভাবে।[২০২]

দৈনিক সংবাদ

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাটি আইনতঃ যাই থাক, প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করে ঘুষের উপর।[২০৩]

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা জেলের সাক্ষাৎকার কক্ষ তো শব্দ দূষণের আখড়া। একেকটি রুম ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের, ১৯৮২ সালে তৈরী করা। সেখানে একেকটি রুমে ২০/২৫ জন পুরুষ-নারী-পুলিশ মিলে কে যে কি বলছে, বোঝা মুশকিল। এই কষ্টকর চিৎকারের মাধ্যমে কথা বলার জন্য প্রতি দিন আসে ৬০০-৮০০ দর্শনার্থী। আবেদন পত্র জমা নেয়া হয় প্রতিদিন সকাল ১০টা, বেলা ১২টা আর দুপুর দু'টায়। এর দু'ঘন্টা বাদে হাজির করা হয় বন্দিকে। তবে টাকা পয়সা থাকলে অন্য ব্যাপার। তখন দু'ঘন্টা কেন সঙ্গে সঙ্গে দেখা করা যায়। এমনকি সাক্ষাৎকার কক্ষ ছাড়াও কথা বলা যায় কোন কারাকর্মকর্তার রুমে বসে। [২০৪]

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য একইভাবে চলছে টাকার খেলা। যেমন টাকা দেবেন তেমন সুষ্ঠুভাবে বন্দির সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। তবে যে যত বড় অপরাধী বা নিরপরাধী হোক টাকা না হলে দেখা করা যায় না[২০৫]

দৈনিক মানবজমিন

বন্দিদের সাথে দেখা করতে আসা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে বিপুল পরিমাণ টাকা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বন্দিদের সাথে দেখা করতে আসা লোকজনদের কাছ থেকে জেল

---

[১৯৯] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১সি-৩/৯২-জেল-১/৫২২ তারিখ ২১.১১.৯২।
[২০০] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম -I, পৃঃ-১১।
[২০১] ১০/৪/৯৩ তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকা।
[২০২] ২০/৭/৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[২০৩] ২/১০/৯৭ তারিখের " দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।
[২০৪] ৯/১/৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[২০৫] ২৮/১২/৯৮ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

পুলিশ ডেপুটি জেলারের স্বাক্ষর সম্বলিত টোকেন দিয়ে জনপ্রতি নিচ্ছে ৩০ টাকা করে। পালাক্রমে সকল জেলপুলিশকে টাকা উঠানোর দায়িত্ব দেয়া হয়।[২০৬]

দৈনিক আজকের কাগজ

সাক্ষাৎকার কক্ষ পরিদর্শনে দেখা গেছে, সেখানে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। উৎকট দুর্গন্ধ, একযোগে অসংখ্য মানুষের হাঁক-ডাক। মহিলাদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই। তরুণ, যুবক, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তাদের উপর। পৃষ্ট ও দলিত মথিত হয়েও নিরুপায় নিম্নবিত্ত ও সাধারণ পরিবারের মহিলারা কাঙ্ক্ষিত বন্দিকে এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল থাকছে। এ বিব্রত ও চরম অসহনীয় পরিবেশের মধ্যদিয়েও সাক্ষাৎ করতে কারারক্ষী দালালকে বন্দির সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ৫০ থেকে ৫০০ টাকা দিতে হচ্ছে। সাক্ষাৎকার কক্ষ ছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থায় ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকার বিনিময়ে বন্দির আত্মীয়-স্বজনেরা সাক্ষাৎ করতে পারেন।[২০৭]

দৈনিক মানবজমিন

কারাগারে সবচেয়ে জমজমাট কারবার চলছে 'উইন্ডো কল'-এ। কারাবন্দিদের সাথে তার নিকটজনদের দেখা করার যে নিয়ম, তা থোড়াই কেয়ার করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কারাবন্দিদের হাতে ২/৩শ' টাকা ধরিয়ে দিলে সহজেই বন্দিরা তাদের নিকটজনদের সাথে দেখা করার জন্য "উইন্ডো কল" পেয়ে যান।[২০৮]

কারাগারের বিভীষিকাময় দিনগুলি [২০৯]

কারারক্ষী, প্রধান কারারক্ষী, সুবেদার অর্থের বিনিময়ে খবরাখবর/ চিঠিপত্র ও মালামাল আদান প্রদান করে থাকে (পৃঃ-৪৪)। পয়সার বিনিময়ে যে কোন জেল কর্মচারীকে দিয়ে যেকোন কাজ করানো যায় (পৃঃ-৫১)। পয়সা খরচ করতে পারলে জেল খানায় সবই সম্ভব (পৃঃ-৫৬)।

কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ [২১০]

টাকা পয়সা থাকলে অন্য ব্যাপার। তখন দু'ঘন্টা কেন সঙ্গে সঙ্গেও দেখা করা যায়। এমনকি সাক্ষাৎকার কক্ষ ছাড়াও কথা বলা যায় কোন কারাকর্মকর্তার রুমে বসে। আবার টাকা না দিলে দু'ঘন্টার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও আত্মীয়-স্বজনেরা বন্দি স্বজনের দেখা পান না (পৃঃ-৩)। জিনিসপত্র পৌঁছানোর জন্য জনপ্রতি নেয়া হয় ২০ থেকে ৩০ টাকা প্রকাশ্যে, প্রতিনিয়ত। জনৈক কারারক্ষীর ভাষায় "ইন্টারভিউ র মে আসামীগো লগে দেখা করার জন্য একেকজনের কাছ থেকে ৬০ টাকা নেয়া হয়। তার মধ্যে ৫০ টাকা নেয় জেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, আর ১০ টাকা কারারক্ষীরা। ন্যূনতম ২শ' লোক দেখা করে একদিনে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৈনিক আয় ১০ হাজার টাকা" (পৃঃ-৬)। মা-বোনদের নিয়ে আসার পরিবেশ নেই। মান ইজ্জতের ওপর হাত পড়ে। আলাদা কোন মহিলা কাউন্টার নেই (পৃঃ২৩)।

৭.১.৫ প্রশাসনের ভূমিকা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তর পাশের প্রাচীরের সাথেই কারা অধিদপ্তরের অবস্থান। এখান থেকেই কারাগারসমূহ পরিচালনার নির্দেশনা দেয়া হয়। কারা মহাপরিদর্শক (I.G. of Prisons) এখানেই অফিস করেন। তাঁদের নাকের ডগার উপর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং চলছে টাকার হুলিখেলা। তবুও অসহায় বন্দিদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই।

বন্দিদের সাথে দেখা করার কাগুজে নিয়ম কাগজেই আছে। নিয়ম অনুসারে একটি দেখাও আর করানো হয় না। ওপথে গেলেই বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানির শেষ থাকে না । তাই মানুষ ইচ্ছা করে ওপথ মাড়াতে চায়না। টাকা দিয়ে বন্দিদের সাথে দেখা করা ও টাকার বিনিময়ে তাদের জিনিসপত্র দেয়া বর্তমানে রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। চাহিদামত নির্ধারিত টাকা দিলে যেকোন দিন দেখা করা যায়। আর বন্দির সাথে গল্প করার অঢেল সময়ও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে বন্দিদের দেখা সাক্ষাতে যে পদ্ধতি (Interview system) তা আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির অন্তরায়। কারাগারসমূহে বন্দি চাপের কারণে অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড়ে অল্প পরিসরের দেখার ঘরে যে ভাবে কথা-বার্তা হয়, তাতে কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। ফলে বন্দিদের মনে তার নিকটজনের সাথে কথা বলা বা গল্প করার স্পৃহা নিবৃত না হয়ে আরো বেড়ে যায়। এ কারণে

[২০৬] ৩০/১/৯৯ তারিখের "দৈনিক মানবজমিন" পত্রিকা।

[২০৭] ১/২/৯৯ তারিখের "দৈনিক আজকের কাগজ" পত্রিকা।

[২০৮] ৪/৪/৯৯ তারিখের "দৈনিক মানবজমিন" পত্রিকা।

[২০৯] বি.বি. বিশ্বাস, কারাগারের বিভীষিকাময় দিনগুলি -পৃষ্ঠা: ৪৪/৫১/৫৬।

[২১০] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ - ২০০০-পৃষ্ঠা: ৩/৬/২৩।

তাদের অনেকেই মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। নিকটজনদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলতে না পারা ও সেখানকার বিশ্রী পরিবেশের কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা এই দেখার পদ্ধতিকেই অনেকাংশে দায়ী করে। আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির আওতায় বন্দি ও তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার। বন্দিদের দেখার ঘর (Interview Room)-কে সুষ্ঠু ও নিরিবিলি আলাপ-আলোচনার উপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। নিরাপত্তার ঝুঁকি না থাকলে বন্দিদের সহজ সংশ্রবে দেখা করানোর ব্যবস্থা করা যায়।

৭.১.৬ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে যে পদ্ধতি বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় এবং এ বিষয়ে বন্দিরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ-

ফ্রান্সে বন্দির সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে মানবিক বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আত্মীয়-স্বজনের কথা-বার্তা বলার সুযোগ আছে। Unbreakable Glass partition দেয়া ঘরে চেয়ার টেবিলে বসে কথা বলার ব্যবস্থা আছে।[২১১]

সৌদি আরবে সপ্তাহে একদিন বন্দির সাথে দেখা করা যায়। আত্মীয়-স্বজন এসে দেখা করতে চাইলেই ঐ বন্দিকে মাইক্রোফোনে ডাকা হয়। পাশাপাশি বসে আলাপ করার সুযোগ আছে। সাক্ষাৎকাল আধাঘন্টা।[২১২]

পশ্চিম জার্মানীতে দিনের যে কোন সময় আত্মীয়-স্বজনেরা বন্দির সাথে দেখা করতে পারে। বন্দির সাথে দেখা করার ব্যাপারে উদার ও সহজ পন্থা অবলম্বন করা হয়। [২১৩]

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিদের সাথে সপ্তাহে ১ দিন দেখা করা যায় এবং দেখা করার জন্য একঘন্টা সময় নির্ধারিত থাকলেও তিন-চার ঘন্টা দেখা করার সুযোগ দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় পেনিটেনশিয়ারীর বন্দিদের বছরে একবার কারাগারেই Conjugal visit করার সুযোগ দেয়া হয়। [২১৪]

সিঙ্গাপুরে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। দেখার ঘর অনেক বড় ও কথা-বার্তার কোন প্রতিধ্বনি হয় না সেসব ঘরে। দেখার ঘরে Unbreakable glass barrier থাকার কারণে দর্শনার্থীদের সাথে বন্দির ঘনিষ্ট সংশ্রব (Physical contact)ঘটে না। [২১৫]

পাশ্চাত্যে যদিও বন্দিদের চার দেয়ালের মধ্যেই আটকা থাকতে হয়, তবুও মানসিক পীড়ন ছাড়া আর কোন ব্যাপার নিয়ে ওদের তেমন ভাবতে হয় না। কোথাও কোথাও যৌন স্বাধীনতাও ভোগ করতে দেয়া হয় বন্দিদের। সুইডেন, হল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকায় বন্দিদের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের সুযোগও দেয়া হয়। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে মাঝে মাঝে বন্দিদের গোটা পরিবারের সাথে " উইকএন্ড" করার সুযোগ আছে। অবশ্য সেটা কারাগারের বাইরে নয়। কারা প্রাঙ্গণের ভেতরেই হয়। তারা একটা কারাভ্যানে বউ-ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাত কাটাতে পারে। তবে ব্রিটেনে এ জাতীয় সুযোগ নেই। তারা দেখা সাক্ষাতের সময় হয়ত পরস্পরকে স্পর্শ, চুম্বন অথবা একটু-আধটু ঘনিষ্ঠ আলিংগনের সুযোগ পেয়ে থাকে। তার বেশি নয়। কেউ কেউ যে আরও একটু বেশি এগিয়ে যায়, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। [২১৬]

কিছু কিছু উন্নত দেশে জেলের ভেতরে বন্দির ওয়ার্ড বা সেলে গিয়ে দর্শনার্থীদের দেখা করার ব্যবস্থা আছে। উন্নত দেশসমূহে বন্দিদের দেখার ঘরে খাবার, সিগারেট, ক্যান্ডি ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। দর্শনার্থী আত্মীয়-স্বজনেরা এসব কিনে বন্দিদের দেয়ার সুযোগ পায়। আবার কিছু কিছু দেশে বন্দিদের সাক্ষাতের সময় নজরদারির ব্যবস্থাসহ Glass barrier ঘরে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কথা বলার ব্যবস্থা আছে। [২১৭]

---

[২১১] Council of Europe, prison Information Bulletin, No-1, June/83, P-9.
[২১২] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II , পৃঃ- ১০৯/১১০।
[২১৩] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II , পৃঃ- ১১১।
[২১৪] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II , পৃঃ- ১২০।
[২১৫] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- II , পৃঃ- ১৪৩।
[২১৬] ২৫.৭.৯৭ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[২১৭] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- I , পৃঃ- ৭১।

৭.১.৭ সারকথা

বন্দিরা চার দেয়ালের মাঝে বড়ই অসহায়। তারাও আমাদের মত সমাজের মানুষ। এসব বিবেচনায় তাদের দেখা-সাক্ষাতের বিষয়ে আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে পারলেই কারাগারে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হবে।

৭.২ বন্দি অধিকার

(7.2 Inmates Rights)

৭.২.১ প্রাসঙ্গিক কথা

কারাগারে আটক মানুষ বাহিরের মুক্ত মানুষের মত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। অবস্থাটা ঠিক খাঁচায় পোরা পাখীর মত। খাঁচার পাখীকে আমরা যথেষ্ট সমাদর করি। খাওয়া, পরিচর্যা থেকে শুরু করে কোন ক্ষেত্রেই তিল পরিমাণ আন্তরিকতার অভাব থাকে না। তবুও বনের পাখী খাঁচায় বন্দি থাকতে চায় না। শুধু একটিই কারণ সে মুক্ত জীবনের প্রত্যাশী। কারাবন্দিরা সাধারণ নাগরিকের মত অধিকার ভোগের সুযোগ না পেলেও মানবতার মানদণ্ডে তারা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশের কারাগারে প্রচলিত আইনের আওতায় বন্দি অধিকার (Inmates Rights) সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।

"Good prison management for prison personal of Banglsdesh" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে বক্তারা বলেন, বিচার প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে কারাবন্দিদের দুর্ভোগ বাড়ছে এবং দরিদ্র কারাবন্দিরাই এক্ষেত্রে বেশির ভাগ নিগৃহীত। কারাগারে এদের সংখ্যাও বেশি। কারারক্ষী ও কারাকর্মকর্তাদের হাতেও এরাই বেশি প্রতিনিয়ত নিপীড়নের শিকার হন। কারা বন্দি মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন।[২১৮] ঐ কর্মশালার সমাপনী ভাষণে Penal Reform International (PRI) -এর সহসভাপতি অধ্যাপক রাণী সংকর দাস বলেন, কারাবন্দিদের সমস্যাগুলো বাহিরে থেকে জানা যায় না ; তাদের সমস্যা সমাজের অন্যদের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত।[২১৯] আদালতের আঙ্গিনায় নিরাপত্তার প্রশ্নে দেশের প্রতিটি দায়রা আদালতে পুলিশ মোতায়েনকরণ সম্পর্কে সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন-দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন।[২২০] মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশের কারাগারের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২১] এছাড়াও ঐ রিপোর্টে বিচার কাজের ধীরগতির ফলে বিচারের পূর্বে আটকাবস্থা এক বিরাট সমস্যা বলে জানানো হয়েছে।[২২২] কারাকর্তৃপক্ষ কয়েদীদের গোলাম হিসাবে ভাবে, এ চেতনায় তারা অভ্যস্ত।

৭.২.২ বন্দি অধিকার সম্পর্কে ভারতের জেল কমিটি

ভারতের জেল কমিটি (১৯৮০-৮৩) তাঁদের প্রতিবেদনে বন্দি অধিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেনঃ-[২২৩]

ক) বন্দিদের মানবিক মর্যাদা দিতে হবে।
খ) তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হবে।
গ) তারা আইনগত সকল সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ।
ঘ) বন্দিদের সকল প্রকার যোগাযোগের সুবিধা দিতে হবে।
ঙ) কারা অপরাধে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।
চ) তারা সঠিক ও মর্যাদাপূর্ণ কাজে নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী।
ছ) বন্দিদের সঠিক সময় ও তারিখে মুক্তি দিতে হবে।

৭.২.৩ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বন্দিরা যে সব অধিকার ভোগ করে

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিরা যে সব অধিকার ভোগ করে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।[২২৪]

---

[২১৮] ১১.৯.২০০০ তারিখের " দৈনিক মানবজমিন'' পত্রিকা।
[২১৯] ১৪.০৯.২০০০ তারিখের " দৈনিক মানবজমিন ''পত্রিকা।
[২২০] ০৪.১০.২০০০ তারিখের "দৈনিক প্রথম আলো'' পত্রিকা।
[২২১] ২৭.০২.২০০০ তারিখের ''দৈনিক প্রথম আলো'' পত্রিকা।
[২২২] ২৭.০২.২০০০ তারিখের "দৈনিক মানবজমিন'' পত্রিকা।
[223] Ahmad Siddique, Criminology, 4th Edition, p-175.
[২২৪] বাংলাদেশ কারা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম -II, পৃঃ-১০৮-১৫২।

পশ্চিম জার্মানী

বন্দিদের মানসিকভাবে হাল্কা হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। তারা নিয়মিতভাবে রেডিও শোনা ও টেলিভিশন দেখার সুযোগ পায়। শরীরচর্চার ব্যবস্থাসহ কমিউনিটি হলের ব্যবস্থা আছে। তাদের রাত দশটায় ঘরে তালা বন্ধ করা হয় এবং সকাল ছয় ঘটিকায় তালা খুলে দেয়া হয়। তারা তাদের প্রিয় গায়ক-গায়িকার বা নায়ক-নায়িকার ছবি ওয়ার্ড বা সেলের দেয়ালে টাংগিয়ে রাখতে পারে। তাদের শ্রমের মূল্য দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ও বন্দির মধ্যে খুব আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

যুগোশ্লাভিয়া

বন্দিরা বছরে ১৮ দিন পারিবারিক পরিবেশে ছুটি কাটিয়ে আসতে পারে। তাদের বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিনের পার্টিতে যোগদান কিংবা মৃত্যু সংবাদ বা অসুস্থতার সংবাদে তথায় উপস্থিত হতে পারে। তারা খেলার মাঠে নিয়মিতভাবে খেলা-ধুলা করার সুযোগ পায়। এছাড়াও রেডিও শোনা এবং টি,ভি-র সুন্দর ব্যবস্থা আছে। Indoor games এবং শরীর চর্চার জন্য জিমনেশিয়াম আছে সব কারাগারেই।

ফ্রান্স

বন্দিদের খেলার জন্য প্রশস্ত মাঠ আছে প্রায় প্রতিটি কারাগারেই। তারা জিমনেশিয়ামে Indoor games সহ শরীরচর্চার সুযোগ পায়। তাদের আবাসিক ঘরগুলো সবই সেল আকারের। তবে তা আমাদের দেশের মত অপ্রশস্ত নয়। সুন্দর পরিপাটি পরিবেশ। সরকারী খরচে দৈনিক খবরের কাগজ ও অন্যান্য ম্যাগাজিন নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র

বন্দিরা ইচ্ছামত নিজ ধর্মের উপাশনা করতে পারে। বই-পুস্তক, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকাসহ রেডিও টেলিভিশনের ব্যবস্থা আছে। সব ধরনের খেলা-ধুলার সুযোগ দেয়া হয়। বন্দিদের ওয়ার্ডে রাখা হয়। কারা অপরাধে হাতকড়া বা ডাণ্ডাবেড়ি লাগানো হয় না। রাষ্ট্রীয় পেনিটেনশিয়ারীতে আটক বন্দিদের বছরে একবার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার (Conjugal meeting) সুযোগ আছে। তাদের এ্যাডভোকেটের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয়া হয়। মুক্তির তিনমাস পূর্বে বন্দিদের Halfway house-এ পাঠানো হয়।

কানাডা

কারাভ্যন্তরে টেনিসসহ সব ধরনের খেলার ব্যবস্থা আছে। পেনিটেনশিয়ারীগুলোতে বছরে একদিন Family day উদযাপন করা হয়। ঐ দিনে সব বন্দি কারাগারের মধ্যেই পরিবারের সবার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। কারা লাইব্রেরীতে আইন বইসহ সবধরনের বইয়ের প্রচুর মজুদ রাখা হয়। বন্দিরা তাদের রুমে বসে বই পড়তে পারে।

স্কটল্যান্ড

বন্দিদের কোন অভিযোগ থাকলে তা লিখিত আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। এ ব্যাপারে কারাকর্তৃপক্ষ ঐ লিখিত চিঠির খাম খোলার অধিকার রাখে না। সব ধরনের খেলা-ধুলার ব্যবস্থা আছে। স্কটিশ কারাগারে মানবাধিকারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন আচরণ কারাকর্তৃপক্ষ বন্দিদের সাথে কখনোই করে না।

সুইডেন

সুইডেনে সর্বোচ্চ সাজা বা শাস্তির মেয়াদ ১০ থেকে ১২ বছর। যাবজ্জীবন শাস্তি (Capital Punishment) প্রদানের কোন নিয়ম নেই। বন্দিদের ভাল আচরণের জন্য মাসে ৪৮ ঘন্টা সাজা মওকুফ (Rimission) করা হয়। টিভি দেখা, রেডিও শোনা এবং বই, পত্রিকা এবং সাময়িকী পড়ার জন্য কমন রুমের ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পর্যাপ্ত বইয়ের মজুদ রাখা হয়।

হল্যান্ড

বন্দিরা চার সপ্তাহে দু'দিন বাড়ী যাওয়ার অনুমতি পায়। তবে এক কারাগারে মাসে পনের জন এ সুযোগ ভোগ করতে পারে। এই সুযোগে কোন বন্দি বাড়ী গিয়ে সময়মত ফেরৎ না আসলে তাকে

গ্রেফতার করে অধিক নিরাপত্তার কারাগারে (Close Prison) রাখা হয়। এখানে কারা আইন ভঙ্গের জন্য কোন বন্দিকে শাস্তি দেয়া হয় না। বন্দিদের চিঠি-পত্র লিখা ও পাঠানোর বিষয়ে কোন বিধি-নিষেধ নেই।

ভারত

ভারতে বিচারাধীন বন্দিদের হাজত বাসকালীন সময় সাজা বা দণ্ড হিসেবে গণনা করার বিধান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের (Code of Criminal Procedure) সংশ্লিষ্ট ধারায় ১৯৭৪ সনে পরিবর্তন ও সংযোজন আনা হয়েছে।

শ্রীলংকা

বন্দিদের ছয় মাসে সাতদিন বাড়ী যাওয়ার জন্য ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তবে সাধারণতঃ দু'মাসে একবার তারা বাড়ীতে পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়।

মালয়েশিয়া

বন্দিরা একসংগে সমবেত হয়ে জুম্মা নামাজ আদায়ের সুযোগ পায়। এছাড়াও বন্দিদের ২৪ ঘন্টায় ১৬ ঘন্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। তাদের উকিলের সাথে নিরিবিলি আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। মালয়েশিয়ার কারাগারে কোন বন্দির অভিযোগ থাকলে সরাসরি কোন পরিদর্শক বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর অধিকার সকল বন্দির আছে। বন্দিরা কাজের জন্য পারিতোষিক পায় এবং ইচ্ছামতো চিঠি-পত্র আদান প্রদান করতে পারে।

জাপান

জাপানের কারাগারসমূহে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা ও কারা আইন অমান্যকারীদের বিচার ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত কমিটি আছে। কারা আইন ভঙ্গের জন্য দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়। কারা অপরাধে আত্মপক্ষ সমর্থনসহ পর্যাপ্ত শুনানির সুযোগ দেয়া হয়। "খেলা-ধুলা ও বিনোদনের জন্য রেডিও, টি,ভি, ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।" [২২৫]

সৌদি আরব

বন্দিদের মানবিক মূল্যবোধের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বিবাহিত বন্দিরা মাসে এক বার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাত কাটানোর সুযোগ পায়। এ জন্য কারাগারে উপযুক্ত আবাসিক ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনীয় খেলা-ধুলা ও বিনোদনের জন্য রেডিও, টিভির ব্যবস্থা আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ধারণকৃত আযান মাইক্রোফোনযোগে প্রতিওয়ার্ডে একযোগে প্রচার করা হয়।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিলভুক্ত দেশসমূহে বন্দিদের মানবিক অধিকার ও সংশোধনের বিষয় বিবেচনা করে নিম্নলিখিত মূল নীতি অনুসরণ করা হয়।[২২৬]

I. Making the Condition of imprisonment more Human.
II. Encouraging the maintenance of contact with families.

এ ছাড়াও সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের জরুরী প্রয়োজনে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সরকারী খরচে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় (পৃঃ-৯)। কিছু কিছু উন্নত দেশে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বন্দিকে তার উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করা হয়।[২২৭]

---

[২২৫] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ -৩৫।

[226] Council of Europe, Prison Information Bulletin, No- 1, June, 1983.P-8/9

[২২৭] বাংলাদেশ কারাসংস্কার কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮০, ভলিউম- I, পৃঃ -৭১।

৭.২.৪ বন্দিদের মানবিক মূল্যবোধ

মূলতঃ জেল বেইজ্জতির জন্য কোন অংশে কম নয়। মানুষ তথায় হাত-পা থাকা সত্ত্বেও না থাকার মত হয়ে থাকে। জেল কর্তৃপক্ষের দয়ার উপরই তাদের জীবন ও সুখশান্তি।[২২৮]

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারের ভেতরে সুপার ও জেলারের ক্ষণস্থায়ী অফিস আছে। কারাপরিভাষায় এটা ''কেস টেবিল'' নামে পরিচিত। কারাগারে আগমনের পরের দিন সকালে বা অন্য কোন প্রশাসনিক কারণে বন্দিদের সেখানে হাজির হতে হয় নগ্ন পায়ে। সবাইকে লাইন করে বসতে হয়; মাটিতে পাছা না লাগিয়ে মাথা নিচু করে। কাউকে সেখানে দাঁড়াতে দেয়া হয় না। ঔপনিবেশিক কায়দায় আনুগত্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত এখনও প্রতিটি কারাগারে নিত্যদিনের ঘটনা। বন্দির প্রতি কর্তৃপক্ষের যে আচরণ, তা মধ্যযুগীয় দাস-মালিকদের আচরণের সাথে তুলনা করা যায়। জেলখানায় মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে কাউকে দেখা হয় না। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে মানুষের প্রতি মানুষের এ ধরনের আচরণ কাম্য নয়। বর্তমান যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এসব নিয়ম-নীতি আমল পরিবর্তন করা জরুরী হয়ে পড়ে।

কেস-১৪

<u>বিনা বিচারে ১৯ বছর</u>

১৯৮৩ সালের ৩১শে আগস্ট রায়েরবাজার পৌর মসজিদের সামনে বিল্লাল হোসেন নামক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। সেই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। আনোয়ার হোসেনের মামলা তদবিরের কেউ ছিল না। তার আপন বলতে ৫ বছরের বোন। এতিম বোনটি ভাইকে হারিয়ে অন্যের গলগ্রহ হয়। সে জানতে পারে না যে, তার ভাই কোথায়। সে বড় হয়ে তার ভাইয়ের সন্ধান করতে থাকে। একসময় শুনতে পায় যে, তার ভাই একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলে রয়েছে। এই দীর্ঘ সময় মামলাটি ঝুলে ছিল। একসময় মামলার নথিটি গায়েব হয়ে যায় । ফলে জেলের নিষ্ঠুর প্রহরে কাটতে থাকে আনোয়ারের দিন। চলতি বছরে বোনটি বড় হয়ে হারানো ভাইয়ের জামিনের আবেদন করে।
উৎস ঃ- ২৩/০৩/২০০১ তারিখের দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা।

মামলার বিষয়ে একজন বাদী বা বিবাদী তার উকিলের সাথে একান্তে আলোচনা করার অধিকার রাখে। কিন্তু আমাদের দেশের কারাগারে আটক কোন বন্দিকে তার এ্যাডভোকেটের সাথে নিরিবিলিতে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ দেয়া হয় না। ফলে বিভিন্ন সমস্যায় আইনগত পরামর্শ বা আলোচনার অভাবে অনেক বন্দি বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয় বা শাস্তি ভোগ করে। একারণে বন্দিদের মাঝে সব সময় হতাশা বিরাজমান। এ ছাড়া অসহায় ও সহায়সম্বলহীন বন্দিদের সরকারী খরচে মামলায় সহায়তাদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কয়েক মাস বেশ তোড়জোড়ও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এখন ওসব বিষয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একজন মানুষ তথা বন্দির অধিকার হিসেবে তার এ্যাডভোকেটের সাথে একান্তে নিরিবিলি আলাপ-আলোচনা করার অবাধ সুযোগ থাকা দরকার।

৭.২.৫ কারাভ্যন্তরে বিচার ও শাস্তি

কারাভ্যন্তরে কোন বন্দি কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে সেই অভিযোগের তদন্ত করা হয় না এবং তাকে শুনানির পর্যাপ্ত সুযোগও দেয়া হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, যে কর্মচারী অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি উক্ত অভিযোগের তদন্ত করে থাকেন। এটা ন্যায় বিচারের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও জেলের ভেতরে কারেন্সি হিসেবে ব্যবহৃত হয়-বিড়ি, সিগারেট, সাবান, লুঙ্গি ও টাকা। এসব জামাদার, সুবেদারকে ঘুষ দিয়ে বিচারের রায় বেচা কেনা হয়। উৎকোচের বিনিময়ে কারাবন্দিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মাফ করে দেয়া হয়।[২২৯] জেলখানায় দুর্বলের পক্ষে

---

[২২৮] মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মওলানা মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মদনী, পৃঃ-৩৩৪/৩৩৫।
[২২৯] ২০/৭/৯৬ তারিখের ''দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকা।

সুবিচার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।[২৩০] বেশির ভাগ কারাকর্মকর্তা আইন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের দূরদর্শিতা নেই বললেই চলে। এসব অপটু ও হামবড়াভাব সর্বস্ব কারাকর্মকর্তাদের কাছ থেকে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না।

কারাভ্যন্তরে অপরাধের শাস্তি হিসেবে বা নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বন্দিদের ডাণ্ডাবেড়ী (Bar-fetters, cross-bar fetters, link-fetters) বা হাতকড়া (Hand-Cuffs) লাগানো অথবা নির্জন কারাবাসে (Cellular confinement) প্রেরণ করা হয়। ডাণ্ডাবেড়ী ও হাতকড়া লাগানো সম্পর্কে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **১৯৭৮** সালে একটি মামলার রায়ে উল্লেখ করেন যে, যাত্রার সময় বা কোথাও গমনকালে বা প্রয়োজনে হাতকড়া লাগানো যাবে। কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ী লাগানোর প্রয়োজন হলে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।[২৩১] কিন্তু আমাদের দেশে কারাবন্দিদের তুচ্ছ ঘটনাতেও পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ডাণ্ডাবেড়ী লাগানোর মত অমানবিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে। এছাড়া সেসব দেশে নিরাপত্তার কারণ ছাড়া শাস্তি হিসেবে কোন বন্দিকেই হাতকড়া পরানো হয় না।

ক. ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো সেকেলে শাস্তি দান পদ্ধতি।
খ. এটা মানবিক অধিকার হরণের একটি দৃষ্টান্ত।
গ. ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো মানুষের সাথে পশুর মত আচরণের শামিল।

কারাবাস বন্দি জীবনের হতাশা ও দুশ্চিন্তাকে জটিল ও দীর্ঘায়িত করে। বন্দি মানুষটির নির্জন একাকিত্ব জীবনে দুশ্চিন্তা ও হতাশা ভিষণভাবে তার মাথার উপর চেপে বসার সুযোগ পায়। ফলে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন না হয়ে জটিলতর রূপ নিতে পারে। বর্তমানকালের অপরাধ বিজ্ঞানীরা ডাণ্ডাবেড়ী লাগানো ও নির্জন কারাবাস সংশোধন ও পুনর্বাসন পদ্ধতির অন্তরায় বলে মতামত দিয়েছেন। এছাড়াও নিরাপত্তার ঝুঁকি না থাকলে হাতকড়া লাগানো উচিত নয় বলে তারা মনে করেন। আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা ঐ সকল অমানবিক শাস্তিসমূহ পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা যতদিন মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে না শিখবো ততদিন আমাদের কল্যাণ বয়ে আসবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এসব অমানবিক সেকেলে পদ্ধতি বর্জন করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সুফল পাওয়া গেছে। তাহলে আমাদের দেশে ঐসব কালাকানুন বর্জন করতে অসুবিধা কোথায় ?

৭.২.৬ মুক্ত আলো-বাতাস, বিনোদন ও খেলাধুলা

স্বাস্থ্যসম্মত বসবাস ও নির্মল বায়ু চলাচলের জন্য আবাসস্থলে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু কারাগারে অত্যধিক বন্দিচাপ ও স্বল্প পরিসরের কারণে বন্দিদের আবাসস্থলে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকলেও, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ কারণেও বন্দিদের নিদ্রাহীনতা ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। স্বল্প পরিসরে অনেক লোকের সমাগম এবং অপর্যাপ্ত আলো-বাতাসের কারণে পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে। তথায় মানুষের বসবাস, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন প্রকৃতির দেয়া এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ; তখন বুকের মধ্যে এক গাদা ফাঁপর নিয়ে বিষণ্নতায় ভোগে। এরপরও পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তার উপর প্রভাব ফেলে। এসব কারণেও বন্দিরা স্বাস্থ্যহানিসহ নিদ্রাহীনতায় ভুগে।

শারীরিক অবস্থার প্রভাব মানসিক অবস্থায় উপর এবং মানসিক অবস্থার প্রভাব শারীরিক অবস্থার উপর বিশেষভাবে প্রতিফলন ঘটায়। মোট কথা শরীর ভাল না থাকলে মন ভাল থাকে না। আবার মন ভাল না থাকলে শরীরের উপর প্রভাব পড়ে বা শরীরে সুখ পাওয়া যায় না। কাজেই মন ও শরীর উভয় উভয়ের উপর নিবিড় ও সমভাবে কাজ করে। তাই শরীরের সুস্থতা ও মনের প্রফুল্লতার জন্য চাই খেলা-ধুলা ও বিনোদন। বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় বন্দিদের খেলা-ধুলা তথা শরীর চর্চা ও বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে যৎকিঞ্চিত Indoor games (যেমন- তাস, দাবা, লুডু) এর ব্যবস্থা আছে। বিনোদনের জন্য বেশ কয়েক বছর আগে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে এক ব্যান্ডের রেডিও দেয়া হয়েছিল। তাও আবার পরিচর্যা ও সংরক্ষণে অবহেলার কারণে এখন রেডিওগুলো সবই বিকল হয়ে পড়ে আছে। মানুষ বন্দি অবস্থায় তার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারবর্গের সম্পর্কের মাঝে

---

[২৩০] বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃ-৮০।

[231] Prof. N.V paranjape, criminology & Penology, 10 Edition, p-272.

সাময়িক হলেও ছেদ পড়ে। এই কারণে সে কারাগারের একাকিত্ব জীবনে নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করে। ফলশ্রুতিতে তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিপর্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বিপর্যস্ত ও বিকলাঙ্গ মনের মানুষের কাছ থেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তার ফসল আশা করা যায় না। কাজেই সুস্থ শরীর ও প্রফুল্ল মনের প্রতিফলন ঘটাতে হলে কারাগারে শরীরচর্চা তথা খেলাধুলা ও বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.২.৭ পত্রিকা ও চিঠিপত্র

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে শ্রেণী প্রাপ্ত বন্দিরা সরকারী খরচে ২টি দৈনিক পত্রিকা পেয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণ বন্দিদের মধ্যে দু'একজনকে নিজ খরচে পত্রিকা দেয়া হয়। কারাগারের কোন অঘটন বা গোলযোগের খবর পত্রিকায় প্রকাশ হলেই, কর্তৃপক্ষ ঐ লেখাগুলো কেটে পত্রিকা জেলের ভেতরে দেন। খবর কাটাকাটির ফলে অনেক সময় পত্রিকা উলঙ্গ হয়ে যায়। কাটা খবর জানার জন্য বন্দিরা উতলা হয়ে পড়ে। ঐসব কেটে ফেলা খবর বন্দিরা উৎকোচের মাধ্যমে অফিসার বা কর্মচারীদের কাছ থেকে বা যে কোনভাবেই হোক জেনে নেয়। তাহলে অযথা কাগজ কাটাকাটি করে কি লাভ ! সেজন্য জেলের এই প্রথাটি পরিহার না করে বজায় রাখায় লাভ কোথায় ?

প্রায়ই অভিযোগ উঠে যে, সরকারী খরচে পাঠানো বন্দিদের চিঠি তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বে পৌঁছার কথাও শোনা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বন্দিদের চিঠি ঠিক মত পোস্ট করা হয় না। আবার অনেক সময় বন্দির চিঠি অবহেলা করে অন্যত্র ফেলে দেয়া হয়। বন্দির আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব চিঠি পত্র না পাওয়ার কারণই এই সব। সহজ সংশ্রবে দেখা-সাক্ষাৎ ও সঠিক পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বন্দি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখার সুযোগ পায়। তাই তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে না। এই অধিকার ভোগ করার ফলে বন্দিদের মানসিক অবস্থা সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে। তখন তাদের উপর আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজ হয় এবং তারাও এ পথে এগিয়ে আসতে মনোযোগী হয়ে উঠে।

৭.২.৮ হাজত-বাসকালীন সময় ও পারিবারিক যোগাযোগ

সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজার মেয়াদ শেষে কারাগার থেকে মুক্তি পায়। আর বিচারাধীন বন্দিরা বিচার প্রক্রিয়া ও বিচার চলাকালীন দীর্ঘ সময় বিনাদণ্ডে কারাগারে আটক থাকে। দীর্ঘ সময় জেলে কাটানোর ফলে অনেকের সংসার ভেঙ্গে যায়। স্ত্রী চলে যায় অন্যের সঙ্গে, সন্তান-সন্ততিরা বিপথে যায়, হারানো সামাজিক সম্মান ফিরে পাওয়ার উপায় থাকে না।[১৬] এ সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেন-যেসব হাজতী বন্দি দীর্ঘ কারাভোগের পর মামলার রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাদের সরকারী তরফ থেকে ক্ষতিপরণ দেয়া উচিত।[১৭]

দীর্ঘদিন নারী-সঙ্গ বর্জিত কয়েদীদের মধ্যে স্বভাবতই প্রচণ্ড যৌনক্ষুধা জেগে উঠে। কিন্তু সহজ স্বাভাবিক নিবৃত্তির অভাবে অনেকের মধ্যে এর বিকৃত রূপ দেখা যায়। এই বিকৃত যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য কয়েদীদের মধ্যে সমকামিতার প্রবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ নিয়েই মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বাধে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।[২৩৩] বর্তমান আধুনিক বিশ্বে বন্দিদের শারীরিক নির্যাতনের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। এ যুগের দণ্ডবিজ্ঞানী (Penologist) ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে বন্দিদের প্রতি আচরণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আধুনিক চিন্ত-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কারাব্যবস্থাপনা শাস্তিমূলক ধরন থেকে সংশোধনমূলক ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সেসব দেশে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

---

[২৩২] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ- ৮২।
[১৬] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ- ১২।
[১৭] শাহ-মোয়াজ্জেম হোসেন, নিত্য কারাগারে, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ-১৬।

৭.২.৯ ধর্মীয় অধিকার

আমাদের দেশের কারাগারসমূহে মসজিদ না থাকায় কারাগারের সব বন্দি একত্রিত হয়ে জুম্মার নামাজ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যে কোন ধর্মাবলম্বি মানুষ তার নিজ ধর্মের বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন প্রতিপালন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকারী। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। এ ছাড়াও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, আলোচনা, উপদেশ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ অপরাধীদের সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৭.২.১০ সারকথা

মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। বন্দিদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে; তাদের জীবনযাত্রার প্রতি খেয়াল না করে; তাদের নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ চাহিদার প্রতি নজর না দিয়ে; কারা বিভাগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কোন ফলোদয় আশা করা যায় না। বন্দিরাও আমাদের মত সমাজের মানুষ, তারা কারাগারে মানুষ হিসেবে ন্যূনতম অধিকার পাওয়ার যোগ্য। একজন মানুষকে আন্তরিকভাবে মুখে ও কাজে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে শিখলেই কারা বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হতে পারে।

অধ্যায়-৮ ঃ কারা বিদ্রোহ

৮. কারা বিদ্রোহ

(8. Prison Revolt)

৮.১ কারা বিদ্রোহের ইতিকথা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে ১ম কারা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ বছরই কারাগারে ৫ দফা বিদ্রোহ ঘটে। ১৯৭৭ সালে ৬ বার, ১৯৮০ সালে ৯ বার, ৯০-৯১ সালে ৪ বার এবং ১৯৯৬ সালে ১ বার কারা বিদ্রোহ হয়েছে। দুই দশকে প্রায় ২৫ বার কারা বিদ্রোহে অন্ততঃ ৭০জন বন্দি মারা গেছে। [২৩৪]

বাংলাদেশের প্রায় কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার ২/৩ গুণ বেশি বন্দি রাখা হচ্ছে। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকতে হয়। খাবারের মান খুবই খারাপ। চিকিৎসার অবস্থা শোচনীয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। জামিন প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে গেলেই টাকা দিতে হয়; আর টাকা না দিলেই বিভিন্ন হয়রানি ও টালবাহানা। বিচার ও তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতা। নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক কারা-আইন। ওয়ার্ড ও ড্রেনের দুর্গন্ধময় পরিবেশ। কারাগারের পদে পদে টাকার লীলা। টাকা না দিলে একটা চুলও নড়ে না। এসব বিভিন্ন জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও অমানবিক আচার-ব্যবহারের কারণে রাগ, দুঃখ ও ঘৃণায় বন্দিদের মনে তিলে তিলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বন্দিদের মনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা বিস্ফোরিত হয়ে কারা বিদ্রোহের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। বন্দিরা কখনও ক্ষমতা দখলের জন্য বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায় না। কারা অভ্যন্তরে প্রচলিত অনিয়ম; নির্যাতন আর মানবেতর আচার-আচারণের বিরুদ্ধে তারা এমনিভাবে প্রতিবাদের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।[২৩৫] পৃথিবী এগিয়ে চলছে অতি দ্রুত। কিন্তু আমাদের দেশ আর এগুচ্ছে না। এগুতে পারছে না। সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলে এসে যেন স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়েছে। তাই এই স্থবিরতার বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসক আর আইনের বিরুদ্ধে জেলখানার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বিভিন্ন সময়ে।[২৩৬] কারাগারে বন্দিদের উপর অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, অমানবিক আচার-আচরণ ও অন্যান্য সমস্যাবলি যুক্তিসঙ্গত সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বন্দিরা আন্দোলন করছে। কারাগারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বন্দি আন্দোলনের ফলে অবস্থার যে কিছুটা উন্নতি হয়নি, তা নয়। কিন্তু এজন্য সহ্য করতে হয়েছে অনেক শারীরিক নির্যাতন, বয়ে গেছে অনেক রক্তের বন্যা; ঝরে গেছে অনেক তাজা প্রাণ।

৮.২ ১৯৭৮ সনের দাবীনামা

বাংলাদেশের কারাগারে বিভিন্ন নিপীড়ন, নির্যাতন ও মানবেতর আচার-আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সনের অক্টোবর মাসে বন্দিদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদের অনশন শুরু হয়। ঐ সময় ঢাকা জেলের বন্দিগণ যে দাবীনামা সরকারের কাছে পেশ করেছিল তা নিম্নরূপঃ-[২৩৭]

১. কারা-সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের জেলকোড বাতিল করে স্বাধীন দেশের উপযোগী জেলকোড চালু করতে হবে।
২. নিপীড়নমূলক সকল মধ্যযুগীয় কালাকানুন বাতিল করতে হবে। ডাণ্ডাবেড়ী, শিকলবেড়ী, ঝুলন্তকড়া লাগানো, জোরপূর্বক সালাম আদায় করা ইত্যাদি বাতিল করতে হবে।
৩. সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের ১২ ঘন্টায় একদিন সাজা ধরতে হবে অর্থাৎ ছয়মাসে বছর হিসেব করতে হবে। মার্কা কাটা বন্ধ করতে হবে।
৪. সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশ্রামাগারে টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা করতে হবে। সাক্ষাতের সময় সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।

---

[২৩৪] ২৩/১২/৯৬ তরিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

[২৩৫] ২৪/১২/৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।

৩ বোরহান আহমেদ, কারাগারের দিনগুলি, ১৯৯৫, পৃঃ- ৫২।

[২৩৭] কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪, পৃঃ- ১০৭-১১০

৫. হাসপাতালের সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। নিয়মিতভাবে চিকিৎসকের উপস্থিতি ও সুচিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। রোগীর সংখ্যানুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মহিলা বন্দিদের জন্য একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন সেবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। কারা হাসপাতালে এক্সরে, প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য টেষ্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে; একটি ইমারজেন্সী রুম স্থাপন করতে হবে, যেখানে পালাক্রমে একজন ডাক্তার কর্তব্যরত থাকবেন।
৬. বন্দিদের সুচিকিৎসার জন্য বিনা খরচে কারাগারের বাইরের হাসপাতালে থাকা- খাওয়ার ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় কারাগারের বেলায় ডিআইজি এবং জেলা কারাগারের বেলায় সুপারিন্টেনডেন্টের অনুমতিক্রমে কারা কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে বন্দিদের বাইরের হাসপাতালে প্রেরণের এবং সেখানে অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. ডেটিনিউদের বেলায় কারাগারের বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের বিধান বাতিল করে এ দায়িত্ব কারাকর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করতে হবে।
৮. মেডিক্যাল ডায়েট হিসেবে ইলিশ মাছ, বোয়াল মাছসহ রোগীর খাওয়ার অনুপযোগী মাছ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। রোগ অনুপাতে পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যহানি ও দৈহিক ওজন হ্রাসজনিত কারণে উন্নতমানের অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ করতে হবে।
৯. বিচারাধীন বন্দিদের সাজা হলে হাজত বাসের দিন থেকে সাজা ধরতে হবে। পাঁচ বছরের বেশি যাদের হাজতবাস হয়েছে অথচ মামলার নিস্পত্তি হয়নি, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্দোষ প্রমাণিত হলে বিচারাধীন বন্দিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
১০. চুরি, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ, সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার ইত্যাদি মামলার নিস্পত্তি ৩০ দিনের মধ্যে করতে হবে।
১১. অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ মামলার নিস্পত্তি ৯০ দিনের মধ্যে করতে হবে। অন্যথায় জামিনে মুক্তি দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার সম্পন্ন করতে ছয় মাসের অধিক সময় নেয়া যাবে না।
১২. রাজবন্দিদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে। অস্ত্র আইনে আটক রাজনৈতিক কর্মী, সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মী এবং সশস্ত্রবাহিনীর যে সকল সদস্য বিভিন্ন আন্দোলনে সাজা পেয়ে কারাগারে এসেছে, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে।
১৩. বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ সামরিক আদালত এবং সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত সৈনিকসহ সকল ব্যক্তিকে উচ্চ আদালতে আপিলের সুযোগ দিতে হবে।
১৪. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর বন্দিদের সাধারণ ক্ষমা ও রেমিশন দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। তা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। দুই বছরের অধিক সাজা প্রাপ্তদের বছরে একমাস করে জামিনে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা ভারতসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে আছে।
১৫. পিতামাতা, ভাইবোন,স্ত্রী, পুত্রকন্যা বা স্বামী গুরুতর অসুস্থ হলে বন্দি বা বন্দিনীকে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুত যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।
১৬. যোগ্যতা অনুসারে সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির জন্য কারাগারে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেককে মাসিক দেড়শত টাকা ভাতা দিতে হবে।
১৭. বন্দিদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য সামগ্রী টাটকা ও সজীব হতে হবে। প্রত্যেক বন্দিকে দৈনিক দুই ছটাক মাছ অথবা মাংস এবং ছয় ছটাক চাউলের ভাত দিতে হবে। সাধারণ চৌকায় প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সরকারী খরচে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে।
১৮. কারাগারে সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। সাধারণ বন্দিদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো চলবে না।
১৯. বন্দিদের মধ্যে কাউকে জোর করে বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মেথরের কাজে লাগানো যাবে না। অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি কেউ একাজ করতে চায়,তাদের জন্য হাতের দাস্তানা এবং জুতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের মাসে ৪খানা সাবান ও আধাসের সোডা দিতে হবে।
২০. বন্দিদের প্রয়োজনীয় কাপড় নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। কয়েদী কাপড় বছরে ৪ জোড়া দিতে হবে এবং মাথাপিছু ২টি লুঙ্গি দিতে হবে।
২১. কারাগারের ভেতরে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে।
২২. প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় সঠিকভাবে স্যানিটারী ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩. ধারণক্ষমতা অনুসারে বন্দি রাখতে হবে। অতিরিক্ত সংখ্যক বন্দিদের জামিন দিতে হবে।
২৪. কারাগারে অডিটোরিয়াম থাকতে হবে এবং সেখানে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করতে হবে।
২৫. কারাগারের সব সেল ও ওয়ার্ডে লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে রেডিওর খবর ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সকলেই তা শুনতে পায়।
২৬. ওয়ার্ড ও সেলে লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। খাতা, কলম, বইসহ লেখাপড়ার সকল উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। জেল লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
২৭. ১৯ বছরের কমবয়সী বন্দিদের ব্রোস্টাল (BORSTAL) পদ্ধতির স্কুলে রেখে উন্নত পরিবেশে শিক্ষা দিয়ে দ্রুত মুক্তি দিতে হবে। আটকরত প্রমোদবালা ও অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত মহিলাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
২৮. গ্যাংগ কেইস-এর রাজসাক্ষী প্রথা বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে তাদের মামলা নিস্পত্তি করতে হবে।
২৯. ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেলহত্যা এবং ১৯৯৭ সালের ২রা অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনীতে সংঘটিত ঘটনার জন্য যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে তদন্ত কমিশনদ্বয়ের প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে।
৩০. রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী সকল মুক্তিযোদ্ধাকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।
৩১. ডেটিনিউদের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে না পারলে তাদের মুক্তি দিতে হবে।
৩২. কারাগারে কোন বন্দি মারা গেলে সরকারী খরচে তার লাশ বাড়ীতে পাঠাতে হবে।
৩৩. ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স এবং দৈহিকভাবে পঙ্গু, এরকম বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।
৩৪. স্বাস্থ্যসম্মত কারাভবন নির্মাণ করতে হবে এবং পুরাতন ভবনগুলো মেরামত ও বাসের উপযোগী করতে হবে।
৩৫. কোর্টহাজতের পরিসর বাড়াতে হবে। সেখানে বসার ব্যবস্থাসহ মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, পানীয় জল, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩৬. আন্দোলনে যোগদানকারী বন্দিদের কোন অবস্থায় অন্যত্র স্থানান্তর করা চলবে না।
৩৭. প্রত্যেক ওয়ার্ডে ও সেলে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩৮. জেল আপিলসহ কয়েদীদের আপিলের নিস্পত্তি তিন মাসের মধ্যে করতে হবে।
৩৯. একই ব্যক্তির একাধিক মামলার বিভিন্ন মেয়াদের সাজা কনকারেন্ট (Concurrent) করতে হবে।
৪০. মৃত্যুদণ্ড প্রথা রহিত করতে হবে। সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের উচ্চতর আদালতে আপিলের সুযোগ দিতে হবে।

বন্দিদের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সনে কারা-সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন ১৯৮০ সনে বাস্তবভিত্তিক রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করে। আজ অবধিও কমিশনের সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। অন্যান্য দাবী-দাওয়ার ফলে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল; সেসব সুযোগ-সুবিধা আস্তে আস্তে তুলে নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন দিন দিন বাড়তে থাকে। এর কারণে ১৯৮৩ সনে বন্দিরা ৩৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে পুনরায় আন্দোলন শুরু করে। বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনে সরকার সমস্যার মূলে না গিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ধামাচাপা দিয়েছে।

৮.৩ ১৯৯৬ সনে যশোহরে কারা বিদ্রোহ

যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, দুঃসহ পরিবেশ, নিম্নমানের খাবার, চিকিৎসা ব্যবস্থা শোচনীয়, সবক্ষেত্রেই দুর্নীতি ও ১৯৯১ সনের সাধারণ ক্ষমার পুনঃপ্রবর্তনের দাবীতে ১৯৯৬ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বন্দিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলাদেশের কারা পরিবেশ একই। তবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারের মাধ্যমে। ঐ আন্দোলনে যশোহর জেলের বন্দিগণ যে ১০ দফা দাবীর ভিত্তিতে বিদ্রোহ করেছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-[২৩৮]

---

[২৩৮] ৭/১/৯৭ তারিখের " সাপ্তাহিক যায়যায়দিন " পত্রিকা, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-১৪।

১। ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের ঘোষণা পুনঃপ্রবর্তন।
২। ৩ মাসের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা।
৩। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি।
৪। খাবারের মান উন্নয়ন।
৫। ডাণ্ডাবেড়ী ব্যবস্থা উচ্ছেদ।
৬। জেল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি বন্ধকরণ।
৭। ২৪ ঘন্টাকে ২দিন গণনা।
৮। ২০ বছর যাবজ্জীবনের মেয়াদ গণনা।
৯। সাজাপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকদের পুশব্যাক করা।
১০। বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল ঘোষণা।

যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে যখন বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছিল, পত্র-পত্রিকায় যখন নানা ধরনের খবর ও মন্তব্য ছাপা হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল এটি যেন বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আইজি প্রিজন্সের সমস্যা, সরকারের নয়, তার কোন মন্ত্রীর নয়। সমগ্র ব্যাপারটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে যে কোন লোকের মনে হবে ঢাকায় অবস্থিত সরকার সমস্ত ব্যাপারটিই স্থানীয় প্রশাসন ও নেতৃবৃন্দের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল।[২৩৯] দরদী মন নিয়ে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার প্রায়ই অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে সমর্থ হয়। কিন্তু সে পথ গ্রহণ না করে সরকার অনমনীয় মনোভাব পোষণ করতে থাকে এবং অত্যাচার, উৎপীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় থাকে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[২৪০] এভাবে রক্তক্ষয় ও প্রাণহানির মাধ্যমে যশোহর জেলের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

৮.৪ কারা বিদ্রোহ ও কিছু কথা

নির্দিষ্ট আইনে দোষী সাব্যস্ত অপরাধী বা কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা নিরাপদ হেফাজতের লক্ষ্যে আটক ব্যক্তি বা বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ব্যক্তিগণ কারাগারে বন্দি হিসেবে আটক থাকে। যেহেতু তারা নির্দিষ্ট আইনের আওতায় আটক থাকে সেহেতু তাদের বিদ্রোহ করার কোন নৈতিক অধিকার নেই। এ বিষয়ে তারা জনসমর্থনও যোগাড় করতে পারে না। তদুপরি বিগত ২ দশকে ২৫ বার কারা-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এতগুলো কারা-বিদ্রোহের প্রায় সবগুলোই ঘটেছে জেলখানার অনিয়ম, সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কারণে। শুধু ১৯৯১ সনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিদ্রোহে বন্দিদের ১০ দফা দাবীর মধ্যে এরশাদ আমলে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের মুক্তির দাবীটি ছিল অন্যতম। গণআন্দোলনের ভিতর দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটায়, প্রমাণিত হয় যে ৯ বছর তিনি অবৈধভাবে ক্ষমতায় ছিলেন। তাই তাঁর আমলে সাজা প্রাপ্ত বন্দিদের সাজা নৈতিকভাবে অবৈধ হয়ে যায়। এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ফরমান জারী করেছিলেন। ফলে ঐ কারা-বিদ্রোহ মিষ্টি বিতরণের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

যুক্তরাজ্যের শ্রমিকদলের এম, পি রয় হ্যাটারসলি কমন্স সভায় বলেছিলেন, যদি আপনি মানুষকে পশুর মত দেখেন, এরপর তারা পশুর মত আচরণ শুরু করলে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

কারা বিদ্রোহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঘটে। সেখানে বিদ্রোহের মূল কারণ উদঘাটন করে দরদী মন নিয়ে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে কারা বিদ্রোহ দেখা দিলে বিদ্রোহ সংঘটনকারী নেতাদের প্রশাসনিক কারণে অন্য জেলে বদলী করা হয়। এতে বিদ্রোহ দমন না হয়ে আরো সম্প্রসারিত হতে দেখা গেছে বহুবার। এ সম্পর্কে বোথওয়েল বলেছেন, "আন্দোলন যতো ক্ষুদ্রই হোকনা কেন, তার প্রতিটিই অর্থবহ।" যে কোন দেশের প্রশাসনের পক্ষে কারা-বিদ্রোহ হজম করা অত সহজ নয়। কদাচিৎ বন্দিদের সাথে প্রশাসনের আপস-মীমাংশা হয়। কারাবিদ্রোহ দমনে সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় এবং প্রাণহানি ঘটে। বাংলাদেশে গত দুই দশকে ২৫ বারের কারাবিদ্রোহে প্রায় ৭০ জন বন্দি নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে সহশ্রাধিক বন্দি।

---

[২৩৯] ২৬/১২/৯৬ তারিখের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকা।
[২৪০] শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, নিত্য কারাগারে, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃঃ-৭৮/৭৯।

বাংলাদেশের কারাগারে বর্তমানে কর্মরত বেশির ভাগ কর্মকর্তাই পেশাগতভাবে অদক্ষ। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের যোগ্যতা মেরুদণ্ডহীন হওয়ায় আত্মীয়-স্বজনদের তদবীর ও সুপারিশে চাকুরী পেয়েছেন। এছাড়াও তাদের দক্ষ করে তোলার মত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কারা-বিভাগে নেই। এর মধ্যে কিছু কিছু যোগ্য লোক আছে যারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সাফল্যের সাথে প্রতিপালন করেন। দক্ষ ও পারদর্শী কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োজিত থাকলে সেখানে সহসাই কারা বিদ্রোহের মত দুর্ভাগ্যজনক ও আশংকাজনক ঘটনা সহজে ঘটতে পারে না। কারাগার একটি স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান। এখানে দক্ষ ও মেধাবী লোকের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। সততার সাথে বিভাগীয় পরীক্ষা নিলে বেশির ভাগই কর্মকর্তা কৃতকার্য হতে পারবে না। কারাগারের ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব কারা প্রশাসনের। তাই কারাগারের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তার দায়ভার কারা প্রশাসনকেই বহন করতে হবে।

কারা বিদ্রোহ নিরোধ কল্পে প্রকৌশলী কাজী মুশতাক উল্লাহ নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেছেন[২৪১]। তাঁর প্রস্তাবগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১। কারাগারের প্রশাসনিক সংস্কার ঃ-

(ক) জেলার থেকে শুরু করে আইজি প্রিজন পর্যন্ত সকল পদ বিসিএস ক্যাডারভুক্ত করতে হবে। ৩য় শ্রেণীর ডেপুটি জেলারের পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে ডিআইজি প্রিজন করা বন্ধ করতে হবে।

(খ) ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদীদের সর্দার নিয়োগ প্রথা বন্ধ করা উচিত। কারণ অন্যায়ের উৎস সে নিজেই।

(গ) ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কয়েদী এবং হাজতী কখনও কারাগারে রাখা চলবে না। এই জন্য লঘু অপরাধে গ্রেফতারকৃত কয়েদী ও হাজতীদের একটি ন্যূনতম মেয়াদ সাজা ভোগের পর ডিআইজি প্রিজন নিজেই যেন তাদের অর্থনৈতিক দণ্ডের বিনিময়ে মুক্তি দিতে পারেন, তার আইনগত ব্যবস্থা করা দরকার। এতে জেলখানা ভারমুক্ত হবে এবং রাজস্ব আয়ও বাড়বে।

(ঘ) দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার জন্য বিচারাধীন হাজতীর হাজত খাটার মেয়াদকাল তার সাজা হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং মোট সাজা থেকে বিচারকালের মেয়াদ বাদ দিতে হবে।

(ঙ) ফৌজদারী বিচারের রায় প্রদানের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(চ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ বার বার পরিবর্তন না করে নির্দিষ্ট করা।

২। জেলের আচরণ বিধি সংস্কার ঃ-

(ক) সকালে হাজিরা দেবার জন্য ৩-৪ ঘন্টা হাঁটুগেড়ে লাইন দিয়ে বসে থাকা এবং কুর্নিশ করে সালাম জানানোর প্রথা বাতিল করতে হবে।

৩। পেশাগত উন্নয়ন সংস্কার ঃ-

(ক) কারাগারে মান্ধাতার আমলের দা-কুড়াল বানানো, ঝুড়ি বোনা, বেতের কাজের সাথে আধুনিক যুগের ওয়েল্ডিং, মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিজম, রেডিও-টিভি মেরামত এবং কম্পিউটার শিক্ষার প্রচলন করতে হবে এবং আয়কৃত অর্থ কয়েদীকে ঠিকমতো বুঝেয়ে দিতে হবে।

৪। অন্যান্য সংস্কার ঃ-

(ক) নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা নারী-পুরুষের কাপড় বরাদ্দ করতে হবে। কারণ তারা মাসের পর মাস এক কাপড়ে থাকে।

(খ) জেলের অভ্যন্তরে হাসপাতালকেন্দ্রীক দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করতে হবে।

(গ) প্রত্যেককে পৃথক ২টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি ভাল কম্বল দেয়া এবং মেঝেতে পৃথক শয়নের নম্বরযুক্ত বৃহদাকার শতরঞ্জি বিছানোর ব্যবস্থা করা। তাতে ঘুমানোর জায়গা দখল নিয়ে হাঙ্গামা কমে যাবে।

(ঘ) কিশোর-কিশোরীদের পৃথক সেলে রাখার ব্যবস্থা করা।

---

[২৪১] ৭/১/৯৭ তারিখের “দৈনিক জনকণ্ঠ” পত্রিকা।

অতীতের কারা বিদ্রোহের ইতিহাস ও ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কারা বিদ্রোহ সফল না হলেও বিদ্রোহ দমনের পর তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারের দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকটা হ্রাস পায়। তারপরও কিছু কিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সরকার সমস্যার মূলে না গিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ধামাচাপা দেয়। বজ্র আঁটুনি ফসকা গিরার মত আস্তে আস্তে বন্দিদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ বেড়ে যায়। সমস্যা সমাধানের নামে সরকার কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। এতে অনিয়ম, দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এক বিদ্রোহের ঘা না শুকাতেই আরেক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। অতীতের ঘটনায় দেখা গেছে কারাবিদ্রোহকালে সরকার আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেনি। সরকার আলোচনা বা সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে হিংস্র দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২৪২]

৮.৫ কারা বিদ্রোহ নিরসনের উপায়

কারা বিদ্রোহের কারণসহ সুদূরপ্রসারী কারণগুলোর মধ্যে জেলখানার অনিয়ম, সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বন্দিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলে আমাদের দেশের কারাগারগুলো নির্যাতনের এবং শাস্তি ভোগের পরিবর্তে অন্যান্য সভ্য দুনিয়ার কারাগারগুলোর মত সংশোধনাগার হিসেবে গণ্য হবে।[২৪৩] খাওয়া, পরা, শোয়া থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম, দুর্নীতি ও অমানবিক আচরণ কারাগারে আটক মানুষ পদে পদে উপলব্ধি করে এবং হাড়ে হাড়ে টের পায়। প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই নিজের অজান্তে এসবের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। ফলে ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে চাপা ক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, আর পেছনে ফেরার পথ থাকে না তখন কোন অছিলায় দীর্ঘদিনের পঞ্জিভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা বিস্ফোরিত হয়ে কারা বিদ্রোহ রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই কারা বিদ্রোহের মত আশংকাজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনার স্থায়ী সমাধানের পথ আমাদের খুঁজতে হবে।

৮.৬ সারকথা

অতএব, আলোচনার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কর্তৃপক্ষের প্রতি বন্দিদের মনে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হতে পারে এমন আচরণ করা সমীচীন নয়। বন্দিদের মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ কারাগারের দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও অমানবিক আচরণ, যা দেশ ও জাতির অগ্রগতি বিকাশে অন্তরায়, তা রোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। ফলশ্রুতিতে কারাবিদ্রোহের মত আশংকাজনক, অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় ঘটনা ঘটার সুযোগ রহিত হবে। সেই সাথে অপরাধীরাও আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে সামজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাবে।

---

[২৪২] ২৩.১২.৯৬ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা।

[২৪৩] আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ-১৬৫।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক

(Appendix-A)
Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners

[Source :- Council of Europe, Legal Affaires, Division of Crime Problems, France.]

[The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners had been adopted by the First Congress of the United Nations on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in its resolution of 30 August 1955.

In 1968, the European Committee on Crime Problem of the Council of Europe was invited to adapt the text of the United Nations to the need of contemporary penal policy and to further its effective European application.

The Committee of Ministers of the Council of Europe sitting at Deputy level adopted Resolution (73) 5 and the revised text of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners during their 217th meeting held on 19January, 1973.]

Preliminary observations

1. The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions. They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being good principle and practice in the treatment of prisoners and the management of institutions.

2. The minimum rules shall serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application.

3. These rules cover a field in which thought is constantly developing. They are not intended to preclude the use of new methods or practices, provided that these are compatible with the principle of protection of human dignity and the purposes which, derive from the text of the rules as a whole. It will always be justifiable for the central prison administration to authorise departures from the rules in this spirit.

4. (1) Part I of the rules covers the general management of institutions, and is applicable to all prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to "security measures" (preventive detention) or corrective measures.

(2) Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section. Nevertheless, the rules under Section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in Sections B,C and D, provided they do not conflict with the rules governing these categories and are for their benefit.

PART - I
RULES OF GENERAL APPLICATION

Basic principle

5. (1) The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth of other status.

(2) On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral precepts of the group to which a prisoner belongs.

(3) Deprivation of liberty shall be effected in material and moral conditions which ensure respect for human dignity.

Reception arrangements for prisoners shall be based on the above principle and shall help prisoners to solve their urgent personal problems.

Registration

6. (1) No person shall be received in an institution without a valid commitment order. The details shall immediately be entered in an *ad-hoc* register.

(2) In every place where persons are imprisoned there shall be kept a register with numbered pages in which shall be entered in respect of each prisoner received:

(a) Information concerning his identity;

(b) The reasons for his commitment and the authority therefor;

(c) The day and hour of his admission and release.

Distribution of prisoners

7. When prisoners are being allocated to different institutions, due account shall be taken of their judicial and legal situation (untried or convicted prisoner, first offender or habitual offender, short sentence or long sentence), of their physical condition (young, adult, sick), their mental condition (normal or abnormal), their sex, age and, in the case of convicted prisoners, the special requirements of their treatment.

(a) Men and women shall in principle be detained separately; this principle shall be departed from only as part of an established treatment programme;

(b) Untried prisoners shall not be put in contact with convicted prisoners against their will;

(c) Young prisoners shall be detained under conditions which protect them from harmful influences and which take account of the need peculiar to their age.

Accommodation

8. (1) Prisoners shall normally be lodged during the night in individual cells unless circumstances dictate otherwise.

(2) Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners suitable to associate with one other in those conditions. There shall be supervision by night, in keeping with the nature of the institutions.

9. All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirement of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.

10. In all places where prisoners are required to live or work:

(a) The windows shall be large enough to enable the prisoners, inter alia, to read or work by natural light, and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial ventilation. Moreover, the windows shall, with due regard to security requirements, present in their size, location and construction as normal an appearance as possible;

(b) Artificial light shall satisfy the recognized technical standards.

11. The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in clean and decent conditions.

12. Adequate bathing and shower installation shall be provided so that every prisoner may be enable and required to have a bath or shower, at a temperature

suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week in a temperate climate.

13. All parts of an institution used by prisoners shall be properly maintained and kept scrupulously clean at all times.

Personal hygiene

14. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.

15. In order that prisoners may maintain a good appearance and preserve their self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to shave regularly.

Clothing and Bedding

16. (1) Every prisoner who is not allowed to wear his own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating.

(2) All clothing shall be clean and kept in proper conditions. Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.

(3) Whenever a prisoner obtains permission to go outside the institution he shall be allowed to wear his own clothing or other inconspicuous clothing.

17. Arrangements shall be made on their admission to the institution to ensure that their personal clothing is kept in good condition and fit for use.

18. Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed, and with separate and appropriate bedding which shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.

Food

19.

(1) In accordance with the standards laid down by the health authorities, the administration shall provide the prisoners at the normal times with food which is suitably prepared and presented, and which satisfies in quality and quantity the standards of dietetics and modern hygiene and takes into account their age, health, the nature of their work, and, as far as possible, any requirements based on philosophical and religious beliefs.

(2) Drinking water shall be available to every prisoner.

Exercise and sport

20. (1) Every prisoner who is not employed in outdoor work shall be entitled, if the weather permits, to at least one hour of walking or suitable exercise in the open-air daily, as far as possible, sheltered from intemperate weather.

(2) Physical and recreative education shall be organised during the exercise period for young prisoners, and others of suitable age and physique.

Medical Services

21. (1) At every institution there shall be available the services of at least one general practitioner. The medical services should be organised in close relation with the general health administration of the community or nation. They shall include psychiatric services for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality.

(2) Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialised institutions or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided an institution, their equipment, furnishings and pharmaceutical supplies shall be suitable for the medical care and treatment of sick prisoners, and there shall be a staff of suitably trained officers.

(3) The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.

22. The prisoners may not be submitted to medical or scientific experiments, which may result in physical or moral injury to their person.

23. (1) In penal institution there shall be special accommodation and the necessary staff for the treatment of pregnant women, their confinement and their post-natal care. Nevertheless, arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the institution. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.

(2) Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers.

24. The medical officer shall see and examine every prisoner promptly after his admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of the physical or mental illness and the taking of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner to work.

25. (*1*) The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners and shall see, under the conditions, and with a frequency, consistent with hospital standards, all sick prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his attention is specially directed.

(*2*) The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's physical or mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.

26. (*1*) The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon;

(a) The quantity, quality, preparation and serving of food;

(b) The hygiene and cleanliness of the institution and prisoners;

(c) The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;

(d) The suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding;

(e) The observance of the rules concerning physical education and sports.

(2) The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer submits according to Rules 25.2 and 26 and, where he concurs with the recommendations made, shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his competence or if he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and the advice of the medical officer to higher authority.

<u>Discipline and punishment</u>

27. (1) Discipline and order shall be maintained in the interest of safe custody and well-ordered community life.

(2) Collective punishment shall be prohibited.

28. (1) No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity.

(2) This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment.

29. The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent administrative authority:

(1). Conduct constituting a disciplinary offence;

(2). The types and duration of punishment which may be imposed;

(3). The authority competent to impose such punishment.

30. (1) No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or regulation, and never twice for the same act.

(2) Reports of misconduct shall be presented promptly to the competent authority who shall decide on them without delay.

(3) No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him and given a proper opportunity of presenting his defence.

(4) Where necessary and practicable the prisoner shall be allowed to make his defence through an interpreter.

31. Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishment shall be completely prohibited as punishment for disciplinary offences.

32. (1) Punishment by disciplinary confinement and any other punishment which might have an adverse effect on the physical or mental health of the prisoner, shall only be imposed if the medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it.

In no case may such punishment be contrary to or depart from the principle stated in Rule 31.

(2) The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise the director if he considers the termination of alteration of the punishment necessary on grounds of physical or mental health.

Instruments of restraint

33. The use of chains and irons shall be prohibited. Handcuffs, restraint-jackets and other body restraints shall never be applied as a punishment. They shall not be used except in the following circumstances:

a) As a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority;

b) On medical grounds by direction of the medical officer;

c) By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner form injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once consult the medical officer and report to the higher administrative authority.

34. The patterns and manner of use of the instrument of restraint authorised in the preceding paragraph shall be decided by the central prison administration. Such instruments must not be applied for any longer time than in strictly necessary.

Information to and complaints by prisoners

35. (1) Every prisoner on admission shall be provided with written information about the regulation governing the treatment of prisoners his category, the disciplinary requirements of the institution, the authorised methods of seeking information and making complaints, and all such other matters as are necessary to enable him to understand both his rights, and his obligations and to adopt himself to the life of the institution.

(2) If a prisoners is illiterate, or for any other reason cannot understand the written information provided, the aforesaid information shall be conveyed to him orally.

36 (1) Every prisoner shall have the opportunity each week-day of making requests or complaints to the Director of the institution or the Officer authorised to represent him.

(2) It shall be possible to make request or complaints to an inspector of prisons during his inspection. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or to any other duly constituted authority entitled to visit the prison without the Director or other members of the staff being present.

(3) Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, under confidential cover, to the central prison administration, the judicial authority or other proper authorities.

(4) Unless it is obviously frivolous or groundless, every request or complaints addressed or referred to a prison authority shall be promptly dealt with and replied to by this authority without undue delay.

Contact with the outside world

37. Prisoners shall be allowed to communicate with their family and all persons or representatives of organisations and to receive visits from these persons at regular interval subject only to such restrictions and supervision as are necessary in the interests of their treatment, and the security and good order of the institution.

38. (1) Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong.

(2) Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any national or international authority whose task it is to protect such persons.

39. Prisoners shall be allowed to keep themselves informed regularly of the news by the reading of newspaper, periodicals or special institutional publications, by radio or television transmissions, by lecturer or by any similar means as authorised or controlled by the administration.

Books

40. Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and institutional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it.

Religious and moral assistance

41. So far a practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious, spiritual and moral life by attending the services or meeting provided in the institution and having in his possession any necessary books.

42. (1) If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis.

(2) A qualified representative appointed or approved under paragraph 1 shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper times.

(3) Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoners. On the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude shall be fully respected.

Retention of prisoners property

43. (1) All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoners which under the regulations of the institution he is not allowed to retain shall on his admission to the institution be places in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition. If it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing, this shall be recorded.

(2) On the release of the prisoner all such articles and money shall be returned to him except in so far as there have been authorised withdrawals of money or the authorised sending of any such property out of the institution, or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him.

(3) Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way.

(4) If a prisoner brings in any drugs or medicine, the medical officer shall decide what use shall be made of them.

Notification of death, illness, transfer, etc.

44. (1) Upon the death or serious illness of or serious injury to a prisoner or his removal to an institution for the treatment of mental illnesses or abnormalities, the director shall at once inform the spouse, if the prisoner is married, or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner.

(2) A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In these cases and whenever circumstances allow, the prisoner should be authorised to go to this sick relative or see the deceased either under escort or alone.

(3) Every prisoner shall have the right to inform at once his family of his imprisonment of his transfer to another institution.

Removal of prisoner

45. (1) When prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, curiosity and publicity in any form.

(2) The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way, which would subject them to unnecessary physical hardship, shall be prohibited.

(3) The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and in accordance with regulations which it shall draw up.

Institutional Personnel

46. (1) The prison administration shall provided for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of the institutions depends.

(2) The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used.

(3) To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison officers and have civil service status with

security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.

47. (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence.

(2) On recruitment, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to pass theoretical and practical tests.

(3) During their career, the personnel shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending course of in-service training to be organised by the central administration at suitable intervals.

48. All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.

49. (1) So far as possible the personnel shall included a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.

(2) Social workers, teachers and trade instructors shall be employed on a permanent basis. This shall not preclude part-time voluntary workers.

50. (1) The director of an institution should be adequately qualified for his task by character, administrative ability, suitable training and experience.

(2) He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed part-time.

(3) He shall reside on the premises of the institution or in its vicinity.

(4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall visit each of them at frequent intervals. A responsible official shall be in charge of each of these institutions.

51. The administration shall introduce forms of organisation to facilitate communication between the different categories of staff in a institution with a view to ensuring co-operation between the various services, in particular, with respect to the treatment of prisoners.

52. (1) The director, his deputy, and the majority of the other personnel of the institution shall be able to speak the language of the greatest number of prisoner, or a language understood by the greatest number of them.

(2) Whenever necessary and practicable the services of an interpreter shall be used.

53. (1) In institution which are large enough to required the services of one or more full-time medical officers, at least one of them shall reside in the vicinity of the establishment.

(2) In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be able to attend without delay in cases of urgency.

54. Special care should be taken in the appointment and supervision of staff in institutions or parts of institutions housing prisoners of the opposite sex.

55. (1) Officer of the institutions shall not use force against prisons except in self-defence or in cases of attempted escape or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the director of the institution.

(2) Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrains aggressive prisoners.,

(3) Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstance be provided with arms unless they have been trained in their use.

Inspection and Control

56. (1) There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with a view to bringing about objectives of penal services.

(2) The protection of the individual rights of prisoners with special regard to the legality of the execution of detention measures shall be secured by means of a control carried out, according to national rules, by a judicial authority or other duly constituted body authorised to visit prisoners and not belonging to the prison administration.

PART- II
Rules Applicable to special categories

A. Prisoners under sentence:

Guiding principals.

57. The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under Preliminary Observation 1 of the present text.

58. Imprisonment and other measures which results in cutting off an offender from the outside world are, by the deprivation of liberty, a punishment in themselves. Therefore the prisons system shall not, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation. The regime of the institution should seek to minimise any difference between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.

59. The purpose and justification of a sentence of improvement or a similar measure depriving a person of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.

60. (1) To this end, the institution should utilise all the remedial, educational, moral, spiritual and other forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply them in accordance with the individual treatment needs of prisoners.

(2) Communication between prisoners and staff shall be facilitated in order to prevent and cope with tensions, which may occur in prison communities and to ensure the prisoners' acceptance of treatment programs.

61. It is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, in particular, by a pre-release regine organised in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision combined with effective social aid.

62. The treatment of prisoners should emphasis not their exclusion from the community but their continuing part in it. Community agencies should, therefore,

by enlisted whenever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving the relationship of a prisoner with the family, with other persons and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

63. The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental illnesses or defects, which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical, surgical and psychiatric service shall be provided to that end.

64. (1) The fulfillment of these principles requires individualisation of treatment and for this purpose, a flexible system of allocating prisoners; it is therefore desirable that prisoners be placed in separate institutions or sections where each can received the appropriate treatment.

(2) These institutions and units should be of various types. It is desirable to provide varying degrees of security according to need. Open institutions, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favorable to rehabilitation for carefully selected prisoners.

(3) It is desirable that the type, size, organisation and capacity of these institutions or units be determined essentially by the nature of the treatment to be provided.

65. The duty of society does not end with a prisoner's release. There should therefore, be governmental and private agencies capable of providing efficient after care for the released prisoner and directed towards lessening prejudice against him and towards his social rehabilitation.

Treatment

66. The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.

67. (1) To these ends, all appropriate means shall be used, including spiritual guidance in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social case-work, group activities, employment counseling, physical development and strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his prospects after release.

(2) For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible after his admission, full reports on the various matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports shall always include reports by a medical officer, and wherever possible by a psychiatrist.

(3) Reports and other relevant information shall be collected in individual files. Files shall be kept up to date and be accessible to responsible persons.

(4) Individual treatment programmes shall be drawn up after consultation between the various categories of personnel. Prisoners shall be involved in the drawing up of their individual programmes. The programmes should be periodically reviewed.

Classification of prisoners and individualisation of treatment

68. The purposes of classification of prisoners shall be:

(a) to separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or their personality, are likely to exercise a bad influence;

(b) So to place the prisoners as to facilitate their treatment, taking into account the security requirements and their social rehabilitation.

69. So far as possible separate institutions or separate sections of on institution shall be used for the treatment of the different types of prisoners.

70. As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.

71. (1) prisoners shall be given opportunity to participate in activities of the institution likely to develop their sense of responsibility and to stimulate interest in their own treatment.

(2) Efforts should be made to develop methods of co-operation and participation of the prisoners in their treatment. To this end prisoners shall be encouraged to assume, within the limits specified Article 28, responsibilities in certain sectors of the institution's activity.

Work

72. (1) Prison labour must not be of a punitive nature. Prisoners shall not be asked to do any especially dangerous or unhealthy work.

(2) Prisoners under sentence may be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer and to the needs of education at all levels.

(3) Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.

(4) So far as possible the work provided shall be such will maintain or increase the prisoner's ability to earn a normal living after release.

(5) Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners.

(6) Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.

73. (1) The organisation and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life.

(2) The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution.

74. (1) Work for prisoners shall be assured by the penal Administration in its own workshops and farms or with private contractors, where practicable.

(2) Where prisoners are working for private contractors they shall always be under the supervision of the penal Administration. The full normal wages for such work shall be paid by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

75. (1) Safety and health precautions for prisoners shall be similar to those enjoyed by workers outside.

(2) Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favorable than those extended by law to workers outside.

76. (1) The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed in conformity with local rules or custom in regard to the employment of free workmen.

(2) Prisoners should have at least at one rest-day a week and sufficient time for education and other activities required as part of their treatment and rehabilitation.

77. (1) There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.

(2) Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earning on approved articles for their own use and to allocate a part of their earning to their family or other approved uses.

(3) The system may also provide that a part of earning be set aside by the administration so as to constitute a saving fund to be headed over to the prisoner on his release.

<u>Education and recreation</u>

78. (1) Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction. Special attention shall be given by the administration to the education of illiterates and young prisoners.

(2) So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the education system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.

79. Recreational and cultural activities shall be provided in all institutions for the benefits of the mental and physical health of prisoners.

80. From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relation with relatives, other persons or agencies outside the institutions as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.

81. (1) Effective services and agencies shall be set up to assist released prisoners to re-establish themselves in society, in particular with regard to work.

(2) Steps must be taken to ensure that on release prisoners are provided, as necessary, with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and work to go to, be provided with immediate means of subsistence, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination.

(3) The approved representatives of the agencies or service mentioned in paragraph 1 shall have all necessary access to the institution and to prisoners with a view to making a full contribution to the preparation for release and after-care programme of the prisoner.

(4) The activities of all agencies and services concerned with the after-care of prisoners must be co-ordinated.

<u>B. Insane and mentally abnormal prisoners</u>

82. (1) Persons who are found to be insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove them to appropriate establishment for the mentally ill as soon as possible.

(2) Specialised institutions or section under medical management should be available for the observation and treatment of prisoners suffering gravely from other mental disease or abnormality.

(3) The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provided for the psychiatric treatment of all prisoners who are in need of such treatment.

83. Steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure where necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social psychiatric after-care.

C. Prisoners under arrest or awaiting trial

84. (1) Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as "untried prisoners" hereinafter in these rules.

(2) Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners who are presumed to be innocent until they are found guilty, shall be treated without restrictions other than those necessary for the penal procedure and the security of the institution.

85. (1) Untried prisoners shall not put in contact with convicted prisoners against their will.

(2) Young untried prisoners shall be detained under conditions which protect them from harmful influences and which take account of the need peculiar to their age.

86. Untried prisoners shall be given the opportunity of having separate rooms, except where climatic conditions require otherwise.

87. In accordance with the standards laid down by the health authorities, the administration shall provide the untried prisoners at the normal times with food which is suitably prepared and presented, and which satisfies in quality and quantity the standards of dietetics and modern hygiene and takes into account their age, health, the nature of their work, and, as far as possible, any requirements based on philosophical and religious beliefs.

88. (1) An untried prisoner shall be given the opportunity of wearing his own clothing, if it is clean and suitable.

(2) If he does not avail himself of this opportunity, he shall be supplied with suitable dress.

(3) If he has no suitable clothing of his own, an untried prisoner shall be provided with civilian clothing in good condition in which to appear in court or on outings organised under the regulations.

89. An untried prisoner shall always be offered opportunity to work, but shall not be required to work. If he chooses to work, he shall be paid for it.

90. An untried prisoner shall be allowed to procure at his own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

91. An untried prisoner shall be given the opportunity of being visited and treated by his own doctor or dentist if there is reasonable ground for his application and he is able to pay.

92. An untried prisoner shall be allowed to inform family of his detention immediately, and shall be given all reasonable facilities for communicating with his family and friends and persons with whom it is to his legitimate interest to enter into contact and for receiving visits from them under conditions that are fully satisfactory from the human point of view, subject only to such restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and good order of the institution.

93. An untried prisoners shall be entitled, as soon as he is imprisoned, to choose his legal representative, or shall be allowed to apply for free legal aid where such aid is available, and to received visits from his legal adviser with a view to his defense and to prepare and hand to him, and to receive, confidential instructions. At his request he shall be given all necessary facilities for this pourpose. In particular, he

shall be given the free assistance of an interpreter for all essential contacts with the administration and for his defence. Interviews between the prisoner and his legal adviser may be within sight but not within hearing, either direct or indirect, of a police or institution official.

D. Civil Prisoners

94. In countries where the law permits imprisonment for debt or by order of a court under any other non-criminals process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater or severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall not be less favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.

পরিশিষ্ট-খ

কারাবন্দিদের সঙ্গে আচরণের ন্যূনতম আদর্শ নিয়ম এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রণালী তথ্য বিভাগ, জাতিসংঘ; নিউইয়র্ক ১৯৮৪

(উৎসঃ- আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০, পৃঃ- ১৩৩-১৪৯)

অপরাধের প্রতিকার এবং অপরাধীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে ১৯৭৫-এ জাতিসংঘে পঞ্চমবারের মতো একটি কংগ্রেস হয়। প্রথমে এ কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল দুটি: এক, যারা অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছে এবং যারা বিচারাধীন তাদের প্রতি রাষ্ট্রগুলোর আচরণ কী হবে তা ঠিক করা। ঐ কংগ্রেসে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জাতিসংঘ নিম্নোক্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই যাদের আটক করা হচ্ছে তাদের প্রতি আচরণীয় নিয়ম সম্পর্কেও এ বিধিতে সুপারিশ রয়েছে। এটা ছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় লক্ষ্য। এটা প্রণয়নের মূল দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘের Economic and Social Council- এর। এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে উপরোক্ত কাউন্সিলের কয়েকটি প্রস্তাব (Resolution) দেখা যেতে পারে। যার মধ্যে আছে প্রস্তাব নং- ১৯১৯৩ (এলএক্স)/ মে ১৯৭৬, ২০৭৬ (এল এক্স)/ মে ১৯৭৭ এবং ৪৭/ ১৯৮৪। এই দলিলটি বর্তমান লেখক ইংরেজি থেকে নিজে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করার সময় দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কিছু স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। দলিলটির ইংরেজির মূল শিরোনাম ছিল : [Standard minimum rules for the treatment of Prisoners and Procedures for the effective implementation of the rules.]

প্রাথমিক প্রস্তাবনাঃ

১. শাস্তি দেওয়া এবং তা কার্যকর করার নামে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে দেশে দেশে। এখানে উপস্থাপিত নিয়মগুলোকে সেক্ষেত্রে কোন 'আদর্শ ব্যবস্থা' হিসেবে বিবেচনা করার দরকার নেই। বরং আজকের দিনে এ কাজে একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা কী হবে এবং তাতে কি কি উপাদান থাকা উচিত সে সম্পর্কে কিছু ঐকমত্য তুলে ধরা হচ্ছে এখানে। অর্থাৎ কারা ব্যবস্থাপনা ও বন্দিদের প্রতি আচরণের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নীতি কী হবে এবং তার বাস্তবায়ন কীভাবে ঘটবে সেটা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই এ উপস্থাপনার লক্ষ্য।

২. পৃথিবীর ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ক্ষেত্রে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। সুতরাং এখানে যেসব নিয়মের কথা বলা হবে তা বিশ্বে সব সময় সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এটাই স্বাভাবিক। তারপরও এ নিয়মগুলোর কিছু তাৎপর্য আছে। প্রথমত, দুনিয়া জানবে যে, এ বিষয়ে জাতিসংঘের কাছে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড কী। দ্বিতীয়ত, কারা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান আছে এমন অনেক লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিধিমালা প্রণীত। এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানের প্রতিফলন আছে এখানে। আগ্রহীরা কাজে লাগাতে পারবেন এটা। তৃতীয়ত, সর্বত্র একটি মানবিক কারা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার সংগ্রামেও উদ্দীপনা যোগাবে এ বিধি-বিধান।

৩. অন্যদিকে এই বিধি এমন এক ক্ষেত্র সম্পর্কে তৈরি যেখানকার উন্নয়ন চিন্তা বিকশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে বর্তমান বিধি তুলে ধরে জাতিসংঘ জেল ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বন্ধ করে দিতে চায় না। বরং এখানে কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আরও উন্নত নিয়ম-কানুন তৈরি করা যাবে। সে লক্ষ্যে কোন কেন্দ্রীয় কারা প্রশাসন চাইলে এ নিয়ম-কানুন থেকে বিচ্যুত হয়েও নতুন কিছু করতে পারেন তারা।

৪. ক. এই নিয়মের 'পার্ট-১' এ কারা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারা ব্যবস্থাপনার এই নিয়ম নিরাপত্তা আইনের বন্দি থেকে শুরু করে অপরাধ আইনের বন্দি পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. পার্ট-২ তে যেসব নিয়মের কথা বলা হয়েছে তা বিশেষ বিশেষ ক্যাটিগরির বন্দিদের জন্য। যেমন, সেকশন-১ এর নিয়মগুলো দণ্ড পাওয়া বন্দিদের জন্য। তবে এই নিয়মগুলো আবার সেকশন-২, ৩ এবং ৪ এর বন্দিদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। সকল সেকশনের নিয়মই কারাবন্দিদের সুযোগ-সুবিধার জন্য। সুতরাং তার মধ্যে বিরোধের সুযোগ নেই।

৫. ক. কারা ব্যবস্থার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে বিভিন্ন দেশে তরুণ ও কিশোর বন্দিদের জন্য যেসব সংশোধন কেন্দ্র ও স্কুল রয়েছে এসমস্ত নিয়ম সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার দাবি করে না। তবে পার্ট-১ এর নিয়মাবলী সাধারণভাবে ওইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

খ. কিশোর আদালতের মাধ্যমে বন্দিশালায় আসা সকলকেই কারাগারের পরিবর্তে সংশোধন কেন্দ্রে রাখা উচিত। এদের জেলে না রাখার বিষয়টি নিয়ম হিসেবে অনুসৃত হওয়া দরকার।

পার্ট-১

কারাগার তত্ত্বাবধানের মৌলিক নীতিমালা

৬. ক. জাতি, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনীতি কিংবা অন্য কোন বিবেচনা থেকেই নিচের নিয়মগুলোর ব্যতিক্রম ঘটানো যাবে না কখনো।

খ. একজন কারাবন্দির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ-যাই হোক না কেন তার প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে।

রেজিস্ট্রার

৭. ক. যেখানেই মানুষকে বন্দি করা হোক না কেন-সে স্থানে অবশ্যই একটি বাঁধাই করা রেজিস্ট্রার খাতা থাকতে হবে। সে খাতার প্রতিটি পাতায় আগে থেকে নাম্বার বসানো থাকবে এবং এই খাতায় একজন বন্দির-

* পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য থাকবে,
* তার কারাগারে থাকার কারণ উল্লেখ থাকবে,
* তার আগমন ও নিগর্মনের দিন ও সময় উল্লেখ থাকবে,

খ. যথাযথ দায়িত্বশীল কারো নির্দেশনামা ছাড়া কাউকে জেল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রহণ করা যাবে না। এই নির্দেশনামায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত থাকতে হবে এবং তা বন্দিশালার রেজিস্ট্রারে তুলতে হবে।

বন্দিদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা প্রসঙ্গে

৮. ক. শারীরিক সুস্থতা, লিঙ্গ, বয়স, অপরাধের ধরন এবং আটকের আইনগত কারণকে বিবেচনায় নিয়ে বন্দিদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখতে হবে তাদের।

খ. পুরুষ ও নারীদের যথাসম্ভব আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে। তবে যদি কোন কারা প্রতিষ্ঠান নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের বন্দিদের গ্রহণ করে তা হলে মেয়েদের রাখার জায়গাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ পৃথক হতে হবে।

গ. বিচারাধীন বন্দি এবং শাস্তি পাওয়া বন্দিদের আলাদাভাবে রাখতে হবে।

ঘ. ঋণের কারণে কিংবা অন্য কোন দেওয়ানী আইনে আটকদের অবশ্যই অপরাধ আইনে আটকদের থেকে পৃথক ব্যবস্থাধীনে রাখতে হবে।

ঙ. প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু-কিশোর বন্দিদের আলাদা রাখতে হবে।

থাকার ব্যবস্থা

৯. ক. ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে এমন সেল বা রুমে প্রত্যেক বন্দি রাতে ঘুমাবেন। বিশেষ কোন কারণে, যেমন-বন্দিদের সাময়িক অতিরিক্ত চাপ থাকলে তবেই কেন্দ্রীয় কারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। তবে একটা সেলে বা রুমে একাধিক বন্দি থাকবে- এটা কাঙ্ক্ষিত নয়।

খ. অনেক সময় বন্দিদের ডরমিটরীতে (একাধিক শয়নকক্ষ বিশিষ্ট কক্ষ) রাখা হয়। একেকটি ডরমিটরীতে রাখার জন্য বন্দি বাছাই করতে হবে যত্নের সঙ্গে। মিলেমিশে থাকতে পারবে এমন বন্দিদেরই যেন সেখানে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে রাতে ডরমিটরীতে নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. বন্দিদের থাকার জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হবে তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলো পুরোদস্তুর স্বাস্থ্যসম্মত কি না। গরম এবং শীতের মতো ঋতু বৈচিত্র্যের বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। আর বিশেষ লক্ষ্য রাখার ব্যাপার হলো বন্দিদের থাকার জায়গায় প্রশস্ততা, বাতাসের চলাচল এবং আলোর উপস্থিতি পর্যাপ্ত কি না।

১১. বন্দিদের থাকতে হয় এবং কখনো কখনো কাজ করতে হয় এমন সকল স্থানে-
ক. জানালা এমন প্রশস্ত হতে হবে যাতে সেখান দিয়ে প্রাকৃতিক আলো বাতাস আসতে পারে এবং সে আলোতে একজন বন্দি স্বাভাবিকভাবে পড়তে পারেন বা কাজ করতে পারেন।
খ. চোখের ক্ষতি না করে কাজ এবং পড়া-লেখা করা যায় এমন পর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করা (সেটা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যাই হোক) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব থাকবে।

১২. প্রত্যেক বন্দি প্রকৃতির ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিতে পারে এমন পর্যাপ্ত সেনিটারী ব্যবস্থা থাকতে হবে কারাগারে। সেটা হতে হবে পরিচ্ছন্ন এবং শোভন।

১৩. জেলে গোসলের পর্যাপ্ত স্থাপনা থাকতে হবে। স্বাস্থ্যগত কারণে বন্দি মাত্রই গোসলের প্রয়োজন হতে পারে এবং যতবার প্রয়োজন তাদের সে সুযোগ দিতে হবে। তবে ব্যবস্থাটি হতে হবে স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী তাপমাত্রায় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একজন বন্দিকে সপ্তাহে অন্তত: একবার গোসলের সুযোগ না দিলেই নয়।

১৪. একটি বন্দিশালার যেসব স্থান জুড়ে বন্দিদের চলাফেরা ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়-তা অবশ্যই সকল সময় যথাযথভাবে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা

১৫. কারা অধিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে পানিসহ টয়লেট সামগ্রী দরকার পড়লে তা সরবরাহ করতে হবে।

১৬. উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রত্যেক বন্দি তাদের আত্মমর্যাদায় মানানসই সুসঙ্গত চাল-চলনে অভ্যস্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের চুল-দাঁড়ির যত্নের সুবিধাদি দিতে হবে। বিশেষ করে, পুরুষদের সেভ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পোশাক ও বিছানা সুবিধা

১৭. ক. যেসব জেলবাসীকে নিজস্ব কাপড় পরতে দেওয়া হয় না তাদের সবাইকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পোশাক সরবরাহ করতে হবে। সে পোশাক আবহাওয়া সম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে এবং তা কোনভাবেই মর্যাদাহানিকর বা অপমানকর হতে পারবে না।
খ. বন্দিদের পোশাক যথাযথভাবে পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য সেসব কাপড় প্রয়োজনে ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হবে।
গ.আইনগত প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একজন বন্দি যখন কারাগারের বাইরে যায় সেরকম ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তাকে নিজস্ব পোশাক কিংবা অন্য সাধারণ পোশাক পরিধানের সুযোগ দেওয়া উচিত।

১৮. বন্দিকে যখন নিজস্ব পোশাক পরার সুযোগ দেওয়া হয় তখন এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, বন্দিরা সেসব পোশাক পরিচ্ছন্ন করা এবং পরিধানের উপযোগী করার সুযোগ পাবে।

১৯. স্থানীয় এবং জাতীয় মানদণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে প্রত্যেক বন্দিকে একটি পৃথক শয্যা সরবরাহ করতে হবে, সঙ্গে থাকতে হবে পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা। শয্যার জিনিসপত্র সরবরাহের সময় পরিষ্কার ও ভালো অবস্থায় থাকতে হবে এবং পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে তা ঘন ঘন বদলাতে হবে।

খাদ্য

২০. ক. কারা প্রশাসনের আরেকটি দায়িত্ব হলো নিয়মিত এবং সময় মতো বন্দিদের খাবার সরবরাহ করা। সে খাবার একদিকে যেমন ভালো পুষ্টিমানের হতে হবে অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্য ও শক্তি'র উন্নতি সাধনের জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে। তা ছাড়া সে খাবার পরিবেশনও হতে হবে ভালোভাবে।
খ. প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক কারা বাসিন্দা যাতে পানি পান করতে পারে, সে জন্য তা সহজপ্রাপ্য হওয়া জরুরি।

শারীরিক ব্যায়াম এবং খেলাধুলা

২১. বন্দিদের মধ্যে যাদের উন্মুক্ত স্থানে কাজে নিযুক্ত করা হয় না তাদের খোলা জায়গায় প্রতিদিন অন্তত: এক ঘন্টা উপযুক্ত ব্যায়াম করার সুযোগ থাকবে। তরুণ বন্দি এবং অন্য যাদের বয়স ও স্বাস্থ্য উপযুক্ত

বিবেচিত হবে-তাদের ব্যায়ামের সময় কিছু শারীরিক ও বিনোদনমূলক প্রশিক্ষণ পাওয়া দরকার। এর জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

চিকিৎসা সেবা

২২. ক. যেকোন কারা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা এবং ন্যূনপক্ষে একজন উপযুক্ত মানের চিকিৎসক থাকতে হবে। সে চিকিৎসকের মনোরোগবিদ্যায়ও খানিকটা দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। দেশে বা সমাজে যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সঙ্গে কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার নিবিড় যোগাযোগ থাকতে হবে। কারা চিকিৎসা সুবিধার মধ্যে মনোরোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা এবং তার চিকিৎসার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ. যে সমস্ত অসুস্থ বন্দির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রয়োজন তাদের সাধারণ হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। যেসব কারাগারে হসপিটাল সুবিধা আছে সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে-যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং ওষুধের সরবরাহ যেন যথাযথ হয়। সেগুলো যেন প্রকৃত অসুস্থ রোগীদের কাজে লাগে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্টাফ অফিসার সেগুলোর তদারকিতে থাকবেন।

গ. বন্দি মাত্রই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে একজন দক্ষ দন্ত চিকিৎসকের সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে।

২২. ক. মহিলাদের রাখা হয় যেসব কারা প্রতিষ্ঠানে সেখানে সন্তান জন্মদানের পূর্বের এবং পরের চিকিৎসা সেবার বন্দোবস্ত থাকতে হবে। প্রয়োজনে সন্তান জন্মদানের জন্য প্রসূতিকে কারাগারের বাইরে হসপিটালে নিতে হলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে এবং সেরকম প্রস্তুতি কারা কর্তৃপক্ষের সাধারণভাবেই থাকা উচিত। যদি কোন শিশু কারাগারে জন্ম নেয় তবে তার বার্থ সার্টিফিকেটে সেটা উল্লেখ করার দরকার নেই।

খ. যেসব কারা প্রতিষ্ঠানে মায়ের সঙ্গে নবজাতকের থাকার অনুমতি আছে সেখানে যোগ্য লোকদের দ্বারা নার্সারি পরিচালনার বিধানও করতে হবে। বন্দি মায়েরা যখন বাচ্চাদের যত্ন নিতে পারবে না তখন ঐসব নার্সারিতে বাচ্চাদের রাখতে হবে।

২৩. মেডিকেল অফিসার প্রয়োজন অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যেক বন্দিকে দেখবেন এবং পরীক্ষা করবেন। এই দেখা এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হতে হবে হাজতি ও কয়েদিদের শরীর ও মনে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না তা খুঁজে দেখা। তাঁর করণীয়র মধ্যে থাকবে ইনফেকশন ও সংক্রামক রোগের জন্য সন্দেহভাজনদের অন্যদের থেকে পৃথক রাখার জন্য চিহ্নিত করা, কোন বন্দির পুনর্বাসনের পথে যেসব শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে সেটা শনাক্ত করা এবং সাধারণভাবে বন্দিদের শারীরিক সামর্থ্য বোঝা, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কারা জেলে শ্রম দেওয়ার মতো অবস্থায় আছে সেটা দেখা।

২৪. ক. একজন মেডিকেল অফিসার সাধারণ বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার তদারকি করা ছাড়াও তার দৈনন্দিন কর্মসূচিতে থাকবে যারা নিজেদের ভাষ্য অনুযায়ী 'অসুস্থ বোধ করছে' তাদের দেখা এবং সেসব বন্দিদের দিকে নজর দেওয়া যাদের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

খ. কোন কারা চিকিৎসক যদি দেখেন যে, তাঁর বিবেচনায় কোন একজন কারা নিবাসীর বন্দিদশা দীর্ঘায়িত হওয়ার মধ্য দিয়ে তার শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য চরম ক্ষতির মুখে পড়ছে বা পড়েছে তা হলে বিষয়টি অবশ্যই তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

২৫. ক. নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জেল ডাক্তার নিয়মিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যেসব বিষয়ে পরামর্শ দেবেন তার মধ্যে আছে:

(১) খাবারের গুণগত ও পরিমাণগত মান এবং তা পরিবেশনের ধরন সম্পর্কে,
(২) কারাগার এবং সেখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে,
(৩) স্যানিটেশন, তাপ ও আলোর অবস্থা সম্পর্কে,
(৪) বান্দিদের পোশাক ও বিছানাপত্রের উপযোগিতা এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে,
(৫) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মকানুন কতটুকু পালিত হচ্ছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে।

খ. উপরে ২৫ (খ) এবং ২৬ নাম্বার নিয়মে যা বলা হলো-সে অনুযায়ী মেডিকেল অফিসারের যেকোন রিপোর্ট ও সুপরিশ কারা পরিচালক বিবেচনায় নেবেন। তিনি যদি চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন তা হলে উত্থাপিত সুপারিশগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবেন। তবে যদি এমন হয় যে তার বাস্তবায়ন কারা পরিচালকের সামর্থ্য বহির্ভূত কিংবা তিনি মেডিকেল অফিসারের সুপারিশের সঙ্গে একমত নন-তা হলে ঐ সুপারিশ এবং সে বিষয়ে নিজস্ব অভিমত দুটোই তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাবেন।

শৃংখলা ও শাস্তি

২৬. কারাগারে শৃংখলা এবং নিয়মাবলী দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপালন করতে হবে। তবে ' নিরাপদ হেফাজত ' বলতে যা বোঝায় বা হুকুমনিষ্ঠ একটি সম্প্রদায় যেভাবে থাকে-কারাবাসীদের সেভাবেই যেন রাখা হয়। তাদের জীবন যেন এর চেয়ে অতিরিক্ত গণ্ডিবদ্ধ করা না হয়।

২৭. ক. কারাগারে নিয়ম-শৃংখলা আরোপ করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রাতিষ্ঠানিক পদে কোন বন্দিকে নিযুক্তি দেওয়া যাবে না।

খ. তবে উপরোক্ত নিয়মটি সেখানে প্রযোজ্য হবে না যেখানে বন্দিদের 'স্বশাসন' ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্বশাসন বলতে বোঝানো হচ্ছে-কোথাও কোথাও এমন দেখা যায়-কর্তৃপক্ষের তদারকিতেই বন্দিরা বিশেষ বিশেষ গ্রুপে কারাগারে বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব নেয়। যেমন, খেলাধুলার বিষয়, শিক্ষার বিষয় কিংবা এরকম অন্য কিছু। এসব কর্মকাণ্ড চালাতে কর্তৃপক্ষই বিশ্বাস ভরে বন্দিদের দায়িত্ব দেয়।

২৮. নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সব সময় যোগ্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আইন বা বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে :

ক. শৃঙ্খলা অপরাধের জন্য করণীয় নির্ধারণ।
খ. শাস্তির ধরন ও স্থায়ীত্ব ঠিক করা।
গ. কোন শাস্তি দেওয়ার মতো কর্তৃপক্ষীয় যোগ্যতা বা অধিকার।

২৯. ক. আইন বা বিধি মতো না হলে কোন বন্দিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি একই অপরাধের জন্য কাউকে দু'বার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

খ. অভিযোগ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত না করে কোন বন্দিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। শাস্তি দেওয়ার আগে সবাইকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উচিত হবে প্রতিটি অভিযোগ ও শাস্তি সংক্রান্ত প্রতিটি কেস পূর্ণাঙ্গভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

গ. যেখানে প্রয়োজন হবে এবং সম্ভব হবে সেখানে একজন বন্দিকে দোভাষীর সহায়তায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩০. সরাসরি দৈহিক শাস্তি দেওয়া কিংবা অন্ধকার সেলে রেখে দেওয়াসহ-নির্মম, অমানবিক এবং মর্যাদা হানিকর কোন প্রকার শাস্তিই কেবল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে এমন অপরাধের জন্য দেওয়া যাবে না।

৩১. ক. অনেক কারাগারে বন্দিদের শাস্তির পদ্ধতি হিসেবে সীমিত পরিসরে অটক রাখা কিংবা খাবার কমিয়ে দেওয়ার চল আছে। একজন বন্দিকে এরকম দণ্ড কখনোই মেডিকেল অফিসারের অনুমোদন ছাড়া দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ কারা চিকিৎসককে আগে এই লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হবে যে, ঐ বন্দি এরকম শাস্তি ভোগ করতে শারীরিকভাবে সক্ষম।

খ. এরকমভাবে আরও অনেক শাস্তির কথা বলা যায়-যেগুলো একজন বন্দির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতির কারণ হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে-সেগুলো প্রদানের আগে চিকিৎসকের লিখিত অনুমোদন লাগবে। এ ছাড়া **৩১** নম্বর বিধিতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ব্যতিক্রম হয় বা তার সঙ্গে ভিন্নতা তৈরী হয় এমন কোন শাস্তির উদ্যোগ অগ্রহণযোগ্য।

গ. শাস্তি ভোগ করছে-এমন যেকোন বন্দিকে চিকিৎসক প্রতিদিন দেখাশোনা করবেন। শারীরিক বা মানসিক প্রয়োজন হলে চিকিৎসক শাস্তিভোগরত বন্দি সম্পর্কে শাস্তির ধরন পরিবর্তন বা সময়সূচি পরিবর্তন সম্পর্কে কারা পরিচালককে অবহিত করবেন।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

৩২. বন্দিদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানান কারাগারে নানান পদ্ধতি আছে, যেমন, হাতকড়া, শেকল, লৌহবন্ধ, স্ট্রেইট জেকেট (Strait jacket) ইত্যাদি। শেষোক্ত পদ্ধতিটি হলো লম্বা হাতওয়ালা একধরনের জামা বিশেষ- যা দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বন্দিদের আটক রাখা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এগুলোকে কখনোই শাস্তিরূপে ব্যবহার করা যাবে না। বন্দি নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য উপায়ও একইভাবে শাস্তিরূপে ব্যবহার করা যাবে না- যদি না নিম্নোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ঃ

ক. এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার সময় বন্দি যাতে পালাতে না পারে সেজন্য পূর্ব সতর্কতা হিসেবে ; তবে মনে রাখতে হবে যে, স্থানান্তরের পর বন্দিকে যখন বিচারবিভাগীয় বা প্রশাসনিক

কোন কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করা হয় তখন অবশ্যই পূর্ব সতর্কমূলক হাতকড়া; শেকল বা অন্য কিছু থাকলে তা খুলে দিতে হবে।

খ. চিকিৎসার প্রয়োজনে মেডিকেল অফিসার যদি কোন বন্দিকে বিশেষ কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন-তা হলে সেটা অনুসরণযোগ্য।

গ. কোন বন্দি যদি নিয়ন্ত্রণের অতিরিক্ত বাইরে চলে যায় এবং নিজের ক্ষতি কিংবা অন্য বন্দি বা কারা সম্পত্তি ক্ষতিসাধন থেকে যখন সাধারণভাবে তাকে আর নিবৃত্ত করা যায় না তখন কারা পরিচালক তাকে নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে পরিচালক মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেও জানাবেন তা।

বন্দিদের তথ্য দেওয়া এবং তাদের অভিযোগ শোনা

৩৩. ক. জেলখানায় ভর্তির সময়ই লিখিতভাবে প্রত্যেক বন্দিকে কিছু তথ্য জানিয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে আছে তার ক্যাটিগরির বন্দিরা প্রশাসনের কাছ থেকে কী ধরনের শাসন প্রত্যাশা করতে পারে। প্রতিষ্ঠানে তাকে কী ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, কোনো তথ্য জানতে হলে বা কোন অভিযোগ করতে হলে তার স্বীকৃত পন্থা কী ইত্যাদি। এসব তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্য হলো নবাগত একজন কারাবাসীকে তার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেওয়া, পাশাপাশি তিনি যাতে প্রতিষ্ঠানে নিজেকে দ্রুত খাপখাইয়ে নিতে পারে সেজন্য সহায়তা করা।

খ. কোন বন্দি পড়তে অসমর্থ হলে পূর্বোক্ত তথ্যাবলী তাকে সরবরাহ করতে হবে মৌখিকভাবে।

৩৪. ক. প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন নির্দিষ্ট থাকা উচিত-যে দিন বন্দিরা পরিচালক বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের কাছে কোন অনুরোধ বা অভিযোগ জানাতে পারবে।

খ. কারা-পরিদর্শক যখন পরিদর্শন কাজে আসছেন তখন তার কাছে বন্দিদের অনুরোধ কিংবা অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকতে হবে। বন্দিদের সবসময়ই এ সুযোগ থাকা উচিত যাতে তারা কারা-পরিদর্শকের সঙ্গে কিংবা একই কাজের অন্য কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে পারে। এ রকম কথা বলার সময় সংশ্লিষ্ট কারা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

গ. এক বা একাধিক বন্দি যদি কেন্দ্রীয় কারা প্রশাসন, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অনুরোধ বা অভিযোগ জানানোর অনুমতি চায় তা হলে সংশ্লিষ্ট কারা প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে উল্লেখিত অনুরোধ বা অভিযোগের সারবস্তুতে কোন সেন্সর না করে তা উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া।

ঘ. উত্থাপিত প্রত্যেক অভিযোগ বা অনুরোধ ভিত্তিহীন বা তুচ্ছ কোন ব্যাপার বলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা বিবেচনা করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে দেরি না করে।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ

যথাযথ তদারকির মধ্যে দিয়ে বন্দিদের অবশ্যই পরিবার ও স্বীকৃত বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত বিরতিতে দেখা করার সুযোগ দিতে হবে। একই ধরনের সুযোগ থাকতে হবে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

৩৫. ক. যেসব বন্দি বিদেশী নাগরিক, তাদের-বাংলাদেশস্থ স্ব স্ব দেশের দতাবাসের কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি দিতে হবে।

খ. যদি এমন কোন বিদেশী বন্দি থাকে-বাংলাদেশে যার দেশের দতাবাস নেই অথবা সে বন্দি যদি শরণার্থী হয়ে থাকেন কিংবা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক না হয়ে থাকেন (Stateless) তা হলে ঐসব ব্যক্তিকেও উপরে উল্লিখিত সুবিধাদি দিতে হবে- যাতে তারা এমন দেশের দতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে যে দতাবাস তাদের রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। অনুরূপ ব্যক্তিরা কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

৩৬. সংবাদপত্র ও সাময়িকী পাঠের মাধ্যমে বন্দিদের গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্পর্কে অবহিত থাকার সুযোগ দিতে হবে। প্রশাসনের অনুমতি ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বেতার তরঙ্গ, লেকচার কিংবা সমধর্মী অন্যান্য মাধ্যমেও তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকবে বন্দিদের।

বই

৩৭. সকল ক্যাটাগরির বন্দিরা ব্যবহার করতে পারে এমন একটি গ্রন্থাগার সকল কারাগারে থাকতে হবে। গ্রন্থাগারে পর্যাপ্তভাবে বিনোদনমূলক এবং শিক্ষমূলক বই থাকা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি গ্রন্থাগার ব্যবহারে বন্দিদের উৎসাহও যোগাতে হবে।

ধর্ম

৩৮. ক. কোন কারা প্রতিষ্ঠানে যদি একই ধর্মের প্রচুর বন্দি থাকে তা হলে সেখানে এবাদত পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ বা অনুমতি দিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সামগ্রিক অবস্থা অনুমোদন করে তা হলে ঐ নিয়োগ বা অনুমতি হতে পারে পূর্ণ সময়ের জন্য।

খ. যেকোন ধর্মেরই হোক না কেন কোন বন্দি যদি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ চায় তবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার জেলে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আগমন উপলক্ষে যদি ভিন্ন ধর্মের কোন বন্দি আপত্তি তোলে তবে ঐ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জেলে অবস্থানকালে ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

৩৯. কারাগারে প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কোন বন্দির ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট চাহিদার সরবরাহ যতদূর সম্ভব অনুমতিযোগ্য হবে। বিশেষতঃ ধর্মীয় পুস্তক-তার ভাষায় যা যা পালন ও উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছে সেটার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তাকে দিতে হবে।

বন্দিদের সম্পদাদির সংরক্ষণ

৪০. ক. জেলে আসার পর কোন বন্দির কাছে টাকা, পোশাক এবং অন্য যেসব মল্যবান দ্রব্যাদি থাকবে-যা সে নিয়ম অনুযায়ী কারাগারে রাখতে পারে না-সেটাকে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই নিরাপদ হেফাজতে উত্তমভাবে রাখবে। ঐসব দ্রব্যের একটি তালিকা থাকতে হবে এবং সে তালিকায় সংশ্লিষ্ট বন্দির স্বাক্ষর থাকতে হবে।

খ. কারামুক্তির সময় সকল বন্দিকে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকা দ্রব্য ফেরত দিতে হবে এবং তার একটি রসিদ রাখতে হবে।

গ. কোন বন্দির নামে কারাগারের বাইরে থেকে কোন অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে সেটাও উপরোক্ত পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ এবং ফেরত দিতে হবে।

ঘ. কোন বন্দির মালিকানাধীন ড্রাগ বা মেডিসিন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন কারা চিকিৎসক।

মৃত্যু, অসুস্থাতা, বদলি ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

৪১. ক. কোন বন্দি মারা গেলে কিংবা গুরুতর অসুস্থ বা আহত হলে অথবা মানসিক রোগের চিকিৎসায় তাকে অন্যত্র চিকিৎসার জন্য নিতে কারা পরিচালক অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি তার স্ত্রী বা স্বামীকে জানাবেন (যদি বন্দি বিবাহিত হয়)। অথবা অবহিত করবেন তার কোন নিকটাত্মীয়কে। বন্দি কর্তৃক মনোনীত অন্য কাউকেও তা অবহিত করা যেতে পারে।

খ. কোন বন্দির নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে বা গুরুতর আহত হলে সে সংবাদও তাৎক্ষাণিকভাবে বন্দির কাছে পৌঁছাতে হবে। যদি কোন বন্দির কোন নিকটাত্মীয় মুমূর্ষু অবস্থায় থাকেন এবং যদি এমন হয় যে বন্দির তাকে দেখতে যাওয়া দরকার তা হলে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করবেন।

গ. কারা জীবনের কোন বিষয় এবং এক কয়েদখানা থেকে অন্য কয়েদখানায় স্থানান্তরের বিষয়টি বন্দিরা যাতে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিবারকে জানাতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বন্দিদের স্থানান্তর

৪২. ক. কোন বন্দিকে যখন এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে নেওয়া হবে তখন বাইরের জনজীবন ন্যূনতম মাত্রায় হলেও যেন তার দৃষ্টিগোচরে রাখা হয়। পাশাপাশি চলতি পথে তাকে নিয়ে কৌতুহল, প্রচারণা বা আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. বন্দি পরিবহনে যেসব যানবাহন ব্যবহৃত হয় সেগুলোতে সচরাচর আলো বাতাসের এত স্বল্পতা থাকে যে-তাতে অযথাই যাত্রীর শারীরিক কষ্ট বাড়ে। এ অবস্থা বদলাতে হবে।

গ. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের খরচেই বন্দি পরিবহন করতে হবে এবং পরিবহন সুবিধা সকল ধরনের বন্দির জন্য সমমানের হতে হবে।

প্রতিষ্ঠান কর্মী সম্পর্কে

৪৩. ক. কারা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে যে কোন কর্মচারী নিয়োগ এ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার মতো তাদের একাগ্রতা, মানবিকতাবোধ, পেশাগত সামর্থ্য, ব্যক্তিগত উপযুক্ততা আছে কি না সেটা যাচাই করতে হবে।

খ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে এই প্রত্যয় সজাগ রাখতে হবে যে, এটি একটি গুরুত্বপর্ণ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জনগণের মাঝেও অনুরূপ মনোভাব সৃষ্টিতে কারা প্রতিষ্ঠানকেই যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

গ. পূর্বোক্ত লক্ষ্য নিশ্চিত করতে কারা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া উচিত পূর্ণকালীন ভিত্তিতে, পেশাদার কারা-কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে। এ পেশার মর্যাদা থাকতে হবে সিভিল সার্ভিসের মতো। চাকুরি জীবনের নিশ্চয়তার ভিত্তি যেন নির্ভর করে কেবল-ভালো আচরণ, দক্ষতা এবং শারীরিক সামর্থ্যের ওপর। ভাতা হওয়া উচিত আকর্ষণীয় এবং পর্যাপ্ত। কাজটির বিশেষ ধরনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন চাকুরির সুবিধাদি ও শর্তাদি নির্ধারিত হয়।

৪৪. ক. কারা কর্মকর্তাদের শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা হতে হবে উঁচুমানের।
খ. পেশায় পুরো যোগ দেওয়ার আগে তাদের সাধারণ ও বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তাদের।
গ. পেশাগত দায়িত্ব গ্রহণের পর চাকুরি জীবনে প্রত্যেকের উচিত হবে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত বিরতিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং পেশাগত সামর্থ্যের ক্রমাগত মানোন্নয়ন ও সে মান বজায় রাখার চেষ্টা করা।

৪৫. কারা প্রতিষ্ঠানের সকলে হবে সকল সময়ের জন্য। তাঁরা নিজেদের পরিচালনায় এবং দায়িত্ব পালনে মূল লক্ষ্য হিসেবে রাখবেন বন্দিদের ভালো পথে প্রভাবিত করা।

৪৬. ক. কারা প্রতিষ্ঠানে যতদূর সম্ভব মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, শিক্ষক, কারিগরি প্রশিক্ষকদের কর্মকর্তা হিসেবে রাখা দরকার।
খ. মনোবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, শিক্ষক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কাজে পার্ট-টাইম ভিত্তিক কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবকের পাশাপাশি সার্বক্ষণিক কর্মী ও কর্মকর্তাও থাকতে হবে।

৪৭. ক. কারা প্রতিষ্ঠানে যাকে পরিচালক করা হবে তার এ দায়িত্ব পালনের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রশাসনিক সামর্থ্য, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
খ. পরিচালককে অবশ্যই অফিসিয়াল কাজে সার্বক্ষণিক সময় দিতে হবে। তার নিযুক্তি কোন অবস্থাতেই খণ্ডকালীন হবে না।
গ. পরিচালকের বসবাস হওয়া উচিত কারাগার চত্বরে অথবা এর যত সন্নিকটে সম্ভব।
ঘ. যখন কোন পরিচালকের অধীনে একাধিক জেল পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় তখন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাকে ঘন ঘন যেতে হবে। সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা করতে হবে যেন তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কারা প্রতিষ্ঠানে একজন করে জেল কর্মকর্তা আবাসিক ভিত্তিতে দায়িত্বে থাকেন।

৪৮. ক. একটি কারাগারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বন্দি যে ভাষায় কথা বলেন বা মূলতঃ যে ভাষা বোঝেন তারা-সে কারাগারের পরিচালক, তাঁর সহযোগী এবং অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐ ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য থাকতে হবে।
খ. কখনো দরকার পড়া মাত্রই দোভাষী ব্যবহার করতে হবে।

৪৯. ক. বড় বড় কারাগারে এক বা একাধিক মেডিকেল অফিসারকে আবাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান চত্বরে বা সম্ভাব্য নিকটতম স্থানে রাখতে হবে।
খ. যেসব জেলে আবাসিক চিকিৎসক নেই সেখানেও প্রতিদিন অন্ততঃ একবার অবশ্যই ডাক্তার পরিদর্শনে আসবেন। এ ছাড়া ঐ ডাক্তার এমন স্বল্প দূরত্বে থাকবেন যেন জরুরি প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাওয়া যায়।

৫০. ক. যেসব জেলে নারী ও পুরুষ-উভয় ধরনের বন্দি থাকেন সেখানে নারীদের পৃথক যে ব্যবস্থায় রাখা হয় তার দায়িত্ব থাকবে একজন দায়িত্বশীল মহিলা কর্মকর্তার ওপর। তিনিই ঐ অংশের সকল বিষয় হেফাজত করবেন।

খ. সঙ্গে কোন নারী কর্মকর্তা না থাকলে কোন পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারী জেলের ঐ অংশে যাবেন না-যেখানে মেয়েরা থাকছে।

গ. নারী বন্দিদের দেখা-শোনার দায়িত্ব নারী অফিসারদের। তবে তার অর্থ এই নয় যে, কারা প্রতিষ্ঠানের পুরুষ কর্তারা, বিশেষতঃ চিকিৎসক এবং শিক্ষকরা বন্দিশালার মহিলা ওয়ার্ডের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন না।

৫১. ক. কারা কর্মকর্তারা বন্দিদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন না-যদি না সেটা আত্মরক্ষার তাগিদে হয় অথবা কোন বন্দি পালিয়ে যাওয়ায় উদ্যোগী হয় বা আইনসম্মত কোন নির্দেশ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যে কর্মকর্তা শক্তি'র ব্যবহারে উদ্যোগী হবেন তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা জরুরি কি না। তাছাড়া ব্যাপারটি তাৎক্ষণিকভাবে কারা পরিচালককেও জানাতে হবে।

খ. আক্রমণাত্মক বন্দিদের নিয়ন্ত্রণে কারা কর্মকর্তারা যাতে সক্ষম হয় সে জন্য তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

গ. বিশেষ কোন পরিস্থিতি না হলে কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করে এমন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকা চলবে না। এ ছাড়া যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেই তাদেরকে কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র করা যাবে না।

পরিদর্শন

৫২. পেনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন থাকতে হবে। বিশেষ করে এসব প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয় কি না এবং যে সংশোধনমূলক লক্ষ্য নিয়ে এসব স্থাপিত-সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না সেটা দেখা ঐ পরিদর্শকদের বিশেষ একটি দায়িত্ব হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশেষ ক্যাটিগরির বান্দিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম

দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের ক্ষেত্রে

পরিচালনার নীতিমালা

৫৩. এধরনের বন্দিদের আবাসস্থল পরিচালনার নীতিমালার মধ্যেই এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক লক্ষ্য ও অভিপ্রায়টি থাকতে হবে। এই দলিলের একেবারে শুরুতেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫৪. যে কোন বন্দিত্বের শাস্তির ফলাফল হয়-একজন অপরাধীকে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। যেহেতু সে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে সে-কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকারও থাকে না তার। এরকম অবস্থায় কারা ব্যবস্থা যেন প্রকৃতিগতভাবে বন্দিদের জন্য আরও দুর্গতিময় না হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শৃঙ্খলামূলক কোন কারণ ছাড়া।

৫৫. স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার মতো বন্দিত্বের শাস্তি বা ঐ ধরনের কোন দণ্ডের লক্ষ্য এবং ন্যায্যতা হলো এই যে, সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে কেবল তখনি-যদি বন্দিত্বের দিনগুলোতে জেলবাসীদের মধ্যে এ বোধ তৈরি করা যায় যে, শুধু সে নিজে নয়-ফিরে গিয়ে আইনসম্মত জীবন যাপন করতে সমাজকেও নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হবে সে।

৫৬. উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিকারমূলক, শিক্ষামূলক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক-সকল সম্ভাব্য সহায়ক উপায় এবং শক্তি কাজে লাগতে হবে। কোন বন্দিকে-কোন উপায়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বা সংশোধন করা যাবে-সেটা লক্ষ্য রাখা বিশেষ জরুরি। সে অনুয়ায়ী প্রতিকারমূলক উদ্যোগ নিতে হবে।

৫৭. ক. কারা জীবন এবং বাইরের মুক্ত জীবনের মধ্যে দূরত্ব যত পারা যায় কমানোর উদ্যোগ নেবেন কর্তৃপক্ষ। এ উদ্যোগের ফলে বন্দিদের মধ্যে যেমন দায়িত্ববোধের শিক্ষা জাগবে তেমনি বাড়বে মানুষ হিসেবে মর্যাদাবোধ।

খ. বন্দিরা যাতে সামাজিক জীবনে ফেরত যেতে পারের সেজন্য দণ্ড সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই জন্য একটি শাখা থাকতে হবে যারা রিলিজ পর্ববর্তী কেসগুলো নিয়ে কাজ করবে। অথবা একই লক্ষ্যে আলাদা আরেকটি প্রতিষ্ঠান থাকবে কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট তদারকির ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে ঐ কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা পুলিশকে অবহিত করতে হবে তার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তবে সামাজিক সাহায্য সংস্থাগুলোকে অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৫৮. উপরোক্ত সব কাজ চালাতে হবে এটা ধরে নিয়ে নয় যে বন্দিরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বরং এটাই বিবেচনায় থাকতে হবে যে, তারা চলমান সমাজেরই অংশ। বন্দিদের সামাজিক পুনর্বাসনে কারা প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের সহায়তা করতে পারে এমন সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। ঐসব প্রতিষ্ঠানের যেসব সমাজকর্মী বিভিন্ন সংস্থা এবং পরিবারের সঙ্গে কারাবন্দিদের যোগাযোগে সংশ্লিষ্ট থাকবেন কারা কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হবে। যে কোন বন্দিরই নাগরিক অধিকার আছে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারসহ নানান সামাজিক স্বার্থ আছে। যতদূর সম্ভব বন্দির দণ্ড এবং বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঐসব অধিকার ও স্বার্থের হেফাজত করতে হবে।

৫৯. কারাগারে যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেটার দায়িত্ব হবে বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বা ক্ষত যা তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের অন্তরায় তা চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া। ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সাধারণ চিকিৎসা, অপারেশান ও মনোচিকিৎসা।

৬০. ক. উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দরকার বন্দিদের প্রতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মনোযোগ। এ ছাড়া প্রয়োজনে বন্দিদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করার জন্য একটি নমনীয় ব্যবস্থা। এর ফলে যেসব গ্রুপ তৈরি হবে তাদের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের তদারকিতে দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বন্দির কার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

খ. বন্দিদের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার পর তাদের জন্য একই ধরনের নিরাপত্তা কায়েমের দরকার নেই। বন্দি ভেদে নিরাপত্তার ধরনও বিভিন্ন হবে। যেসব বন্দি আত্ম-শৃঙ্খলায় উদ্বুদ্ধ হবে তাদের নমনীয় নিরাপত্তার উন্মুক্ত প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে। এর জন্য যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে বাছাইকৃত বন্দিদের পুনর্বাসনে সুবিধাজনক শর্ত আরোপ করতে হবে।

গ. দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য যেসব কারা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত প্রকৃতির নয় সেখানে এটাই আশা করা যায় যে, বন্দি সংখ্যা এত বেশি হবে না যাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের খোঁজ-খবর নিতে বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে একটি কারাগারে কয়েদি সংখ্যা পাঁচ শত অতিক্রম না করাই উত্তম। উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানে বন্দি সংখ্যা হওয়া উচিত যতটা সম্ভব আরও কম।

ঘ. যেসব কারা প্রতিষ্ঠান বড় মাপের-সেখানে বন্দিদের দেখাশোনা করার মতো পর্যাপ্ত সুবিধাদি থাকতে হবে।

৬১. একজন বন্দি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। মুক্তির পরও একজন বন্দির জন্য কাজ করার মতো সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ থাকা দরকার। কারণ বন্দিদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় নানান সমস্যা থাকে এবং তাকে নানান সামাজিক সংস্কারের প্রতিবন্ধকতা পেরোতে হয়।

আচরণ

৬২. দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা যাতে মুক্তির পর আইন মান্যকারী আত্মনির্ভর ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারেন সেজন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে জেলে তাদের প্রতি আচরণের মাধ্যমে। দায়িত্ববোধ এবং আত্মমর্যাদা জাগ্রত করাই হবে বন্দিদের প্রতি আচরণের মূলনীতি।

৬৩. ক. উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য সকল উপায়ই কাজে লাগতে হবে-যার মধ্যে থাকবে ধর্মীয় শিক্ষা, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, অর্থকরী আয়ের পথ-সন্ধান দেওয়া, শারীরিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। আর এসবের জন্য আগে দরকার হবে বন্দিদের কেস হিস্ট্রি তৈরি করা। তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস, মেজাজ-মর্জি, শাস্তির মেয়াদ জানা এবং মুক্তির পর তার সম্ভাবনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

খ. উপরের অনুচ্ছেদে যে কেস হিস্ট্রির কথা বলা হলো, তা বন্দি কারাগারে আসার পর পরই তৈরি করতে হবে এবং তার মধ্য থেকে করণীয় সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা বের করতে হবে। এই রিপোর্টের মধ্যে বন্দির স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীর মন্তব্য যুক্ত করতে হবে।

গ. প্রত্যেকের কেস হিস্ট্রিস্বরূপ রিপোর্টটি থাকতে হবে স্বতন্ত্র ফাইলে। এই ফাইলের বিষয়বস্তু আবার প্রতিনিয়ত নবায়ন করতে হবে। তা ছাড়া এটা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে-কেউ চাইলেই সেটা পাওয়া যায়।

বন্দিদের শনাক্তকরণ এবং শ্রেণীবিন্যাস

৬৪. শ্রেণীকরণের লক্ষ্য হলো-

ক. দুষ্ট প্রকৃতির বন্দিদের পৃথক করা-যাতে তারা অন্যাদের প্রভাবিত করতে না পারে।

খ. সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচির ধরন অনুযায়ীও বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করতে হয়।

৬৫. বন্দিদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা একই কারাগারের বিভিন্ন শাখায় রাখতে হবে।

৬৬. একজন বন্দির স্বভাব, সামর্থ্য এবং মেজাজ অনুযায়ী তার প্রতি আচরণ করতে হবে বা তার সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। ভর্তির পর কেস হিস্ট্রি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ঐ করণীয় অনুযায়ী কাজে নামতে হবে।

বিশেষাধিকার

৬৭. প্রত্যেক কারা প্রতিষ্ঠানেই বিশেষাধিকারে একটি ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদিদের জন্য ঐ বিশেষাধিকারের পদ্ধতি হবে বিভিন্ন। এর লক্ষ্য হবে বন্দিদের ভালো আচরণে অনুপ্রাণিত করা, তাদের দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটানো; পাশাপাশি বন্দিদের স্বার্থেই তাদের মধ্যে কারা কর্তৃপক্ষের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি।

শ্রম

৬৮. ক. শুধু বন্দিদের খাটিয়ে নেওয়াই কারা শ্রমের লক্ষ্য হবে না।

খ. দণ্ডপ্রাপ্ত সকল বন্দিরই কাজের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর লক্ষ্য হবে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা। মেডিকেল অফিসারের নির্দেশেই এটা করতে হবে।

গ. স্বাভাবিক জীবনে যাতে বন্দিরা কর্মজগতে সচল থাকতে পারে সেজন্য বন্দিদের প্রয়োজনীয় প্রকৃতির যথেষ্ট কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. মুক্তির পর সৎভাবে জীবন যাপনে সহায়তার লক্ষ্যে যথাসম্ভব-কারাগারে কাজের বিনিময়ে আয়ের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

ঙ. বন্দিদের মধ্যে যারা বিশেষতঃ তরুণ তাদের এমন কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে যা থেকে তাদের লাভের ব্যবস্থা হয়।

চ. প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের আওতার মধ্যে থেকে বান্দিদের কাজের ক্ষেত্রে পছন্দের সুযোগ দিতে হবে।

৬৯. ক. কারাগারে যেসব কাজের সুযোগ থাকবে তার পরিচালনার জন্য থাকতে হবে একটি কর্তৃপক্ষ। সে কর্তৃপক্ষ এবং কাজের পদ্ধতি হতে হবে বাইরের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মতো, বন্দিরা যাতে মুক্তির পর বহির্জগতের পেশাগত জীবনে সহজে খাপখাওয়াতে পারেন।

খ. কারাগারে বন্দিদের কাজের আগ্রহ এবং সে অনুযায়ী তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার মূল লক্ষ্য এই হবে না যে, এ থেকে কারা কর্তৃপক্ষ লাভ করবে।

৭০. ক. কারা প্রতিষ্ঠানের শিল্প কিংবা খামার শাখা সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রাখাই সংগত। বেসরকারি ঠিকাদারদের হাতে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

খ. যেখানে বন্দিদের শ্রম সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নেই-সেখানেও তাতে অন্ততঃ প্রতিষ্ঠানের কোন এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধান থাকা উচিত। সরকারের অন্য বিভাগের জন্য যদি বন্দিদের দিয়ে কোন কাজ করানো হয় তা হলে তার জন্য স্বাভাবিক মজুরি দিতে হবে এবং সেটা সেই কর্মকর্তার মাধ্যমে দেওয়া উচিত যিনি শ্রম সরবরাহ করেছেন। বন্দিদের শ্রমের হিসাবও থাকবে তার কাছে।

৭১. ক. বন্দি নয়,এমন কেউ যদি কারাগারে শ্রমে নিয়োজিত থাকেন তবে তার নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়টির প্রতিও কর্তৃপক্ষ নজর রাখবেন।

খ. কাজ করতে যেয়ে আহত হলে বা ঐ কাজের ধরনের জন্য বন্দি অসুস্থ হলে তিনি যাতে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন এবং তা যেন মুক্ত শ্রমিকদের সমপর্যায়ের হয় তার নিয়ম থাকতে হবে।

৭২. ক. দিনে এবং সপ্তাহে বন্দিরা কত ঘন্টা কাজ করবে সেটাও নির্ধারিত থাকবে। এটা নির্ধারিত হবে আইন অনুযায়ী বা প্রশাসনিক নির্দেশে। তবে এক্ষেত্রে কারাগারের বাইরে একই বিষয়ে অনুসৃত স্থানীয় নিয়ম কানুনকে বিবেচনায় নিতে হবে।

খ. কর্ম ঘন্টা নির্ধারণের সময় আরও খেয়াল রাখতে হবে, সপ্তাহে যেন একদিন অবসরের সুযোগ থাকে। তা ছাড়া বন্দিরা যাতে শিক্ষাসহ তাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

৭৩. ক. বন্দিদের কাজের একটি ন্যায়সঙ্গত মজুরি নীতি থাকতে হবে।

খ. কাজের বিনিময়ে যে অর্থ বন্দিরা পাবেন তার এক অংশ নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করা এবং অপর এক অংশ পরিবারের কাছে পাঠানোর সুযোগ থাকতে হবে। এ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নিয়ম থাকবে।

গ. ঐ নিয়মের মধ্যে এও থাকবে যে বন্দির আয়ের এক অংশ কারা কর্তৃপক্ষের কাছে সঞ্চয় হিসেবে জমা থাকবে এবং মুক্তির সময় বন্দি তা পাবে।

শিক্ষা ও বিনোদন

৭৪. ক. যেসব বন্দি আরও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য সেটার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সম্ভব হলে ধর্মীয় শিক্ষারও সুযোগ থাকতে হবে। নিরক্ষর এবং তরুণদের জন্য শিক্ষা হতে হবে বাধ্যতামূলক। কারা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেবেন বলে অশা করা হচ্ছে।

খ. বন্দিদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াই উত্তম। যাতে মুক্তির পর বন্দি ঐ শিক্ষা-বাইরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিত করতে কোন বেগ না পায়।

৭৫. মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা এবং স্বস্তির স্বার্থে প্রত্যেক বন্দি-নিবাসে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ থাকতে হবে।

৭৬. দণ্ডপ্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে একজন বন্দির প্রতি মনযোগের প্রাথমিক বিবেচনা হবে এই যে, মুক্তির পর তার ভবিষ্যৎ কী হবে। এক্ষেত্রে বন্দি নিজের ভবিষ্যৎ এবং তার পরিবারের বর্তমান সহায়তার স্বার্থে যদি বইরের কোন প্রতিষ্ঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বা যোগাযোগ স্থাপন করতে চায় তবে তাতে সহায়তা করতে হবে। সময় সময় তাকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধও করতে হবে।

ক. মুক্ত বন্দির পুনর্বাসনে যেসব সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা ও সুবিধা আছে মুক্তিকালে বন্দিরা যাতে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের শনাক্তকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়েও সহযোগিতা করতে হবে। এটা দরকার বিশেষ কয়েকটি কারণে; মুক্তিকালে বন্দির যাতে আবহাওয়া ও ঋতু অনুযায়ী পোশাক থাকে, সে যাতে কাজ এবং থাকার জায়গা খুঁজে পায়, সে যেন গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে এবং এ সময়টায় তার চলার মতো আর্থিক সামর্থ্য যেন থাকে। এ বিষয়গুলো অবশ্যই কারা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয় হবে।

খ. যেসব প্রতিষ্ঠান বন্দিদের উপরোক্ত সহায়তা দেয় বা দিতে ইচ্ছুক তাদের কারাগারে কর্তৃপক্ষ ও বন্দি উভয়ের কাছে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকতে হবে। বিশেষ করে কারো দণ্ড নির্ধারণের পরই তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে করণীয় ঠিক করতে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূচনা করতে হবে।

গ. এটাও আশা করা যায় যে, প্রাপ্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার যাতে হয় সেজন্য পূর্বে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ সু-সমন্বিত হবে।

মস্তিষ্ক বিকৃত এবং মানসিকভাবে অস্বাভাবিক বন্দি সম্পর্কে

৭৭. ক. কোন বন্দির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে না। বরং তাকে দ্রুত মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়াও বন্দিদের মধ্যে যারা অন্যান্য মানসিক রোগে ভুগছে বা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আছে তাদের অবশ্যই পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং মেডিকেল ব্যবস্থাপনার অধীনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের অওতায় নিতে হবে।

গ. এ ধরনের বন্দিদের কারাগারে অবস্থানকালে তাদের অবশ্যই একজন মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।

ঘ. দণ্ডপ্রাপ্তদের আবাসস্থলে সাধারণ চিকিৎসা কিংবা মনোরোগ চিকিৎসা ব্যবস্থার এই প্রস্তুতি থাকতে হবে যে, সুনির্দিষ্ট মনোরোগী ছাড়াও যে-কোন বন্দি চাইলে তাকে মনোবিজ্ঞানীদের সেবা দিতে পারতে হবে।

৭৮. যদি সম্ভব হয়, সঠিক কোন সংস্থার সঙ্গে বন্দোবস্তের ভিত্তিতে মনোরোগ চিকিৎসাধীন বন্দির মুক্তির পরও প্রয়োজন থাকলে তার চিকিৎসা চালাতে হবে। এ ছাড়া এ ধরনের বন্দিদের জন্য মুক্তির পরও সমাজ-মনোবিজ্ঞানীদের সেবা পাওয়ার নিয়ম থাকা উচিত।

বিচারাধীন ও আটকাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের সম্পর্কে

৭৯. ক. কোন মানুষ যদি কোন অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হয় বা বন্দি থাকে-সেটা পুলিশের হেফাজতে হোক কিংবা জেলে হোক-তার যদি বিচার না হয়ে থাকে এবং দণ্ড না পেয়ে থাকেন তিনি-তা হলে বর্তমান নীতিমালার আলোকে তার মর্যাদা হবে ' বিচারাধীন বন্দি।'

খ. এখনও কোন শাস্তি হয়নি, এমন বন্দিদের অবশ্যই নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

৮০. ক. দন্ডপ্রাপ্ত এবং বিচারধীন বন্দিদের অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে।

খ. আবার বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে কমবয়সীদের প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা করে নীতিগতভাবেই আলাদা প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে।

৮১. বিচারাধীন বন্দি ঘুমাবে একা। আলাদা আলাদা স্থানীয় প্রথা এবং আবহাওয়া অনুযায়ী এ ব্যবস্থা হবে।

৮২. কারা প্রতিষ্ঠানের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সীমার মধ্যে বিচারাধীন বন্দিরা চাইলে তাদের খাবার নিজ খরচে বাইরে থেকে অনিয়ে নিতে পারবেন। এটা কারা কর্তৃপক্ষ কিংবা তার পরিবার বা বন্ধু যে কারো মাধ্যমে হতে পারে। এরকম ব্যবস্থা না হলে কর্তৃপক্ষই তাকে খাবার সরবরাহ করবে।

৮৩. ক. পরিষ্কার এবং উপযুক্ত নিজস্ব পোশাক থাকলে বিচারাধীন বন্দি তা পরিধানের অনুমতি পেতে পারে।

খ. যদি বিচারাধীন বন্দি জেলের পোশাকই পরে তবে সেটা হতে হবে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের চেয়ে পৃথক ধরনের।

৮৪. একজন বিচারাধীন বন্দির কারাগারে কাজের সুযোগ থাকবে। তবে শ্রম দিতে সে বাধ্য নয়। যদি সে নিজস্ব আগ্রহে সেটা দেয় তবে তার জন্য সম্মানী দিতে হবে তাকে।

৮৫. বিচারাধীন বন্দির নিজ খরচে বা তার জন্য তৃতীয় কারো খরচের মাধ্যমে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, লেখনি সরঞ্জাম ও বই সংগ্রহ করার অনুমতি থাকা উচিত। তবে এটা বিচার এবং কারা কর্তৃপক্ষের নীতির সঙ্গে সঙ্গত হতে হবে। নিরাপত্তার বিবেচনায়ও তাকে নিরাপদ হতে হবে।

৮৬. বিচারাধীন বন্দি চাইলে নিজস্ব ডাক্তার এসে তার চিকিৎসা করে যেতে পারে। তবে এর জন্য তাকে যুক্তিপূর্ণ দরখাস্ত করতে হবে এবং ঐ চিকিৎসকের খরচ মেটানোর সামর্থ্য থাকতে হবে।

৮৭. ডিটেনশন সম্পর্কে বিচারাধীন বন্দি যাতে নিকটাত্মীয়দের অবহিত করতে পারে সে জন্য তাকে উপযুক্ত যোগাযোগ সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদিত হতে হবে। নিকটাত্মীয়রা বন্দিকে দেখতে এলে সাক্ষাতের সুযোগ থাকতে হবে। তবে বিচার কর্তৃপক্ষের স্বার্থে কিংবা কারা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে-অপরিহার্য এই অধিকার সীমিত করা যেতে পারে।

৮৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনে একজন বিচারাধীন বন্দি চাইলে তাকে বিনা অর্থে আইন সহায়তার জন্য স্বীকৃত সংস্থাগুলোর কাছে দরখাস্ত করার সুযোগ দিতে হবে। সাক্ষাতের অনুমতিও দিতে হবে তার আইনজীবীকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনে আইজীবীর কাছ থেকে গোপন নির্দেশ পাওয়ার

অধিকার থাকবে বন্দির। বন্দি ও তার আইনজীবীর সাক্ষাৎকার কারা কর্মীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে হবে- কিন্তু শ্রবণ সীমার মধ্যে হওয়ার চেষ্টা করানো যাবে না।

দেওয়ানী আইনের বন্দি সম্পর্কে

৮৯. যে কোন দেশের আইন সাপেক্ষে বলা হচ্ছে যে, ঋণের কারণে বা দেওয়ানী আইনে যারা কারাগারে আসবেন তাদের বেশি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা হবে না। নিরাপত্তা হেফাজত এবং ভালো পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে যতটুকু না করলেই নয়-কেবল সেটুকু করা উচিত। এ ধরনের বন্দিদের প্রতি আচরণ হবে বিচরাধীন বন্দিদের মতো। তবে এধরনের বন্দিদের শ্রম দিতে হতে পারে।

বিনা অভিযোগে বন্দি বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে

৯০. প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বিচারাধীন বন্দিদের জন্য যে সমস্ত রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে-তা বিনা অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আটকাবস্থায় থাকা বন্দিদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে। হেফাজতকালে এরা কোন উপকার পেতে দরখাস্ত করলে সে সম্পর্কে করণীয় হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের সম্পর্কে বর্ণিত প্রাসঙ্গিক নীতিমালার আলোকে।

পরিশিষ্ট-গ
(Appendix-C)
সুপারিশমালা
(Recommendation)

বাংলাদেশের কারাপ্রশাসন সম্পর্কে মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা বর্জন করে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার বিবেচনায় সংস্কারধর্মী ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সুপারিশ করা হলো।

অধ্যায়-১

১। বাংলাদেশের কারাব্যবস্থাকে শাস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা উচিত।

অধ্যায়-২

২। যুগোপযোগী কারাবিধি প্রণয়ন করতঃ পুরাতন বিধির সংশোধন করা অপরিহার্য।

৩। বাংলাদেশের অপরাধ সমস্যা, অপরাধীদের সংশোধন, অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ ও বন্দি দর্শন এবং সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। এ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্য মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে Penology বা দণ্ড বিজ্ঞানকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নলিখিত কোর্সে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ক. দণ্ডবিজ্ঞানের ইতিহাস *(*History of Penology*)* এই শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের Penal Law and Penal Policy সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য ইতিবৃত্ত আলোচনা করবে।

খ. একাডেমিক দণ্ডবিজ্ঞান *(*Academic Penology) এই শাখা Penological জ্ঞান আহরণ করবে এবং শিক্ষাদান ও গবেষণা করবে।

গ. প্রশাসনিক দণ্ডবিজ্ঞান *(*Administrative Penology*)* এই শাখা সরকারের Penal Policy ও প্রাতিষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করবে। এই শাখাকে Applied penology বা ফলিত দণ্ডবিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

ঘ. বিজ্ঞান ভিত্তিক দণ্ডবিজ্ঞান *(*Scientific Penology*)* এই শাখা অপরাধ ও বন্দি দর্শন (Crime and Prison Philosophy) এবং সমস্যা নিরসনে জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করবে। অপরাধীদের সংশোধনের অন্তরায়সমূহ খুঁজে বের করবে এবং তা নিরসনের বিজ্ঞান ভিত্তিক মতামত প্রদান করবে। এই শাখাকে Criminal Penology বলা যেতে পারে।

ঙ. গবেষণামূলক দণ্ডবিজ্ঞান (Analytic Penology) এই শাখা বর্তমান Penal Policy ও সংশোধন পদ্ধতির উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করবে। জটিল সমস্যা সমাধান ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে মতামত প্রদান করবে।

৪। কারাসংস্কার ও সমস্যা দরীভূত করার দাবী এখন সর্বসাধারণের। কাজেই কারাসমস্যা ও সংস্কারের জন্য স্থানীয় প্রিজন এ্যাডভাইজারী বোর্ডের রিপোর্টের উপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কারা প্রশাসনকে গতিশীল করার নিমিত্তে জাতীয় প্রিজন কাউন্সিল {National Prison Council (N.P.C)} গঠন করা যেতে পারে। N.P.C. কারাসংস্কার, উন্নয়ন ও Penal Policy ইত্যাদি সম্পর্কে সরাসরি সরকার প্রধানকে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করবে। কারাঅধিদপ্তরসহ কারা প্রশাসনের সকল কাজ কর্মের জন্য N.P.C-এর নিকট জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়া কারাবিভাগের সকল নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়টি N.P.C নিয়ন্ত্রণ করবে এবং N.P.C-এর সুপারিশের ভিত্তিতে কারাবিভাগে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে স্থায়ীভাবে জাতীয় প্রিজন কাউন্সিল (N.P.C) গঠন করা যেতে পারে।

১। সুপ্রিম কোর্টের ১ জন বিচারপতি	সভাপতি
২। অবসর প্রাপ্ত ১জন সচিব	সদস্য
৩। এটর্নি জেনারেল	সদস্য
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫। সরকার দলীয় ২ জন সংসদ সদস্য	সদস্য
৬। প্রধান বিরোধী দলীয় ২জন সংসদ সদস্য	সদস্য
৭। চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ -এর সভাপতি	সদস্য
৮। যুগ্ম সচিব (কারা)	সদস্য
৯। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র ২জন এ্যাডভোকেট	সদস্য
১০। অধ্যাপক, আইন বিভাগ, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১। অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২। অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩। যে কোন ২টি মানবাধিকার সংস্থার নির্বাহী প্রধান	সদস্য
১৪। যে কোন মহিলা ফোরামের নির্বাহী প্রধান	সদস্য
১৫। কারা মহাপরিদর্শক, কারাঅধিদপ্তর	সদস্য সচিব।

অধ্যায়-৩.১

৫। ১৯৫৫ সালের ৩০শে আগস্ট জাতিসংঘের ১ম কংগ্রেসে অনুমোদিত "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners."-এর নীতিমালার ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশেও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে কারাগারে বন্দি আগমনের পর নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বন্দিদের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস করা যেতে পারেঃ-

- বয়স (Age)
- লিঙ্গ (Sex)
- অপরাধের প্রকৃতি (Nature of Crime)
- অপরাধীর পূর্ব তথ্য (Criminal Record)
- স্বাস্থ্য (Health)
- নিরাপত্তার ঝুঁকি (Security Risk)
- ব্যক্তিগত চাহিদা (Personal needs)

প্রতিটি কারাগারেই একজন করে অপরাধ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী, ডাক্তার ও ১ম শ্রেণীর কারাকর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে উপরিউক্ত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্বক আন্তরিকতার সাথে আগত বন্দিদের আধুনিক পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের পৃথক পৃথক কারাগারে রাখা যেতে পারে। তবে প্রথম পর্যায়ে শ্রেণী অনুযায়ী স্বল্প সময়ে কারাগার নির্মাণ করা সম্ভব না হলে পৃথকীকরণ (Segregation) পদ্ধতিতে কঠোর নিরাপত্তার সাথে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে শ্রেণী অনুযায়ী বন্দিদের রাখা যেতে পারে। নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যেতে পারে।

সাজা প্রাপ্ত বন্দি (Convicted Prisoners) ঃ-

ক) কিশোর শ্রেণী ঃ যাদের বয়স ১৬ বছর বা তার নীচে।
খ) যুবক শ্রেণী ঃ যাদের বয়স ১৬ বছর বা তার ওপরে কিন্তু ২১ বছরের বেশি নয়।
গ) শুভ শ্রেণী ঃ প্রথম অপরাধী এবং তার অপরাধ খারাপ সঙ্গ ও বদ-অভ্যাসজনিত নয়।
ঘ) সাধারণ শ্রেণী ঃ অপরাধ প্রবণ এবং অন্যান্য সকল ধরনের সাজা প্রাপ্ত বন্দি।
ঙ) বিশেষ শ্রেণী ঃ মাদকাসক্ত ও শারীরিক ও মানসিক বিকারগস্ত (Medically Handicapped) বন্দি।

সাজাহীন বন্দি (Unconvicted Prisoners) ঃ-

ক) কিশোর শ্রেণী ঃ যাদের বয়স ১৬ বছর বা তার নীচে।
খ) যুবক শ্রেণী ঃ যাদের বয়স ১৬ বছর বা তার ওপরে কিন্তু ২১ বছরের বেশি নয়।
গ) বিশেষ শ্রেণী ঃ ভবঘুরে, ট্রাফিক আইনে অভিযুক্ত, মাদকাসক্ত ও ১ম অভিযোগে অভিযুক্ত কিন্তু তার আচরণ ভাল এবং অভিযোগহীন নিরাপদ হেফাজতী।
ঘ) সাধারণ শ্রেণী ঃ অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি ও অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি।
ঙ) স্টার শ্রেণী ঃ সকল রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দি।

বন্দিদের জন্য উপরিউক্ত আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে এর উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, কার্যকারিতা এবং প্রয়োগের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য সফল হবে না। কাজেই এ আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের সাথে সাথে এবং প্রয়োগের পূর্বে কারাকর্মকর্তা ও কারাকর্মচারীদের উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা আধুনিক পদ্ধতি বন্দিদের প্রতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

অধ্যায়-৩.২

৬। আধুনিক কারাগারের চিন্তা মাথায় নিয়ে বাংলাদেশে নিম্নলিখিত শ্রেণীর কারাগার পদ্ধতির প্রচলন করা যেতে পারে।

১। অধিক নিরাপত্তার কারাগার (Maximum Security Prison)
২। মধ্যম নিরাপত্তার কারাগার (Medium Security Prison)
৩। মুক্ত কারাগার (Open Prison / Minimum Security Prison)

প্রথম পর্যায়ে অধিক নিরাপত্তা কারাগার নির্মাণ করা সম্ভব না হলে দেশের কেন্দ্রীয় কারাগারগুলোকে এর আওতায় নিয়ে সাময়িক কাজ চালানো যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে মধ্যম নিরাপত্তার কারাগার নির্মাণ করা সম্ভব না হলে দেশের জেলা সদরে অবস্থিত কারাগারগুলোকে এর আওতায় নিয়ে সাময়িক কাজ চালানো যেতে পারে।

শহর থেকে দূরে মুক্ত কারাগার নির্মাণ করা যেতে পারে। এতে নির্মাণব্যয় অনেক কম। মুক্ত কারাগার পদ্ধতির প্রচলন হলে কারাগারে বন্দি চাপ কমবে এবং মুক্তি প্রাপ্তরা সহজে সমাজে খাপ-খাওয়াতে পারবে এবং তাদের পুনর্বাসিত হওয়ার পথ সহজ হবে।

৭। প্রতিটি কারাগারেই কয়েদী অপেক্ষা হাজতীর সংখ্যা অনেক বেশি। বিচার কাজের ধীরগতির ফলে বিচার পূর্ব আটকাবস্থা বাংলাদেশের একটি বিরাট সমস্যা। বিচার পূর্ব আটকাবস্থা দীর্ঘায়িত না করে বিচারাধীন বন্দিদের জন্য রিমান্ড হোম প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিচারাধীন বন্দিদের শ্রেণী অনুযায়ী নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনা করে কম ঝুঁকিপূর্ণদের রিমান্ড হোমে রাখা যেতে পারে। এছাড়াও রাজবন্দি, মানসিক রোগী, শারীরিকভাবে অসুস্থ বন্দি (যেমন-যক্ষা, ক্যান্সার, এইডস, কুষ্ঠ ইত্যাদি), মহিলা বন্দি, কিশোর ও যুবক বন্দিদের জন্য আলাদা আলাদা কারাগার নির্মাণ করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৩.৩

৮। অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটা নিরোধ ও কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে অস্ত্রাগার জেল গেটের বাইরে স্থানান্তর করা একান্ত প্রয়োজন।

৯। দেশের মানুষের নিকট গতিশীল ও সুষ্ঠু প্রশাসন উপহার দেয়ার লক্ষ্যে দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনার জন্য কঠোর শাস্তি বিধান এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণ কর্মচারীর জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার।

১০। কর্মকর্তাদের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানোর জন্য বন্দিদের খাবার পাঁচার এবং পরিচর্যার জন্য কারারক্ষী ও বন্দি শ্রম ব্যক্তিগত কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ জারী করা ও নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১ । কারাগারের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, সমস্যা ও বন্দিদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিয়মিতভাবে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রতিনিয়ত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের সাংবাদিকদের কারাগার পরিদর্শন করতে দেয়া উচিত।

১২ । কারাপ্রশাসনকে গতিশীল ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপদানের জন্য সর্বনিম্ন ডেপুটি জেলার এবং তদূর্ধ্ব পদগুলো বি, সি, এস ক্যাডারভুক্ত করে মেধাবী লোক নিয়োগ করা যেতে পারে। কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির কথা বিবেচনা না করে সার্বিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মেধানুযায়ী কারাকর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে। নিম্ন শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। গার্ডিং স্টাফের যে কোন পদে ৮ম শ্রেণী বা এস, এস, সি পাস করা লোক নিয়োগ করায় বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

১৩ । শৃংখলা ও সমতা রক্ষার স্বার্থে সকলের একই ধরনের পোশাক পরিধান করা উচিত।

১৪ । অধস্তন কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া আদায় ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পন্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর জন্য তাদের 'সংগঠন' করার অধিকার দেয়া যেতে পারে।

১৫ । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় আমাদের দেশের কারা বিভাগকে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা যেতে পারে। এছাড়াও যুগের চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে কারাগারের আধুনিক বিকল্প হিসেবে প্রবেশন, শর্তাধীনে মুক্তি ও প্যারোল পদ্ধতি প্রবর্তন, বাস্তবায়ন এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জাতীয় প্রবেশন ও প্যারোল বোর্ড গঠন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

অধ্যায়-৩.৪

১৬। বাংলাদেশের কারাপ্রশাসনকে আধুনিকায়ন ও কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় কারাবিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রম (Syllabus) অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তাদের দু'বছর এবং কর্মচারীদের (গার্ডিং স্টাফ) এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষাক্রম বিষয়

১. আধুনিক কারাব্যবস্থা (Modern Prison Systems)
২. নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা (Leadership of Management Officer)
৩. অপরাধ বিজ্ঞান (Criminology)
৪. সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)
৫. আধুনিক দণ্ড বিজ্ঞান (Modern Penology)
৬. মনোবিজ্ঞান (Psychology)
৭. নৈতিক দর্শন (Phylosophy in ethic)
৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Finance)
৯. মানবাধিকার (Human rights)
১০. আইনগত ও সামাজিক অধিকার (Legal and Social Rights)
১১. বন্দিদের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি (Modern Classification System of Prisoners)
১২. অপরাধীদের আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি (Modern Correctional Method of Offenders)
১৩. বাস্তব ভিত্তিক হাতে কলমে শিক্ষা (Various Practical Questions)
১৪. চাকরীবিধি, কারাবিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন (Service rules, Jail code and other rules)
১৫. ড্রিল ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ (Drill and Fire-arms training)
১৬. নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা (Security tasks including self-defence)
১৭. বন্দিদের কেস হিস্ট্রি প্রণয়ন (Case History of Prisoners)
১৮. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (Administrative management)

অধ্যায়-৪.১

১৭ । একটি শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার জন্য যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন; তা বিবেচনায় রেখে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কারাগারে আটক শিশুদের আলাদা ডায়েট স্কেল প্রণয়ন করাসহ স্তন্যদানকারী মায়ের শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্যও নিয়মিত খাবারের অতিরিক্ত হিসেবে প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম তরল দুধ ও ১টি করে ডিম দেয়া যেতে পারে।

১৮ । একান্তই মানবিক কারণে বাংলাদেশের কারাগারে আটক ভারতীয় ছাড়া বিদেশী বন্দিদের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী আলাদা "ডায়েট স্কেল" প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১৯ । বন্দিদের খাবারের মান, স্বাদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পাচক বন্দিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রতি কারাগারে একজন করে বেতনভুক্ত পাচক নিয়োগ করা যেতে পারে। অনেক কারাগারেই অধিক সংখ্যক বন্দির একত্রে একটি চৌকায় খাদ্য প্রস্তুত করতে রান্নার কাজে অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় এবং বন্দি ও কর্মচারীরা দুর্নীতি করার সুযোগ পায়। এ সমস্যা সমাধান কল্পে প্রতিটি কারাগারে ৩০০ জন বন্দির রান্নার জন্য একটি করে চৌকা নির্মাণ করা যেতে পারে।

২০ । বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিতের সময় দূরত্ব অনুসারে প্রচলিত বাজারের দ্রব্য মল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে খাওয়া খরচ বরাদ্দ করা যেতে পারে। কারাগারে সাধারণতঃ বিকাল বা সন্ধ্যায় নতুন বন্দির আগমন ঘটে। এ সমস্ত নবাগত বন্দিদের সে রাতে খাবার দেয়ার কোন নিয়ম না থাকায় তারা অনাহারেই রাত কাটায়। কাজেই মানবিক কারণে নবাগত বন্দিদের জন্য চিঁড়া ও গুড় সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও বিচারাধীন বন্দিদের কোর্টে অবস্থানকালে শুকনা জাতীয় খাবার কোর্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২১ । আমাদের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে; এ চিন্তা মাথায় রেখে গো মাংস আলাদা পাত্রে রান্না ও বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারাগারে আটক মুসলিম সম্প্রসায়ের বন্দিদের যে ভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়; ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব পালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২২ । আমাদের দেশের কারাগারে বন্দিদের খাবারের জায়গার সমস্যা সমাধান কল্পে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত প্রশস্ত জায়গায় প্রতি ৩০০ জন বন্দির জন্য ১টি করে আধুনিক ডাইনিং হল নির্মাণ করা যেতে পারে।

২৩ । ভিটামিন এ এবং বি$_২$ এর ঘাটতি পূরণের জন্য পাতাজাত ও পাতাহীন টাটকা তরিতরকারী ক্যালোরির মান বিবেচনায় রেখে নিয়মিত সরবরাহ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও ভিটামিন-সি এর অভাব পূরণের জন্য মৌসুমী বা সিজিনাল ফলমূল কমপক্ষে সপ্তাহে ২ দিন বন্দিদের মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে।

২৪ । লবণের অপব্যবহার রোধকল্পে সাধারণ দিনে মাথাপিছু ২৯.১৬ গ্রামের স্থলে ২৫.০০ গ্রাম এবং মাছ-মাংসের দিনে ৩৬.৪৫ গ্রামের স্থলে ৩২.০০ গ্রাম লবণ বরাদ্দ করা যেতে পারে। এর ফলে লবণ চুরি বন্ধ হবে এবং সরকারও আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

২৫ । বন্দিদের সুস্বাদু ডাল পরিবেশনের জন্য প্রতি ৫০০ জনে এক কেজি কাঁচা মরিচ বরাদ্দ করা যেতে পারে। এতে অতি সামান্য পরিমাণ হলেও ভিটামিন-সি এর অভাব পূরণ হবে এবং বন্দিরাও তৃপ্তিসহকারে খেতে পারবে।

২৬ । মানবিক দিক বিবেচনা করে $\frac{১}{৪}$ ছটাক তেল সকল বন্দির জন্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

২৭ । কারাগারের টেন্ডারে দুর্নীতি রোধকল্পে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে টেন্ডার কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটিকে টেন্ডার চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। কারণ টেন্ডার সম্পর্কে কোন দুর্নীতির কথা উঠলে ঐ কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত টেন্ডার কমিটি -

১। বিচার বিভাগীয় ১ জন কর্মকর্তা	সভাপতি
২। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ১ জন (১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা)	সদস্য
৩। সিভিল সার্জন বা তাঁর প্রতিনিধি ১ জন (১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা)	সদস্য
৪। সংশ্লিষ্ট জেলের সুপার	সদস্য
৫। বার এসোসিয়েশনের ১জন সিনিয়র এ্যাডভোকেট	সদস্য
৬। মার্কেটিং অফিসার	সদস্য
৭। সংশ্লিষ্ট জেলের জেলার	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্র অনুমোদন করবেন। ঐ কমিটিকে খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য দরপত্র অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

২৮। বন্দিদের খাদ্যে ও সরবরাহে দুর্নীতি রোধ কল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে -

- ∆ বন্দিদের অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- ∆ খাদ্যদ্রব্য, রেশন ও সরবরাহকৃত মালামালের ওজন, মাপ ও মান সঠিকভাবে বুঝে নেয়ার জন্য প্রতিদিন প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে প্রতিনিধির ১:১ (হাজতী : কয়েদী) দ্বারা কমিটি গঠন।
- ∆ একই ব্যক্তি মাসে ১ দিনের বেশি কমিটির সদস্য হতে পারবে না।
- ∆ কমিটির সদস্য সংখ্যাঃ-
  কেন্দ্রীয় কারাগারে কমপক্ষে ১৫ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন; জেলা কারাগারে কমপক্ষে ১০ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন।
- ∆ কমিটির সদস্যদের ওজন ও মাপ সঠিকভাবে বুঝে নেয়ার অধিকার দিতে হবে এবং খাবার ও রান্নার মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক বন্টনের জন্য নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।
- ∆ কর্তৃপক্ষ রেশন সামগ্রী ও সরবরাহকৃত মালামাল ডায়েট স্কেল অনুযায়ী কমিটির সদস্যদের বুঝিয়ে দেবে।
- ∆ কমিটির সদস্যদের কোন আপত্তি থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে সরাসরি জানানোর অধিকার থাকবে এবং অভিযোগটি কর্তৃপক্ষ আমলে না নিলে কমিটি তা একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে সই স্বাক্ষর করে লিখে রাখবে।
- ∆ এই কমিটির অভাব-অভিযোগ শোনা ও পর্যালোচনা শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য একটি স্থানীয় প্রিজন এ্যাডভাইজারী বোর্ড থাকবে।

২৯। নিম্নলিখিতভাবে স্থানীয় প্রিজন এ্যাডভাইজারী বোর্ড গঠন করা যেতে পারে -

১। জেলা জজ	সভাপতি
২। সিভিল সার্জন	সদস্য
৩। ১ম শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা ১ জন	সদস্য
৪। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ১ জন	সদস্য
৫। জেল সুপার	সদস্য
৬। জেল ডাক্তার	সদস্য
৭। সিনিয়র এ্যাডভোকেট ২ জন	সদস্য
৮। অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় / সরকারী কলেজ ১ জন	সদস্য
৯। ২টি দৈনিক জাতীয় পত্রিকার রিপোর্টার ২ জন	সদস্য
১০। মহিলা সংস্থা/নারী কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১১। মানবাধিকার সংস্থার স্থানীয় প্রধান ১ জন	সদস্য
১২। যেকোন এনজিও-এর স্থানীয় প্রধান ১ জন	সদস্য
১৩। জেলার	সদস্য সচিব।

উপরিউক্ত স্থানীয় প্রিজন এ্যাডভাইজারী বোর্ড মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। এ কমিটি সভায় আলোচনায় বসার পূর্বে কারাকর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে কারাগার পরিদর্শন করবেন এবং উন্মুক্তভাবে বন্দিদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনবেন। পরিশেষে কমিটির সকল সদস্য একত্রিত হয়ে বাস্তবতার নিরিখে আলাপ-আলোচনা করে অভিযোগ,অনিয়ম, দুর্নীতি, অত্যাচার, জুলুম ইত্যাদি সম্পর্কে জাতীয় প্রিজন কাউন্সিলে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন।

৩০ । কারা প্রশাসনের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন খাদ্য দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাসমহ ক্যান্টিনে রেখে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা চালু হলে বন্দিরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্যান্টিন থেকে ক্রয় করতে পারবে। এর ফলে বন্দিদের মানসিক দুশ্চিন্তার চাপ কমবে এবং তাদের ন্যূনতম চাহিদার সম্পূর্ণটা না হলেও কিছু অংশ পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায়-৪.২

৩১ । মানবিক কারণে প্রতি ওয়ার্ড বা সেলে প্রয়োজন অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩২ । মানবিক মল্যবোধ ও বন্দিদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনায় রেখে সাধারণ বন্দিদের এবং তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ঃ-

সর্বসাধারণ বন্দির জন্য

ক. মশারী (জন প্রতি)	----১টি।	
খ. বালিশ (কভারসহ)	----১টি।	
গ. বেড-সীট (এক বছরের জন্য)	----১টি।	

৩য় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য

ক. লুঙ্গি (এক বছরের জন্য)	----২টি।	পুরুষ বন্দিদের জন্য
খ. সেন্ডো গেঞ্জি (৬ মাসের জন্য)	----২টি।	
গ. চিরুনী	----১টি।	মহিলা বন্দিদের জন্য
ঘ. ছোট আয়না	----১টি।	

একান্তই মানবিক কারণে কারাগারে আটক সাজাহীন বন্দি এবং বিনাশ্রম কয়েদী; যাদের কাপড়ের ভীষণ কষ্ট, তাদের সরকারী খরচে পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৪.৩

৩৩ । বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় আমাদের দেশে প্যারোল ও প্রবেশনসহ অন্যান্য বিকল্প প্রথার প্রবর্তন করে অপরাধীদের সংশোধনের সুযোগদানসহ কারাগারের আবাসিক সমস্যা নিরসন করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৪.৪

৩৪ । বাংলাদেশের কারাগারে আটক বন্দিদের স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্পন্ন ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. সিভিল সার্জন কর্তৃক নিয়মিত কারাহাসপাতাল পরিদর্শন এবং ভুয়া রুগী যাতে ভর্তি না থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।
২. ডাক্তারের শূন্য পদসমূহ জরুরীভাবে পূরণ করা।
৩. কারাহাসপাতালের বর্তমান বেড সংখ্যার উপর ২০% বেড বাড়াতে হবে।
৪. ওষুধের মান ও পরিমাণের সঠিকতা নিরুপণের জন্য টেন্ডার কমিটির (এ অধ্যায়ের ২৭ নং প্রস্তাব) উপস্থিতিতে ওষুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।
৫. প্যাথলজি, এক্সরে ও ডেন্টাল টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
৬. মহিলা বন্দিদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োগ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নির্মাণ করা।

৭. মুমূর্ষু রুগীদের দ্রুত বাইরের হাসপাতালে নেয়ার জন্য নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা।
৮. কারা হাসপাতালকে রোগী বান্ধব হাসপাতাল মডেলে পরিচালনা করা।
৯. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডাক্তারের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা।

আধুনিক ধ্যান-ধারণায় মানবিক দিক বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে ডাক্তার-বন্দি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা।

অধ্যায়-৪.৫

৩৫। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় নিম্নবর্ণিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলে বাংলাদেশের কারাব্যবস্থায় অপরাধীদের সংশোধন এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অন্তরায়সমূহ দূর হতে পারে বলে আশা করা যায়।

১. বাধ্যতামূলক একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা ।
২. আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান ।
৩. নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক শিক্ষা প্রদান ।
৪. সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দ্বায়িত্ব বোধের উপর শিক্ষা দান ।
৫. স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ও শরীরচর্চা বিষয়ক শিক্ষা ।
৬. যুবক অপরাধীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা ।
৭. প্রতিটি পাঠ্যক্রমে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখা এবং কৃতিত্ব অর্জনের জন্য পুরস্কার দেয়া ।
৮. দীর্ঘমেয়াদী সাজা প্রাপ্তদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সাফল্যের সাথে পাসের শর্তে ডিগ্রী লাভের পর মুক্তি দেয়া।
৯. উপযুক্ত লাইব্রেরী সার্ভিসের প্রচলন ।

অধ্যায়-৫.১

৩৬। চলমান বিশ্বের আধুনিকতা ও প্রতিযোগিতার যুগে কারাশিল্প এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দর ও গুণগত মানের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে কারাপণ্য বিক্রিতে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। মূলতঃ এ কারণে আমাদের দেশের কারাশিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কারাশিল্পকে বেগবান ও গতিশীল এবং লাভজনক করতে হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় যুগোপযোগী পরিকল্পনাসহ আধুনিকায়ন করতে হবে। এছাড়াও সরকারী বিভাগ (Government Departments) সমূহে কারা পণ্য (যেমন-অফিস ফার্নিচার, পাপোশ, পর্দা, তোয়ালে, ডাস্টার, কার্পেট ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক কেনার জন্য আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। সরকারী বিভাগের বৃহৎ চাহিদা পূরণ করতে পারলে কারাপণ্যের বিক্রির মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যাবে।

৩৭। বন্দিদের কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা চালু করলে বন্দি ও তার পরিবার উপকৃত হবে এবং মুক্তির পর তাকে পুনর্বাসন করা অনেকটা সহজতর হবে।

৩৮। কারাশিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতে হবে। কারাগারে গার্মেন্টস্, অফিস ফার্নিচার, প্লাষ্টিক শিল্প, চর্মশিল্প, রেডিও-টিভি মেরামত, অটোমোবাইল, দর্জি, খেলনা পুতুল তৈরী, এ্যামব্রয়েডারী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্রিন্টিং প্রেস, টেক্সটাইল ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। বন্দিদের মুক্তির পর যে সব দক্ষতার অনুকূলে কাজ পাওয়া সহজ হয় বা যে সব কাজে দক্ষ লোকের চাহিদা প্রবল সে সবের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া দরকার। বন্দিদের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য লভ্যাংশের একটি অংশ বোনাস হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। স্বেচ্ছায় বিচারাধীন বন্দিরা কাজ করতে চাইলে পারিতোষিকের বিনিময়ে তাদেরও কাজ করতে দেয়া উচিত। কারাবন্দিদের অর্জিত দক্ষতার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সনদপত্র দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায়-৫.২

৩৯। মুক্তি প্রাপ্তদের দেখাশোনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে After-Care Association প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪০। বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্তদের (Ex-Prisoner) পুনর্বাসনের জন্য মানবতাবাদি, মেধাবী ও দক্ষ অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে নিম্নলিখিত Pre-release programs গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. শর্তাধীনে তদারকির মাধ্যমে মুক্তি (Conditional supervision Release)
খ. ডে-প্যারোল (Day Parole).
গ. ফুল প্যারোল (Full Parole).
ঘ. প্রবেশন (Probation).

মুক্তিপ্রাপ্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে After-Care Service হিসেবে উপরিউক্ত কার্যক্রম গ্রহণের পর্বে যেসব বিষয় বিবেচনা করা একান্ত দরকার তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. অপরাধীর বয়স।
খ. অপরাধীর পূর্ব রেকর্ড।
গ. মানসিক অবস্থা।
ঘ. সংশোধনের উপযুক্ততা (Correctional measure)
ঙ. আবাসিক ব্যবস্থা (Shelter.)
চ. আর্থিক সহযোগিতা।
ছ. দক্ষ স্টাফ।
জ. বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক।
ঝ. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা।

অধ্যায়-৬

৪১। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে পৃথক কারাগার বনাম সংশোধনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. তরুণদের জন্য কারাগারের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করা।
৩. শিশু ও কিশোর অপরাধ নিরোধ কল্পে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
৪. তরুণ বন্দিদের সকল মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা।
৫. মায়েদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠার নিমিত্তে সকলকে ''শিশু অধিকার'' দিতে হবে।
৬. তরুণদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সময় বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। কারণ কেউ যেন বিনা দোষে শাস্তি ভোগ না করে।
৭. যুগোপযোগী উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করে তরুণদের দক্ষ করে তুলতে হবে।
৮. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং শরীর চর্চার ব্যবস্থা রাখা।
৯. ভোকেশনাল ট্রেনিং ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা।
১০. বাধ্যতামূলক একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
১১. তরুণদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা।
১২. তরুণদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য জ্ঞান কৌশল বিবেচনা করে তাদের উপর আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
১৩. সাজা প্রাপ্ত হওয়ার ১ম দুই মাস তাকে Observation- এ রেখে তার উপর পরীক্ষা/পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে। এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালাতে হবে।
১৪. মুক্তি প্রাপ্ত তরুণদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে।
১৫. এ সব কাজে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

অধ্যায়-৭.১

৪২। আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে কড়াকড়ি না করে উদারতা দেখালে তার পরিবার-পরিজনের সাথে বন্দির ঘনিষ্ঠতার ব্যাঘাত ঘটে না। ফলে বন্দির চরিত্র সংশোধনের পথও প্রশস্ত হতে পারে। দেখা-সাক্ষাতে দুর্নীতি রোধ ও অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় এবং আধুনিক সংশোধন পদ্ধতির আলোকে নিম্ন লিখিত পদ্ধতি/নিয়মে বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১. সব বন্দিকে সমভাবে সপ্তাহে ছয় দিন সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া।
২. দেখার ঘর (Interview Room) বড় ও প্রশস্ত করে নির্মাণ করা এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসসহ দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা রাখা।
৩. আপত্তিকর ছাড়া সব ধরনের জিনিস-পত্র সহজে দেয়ার ব্যবস্থা করা।
৪. দেখার ঘরে প্রতিধ্বনি মুক্ত ও নিরিবিলি পরিবেশের সৃষ্টি করা।
৫. বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অবৈধ টাকা আদায়ের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা (ডি, জি, এফ, আই এবং এন, এস, আই) সমূহের নজরদারির ব্যবস্থা রাখা। এছাড়াও স্থানীয় বিচার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
৬. দেখার ঘরে সাংবাদিকদের অবাধে প্রবেশের সুযোগ দেয়া।
৭. ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে উল্লেখিত সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ত্বরিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অভিযোগের জন্য জেলের স্থানীয় প্রধানকে দায়ী করা।
৮. বন্দিদের সাক্ষাৎকার পর্ব একঘন্টা সময়সীমা বেঁধে দেয়া।
৯. দর্শনার্থী ও বন্দিদের সাথে নমনীয় ও মানবিক আচরণ করা।

অধ্যায়-৭.২

৪৩। মানবিক কারণে অসহায় ও সহায়সম্বলহীন বন্দিদের সরকারী খরচে মামলার সহায়তা দানের বিষয়টি পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে।

৪৪। কারাভ্যন্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বন্দি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের “অধিকার ও প্রাপ্যতা” সম্পর্কে বন্দিদের নিয়মিত জানানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪৫। মানুষের সাথে পশু সুলভ নীতি/আচরণ পরিহারের তাগিদে ডাণ্ডাবেড়ী ও নির্জন কারাবাস পদ্ধতি বাতিল করা যেতে পারে।

৪৬। বন্দিদের আবাস স্থলে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাসহ নির্মল বায়ু চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

৪৭। অপরাধীদের সংশোধন ও সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের মানসিক পরিবর্তন আনায়নের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধ্যান-ধারণায় সামাজিক প্রেরণামূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও বন্দিদের কারাজীবনের দুশ্চিন্তা ও হতাশা লাঘবের জন্য সকল প্রকার খেলাধুলা (Indoor and outdoor games) এবং বিনোদনের জন্য টেলিভিশন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি কারাগারে একটি করে অডিটোরিয়াম নির্মাণ পূর্বক সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন বন্দিদের নিয়ে অপরাধ সমস্যার উপর গঠনমূলক এবং বিভিন্ন সংশোধনমূলক আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়াও বন্দিরা ঐ অডিটরিয়ামে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগ পাবে। কারাগারে বন্দিদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বন্দিদের মন ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই প্রফুল্ল থাকবে। ফলে আধুনিক সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৪৮। বন্দিদের চিঠিপত্র সঠিক সময়ে আন্তরিকতার সাথে দ্রুত বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪৯। বিচারাধীন বন্দি বা হাজতী বন্দিরা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে মানবিক কারণে তাদের হাজতবাসকালীন সময়কাল তার সাজা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মোট সাজা থেকে হাজতবাসকালীন সময় বাদ দেয়ার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৫০। মানবিক দিক বিবেচনা করে, মারাত্মক অপরাধে অপরাধী নয় এমন দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের বছরে দশ দিন ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের যৌনক্ষুধার বিকৃতরূপ "সমকামিতা" প্রাবল্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়াও সমকামিতা বা যৌন-সংক্রান্ত অন্যান্য বদঅভ্যাসের কারণে সৃষ্ট মরণব্যাধি "এইডস" সহ অন্যান্য যৌন রোগকে প্রতিহত করার পথ সুগম হবে।

৫১। প্রতিটি কারাগারে বন্দিদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। ধারণকৃত আযান একযোগে প্রচারের ব্যবস্থাসহ কারাগারসমূহে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। সকল ধর্মাবলম্বিদের মনোযোগ আকর্ষণ ও নিয়মিত পাঠের জন্য তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কপি সরবরাহ করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৮

৫২। কারা বিদ্রোহের মত আশংকাজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনার স্থায়ী সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. যুগোপযোগী কারাবিধি প্রণয়ন করা।
২. কারাগারে ধারণ ক্ষমতার বেশি বন্দি না রাখা।
৩. আবাসিক সমস্যার সমাধান করা।
৪. খাবারের মান ও পরিমাণের সঠিকতা নিশ্চিত করা।
৫. সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন করা।
৬. সঠিক রান্না, বন্টন ও পরিষ্কার-পচ্ছিন্নতা বজায় রাখা।
৭. সর্বক্ষেত্রের দুর্নীতি নিবারণ করা।
৮. বন্দিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের জুলুম, অত্যাচার রহিত করা।
৯. কর্তৃপক্ষ ও বন্দিদের মধ্যে মানবিক আচরণ করা।
১০. বিচার ও তদন্ত দীর্ঘসূত্রিতা রোধ করা।
১১. ডাণ্ডাবেড়ী প্রথা বাতিল করা।
১২. বন্দিদের সাক্ষাতের জন্য নিরিবিলি পরিবেশ প্রদান করা।
১৩. বন্দিদের সাক্ষাতের জন্য টাকা গ্রহণ না করা।
১৪. ডেপুটি জেলার পদকে গেজেটেড ঘোষণা করা।
১৫. কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ প্রথা বাতিল করে বিসিএস ক্যাডার প্রথা প্রবর্তন পূর্বক কর্মকর্তা নিয়োগ করা।
১৬. সশ্রম কয়েদীদের কাজের বিনিময়ে অন্যান্য দেশের মত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১৭. কারারক্ষী পদে ন্যূনতম এইচ.এস.সি পাস মেধাবী লোক নিয়োগ করা।
১৮. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাধ বিজ্ঞান, দণ্ডবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, মানাবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১৯. বিচারাধীন বন্দিদের সাজা হলে হাজতবাসকালীন সময় সাজা হিসেবে গণ্য করা।
২০. বন্দিদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
২১. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
২২. অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস বিবেচনা করে কারা কর্মচারীদের আলাদা বেতন স্কেলসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান।
২৩. বন্দিদের যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২৪. বন্দিদের অভাব অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং তার ব্যবস্থা নেয়া।
২৫. কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিণত করা।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

বাংলা বই

১. আব্দুস শহীদ, কারা স্মৃতি, ১৯৭৭।
২. আশরাফ কায়সার, জেলখানার জীবন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ১৯৯৫।
৩. আবু তাহের, সংগঠন, প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র, ১৯৯৫।
৪. আলতাফ পারভেজ, কারাজীবন, কারাব্যবস্থা, কারাবিদ্রোহ, ২০০০।
৫. এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল, কারাগারের কাহিনী, ১৯৮৯।
৬. কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, ১৯৯৮।
৭. কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোন্‌গার্দ-লোভন, গ্রি. কতোভ্‌স্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬।
৮. কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরী, ১৯৮৪।
৯. কারাকর্মকতা সম্মেলন, পুস্তিকা, ১৯৯৪।
১০. কারাগারে সন্দীপন, পুস্তিকা, ১৯৯৯।
১১. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, বাংলা বিশ্ব কোষ, ২য় খণ্ড।
১২. গাজী সামছুর রহমান, অপরাধবিদ্যা, ১৯৮৯।
১৩. গাজী সামছুর রহমান, ইসলামের দণ্ডবিধি,১৯৯২।
১৪. তেসলিম চৌধুরী, মধ্যযুগের ভারত, সুলতানী আমল, ১৯৯৬
১৫. নাজমুল করিম, সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ, ৩য় সংস্করণ।
১৬. ফিওদর করভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬।
১৭. বোরহান আহমেদ, কারাগারের দিনগুলি, ১৯৯৫।
১৮. বোরহান উদ্দীন খান, অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি, ১৯৯৫।
১৯. বি, এল, দাস, অপরাধবিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, ১৯৯৮।
২০. বারীন্দ কুমার ঘোষ, নির্বাসিতের আত্মকথা।
২১. বি, বি, বিশ্বাস, কারাগারের বিভীষিকাময় দিনগুলি, ১৯৯৪।
২২. বাৎসরিক কারা প্রশাসনিক বিবরণী-১৯৯৬।
২৩. মতিয়া চৌধুরী, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫।
২৪. মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মওলানা মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মদনী।
২৫. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান,ভারতের ইয়ারাভাদা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন।
২৬. মোঃ আনছার আলী খান, শিশু বিষয়ক আইন, ২০০০।
২৭. মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদী, আযাদী আন্দোলন, ১৯৯৪।
২৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ১৯৮৮।
২৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭।
৩০. শামসুজ্জামান খান, উচ্চতর সমাজকল্যাণ, ১৯৭৭।
৩১. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, নিত্য কারাগারে, ১৯৯৭।
৩২. শহীদুল্লা কায়সার, রাজবন্দীর রোজনামচা, ১৯৮৯।
৩৩. সুনীল চট্টোপধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৯৭।
৩৪. সৈয়দ শওকুতজ্জামান, সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ, ২য় খণ্ড, ১৯৯০।
৩৫. হামজা হোসেন, অপরাধবিজ্ঞান, ১৯৯৫।

পত্র পত্রিকা

১। আজকের কাগজ, দৈনিক, তারিখ-০১/০২/১৯৯৯।
২। ইনকিলাব, দৈনিক, তারিখ ২৩/০১/২০০১।
৩। ইত্তেফাক, দৈনিক, তারিখ- ০৯/৪/১৯৯০ ও ১০/৪/৯৩।

৪। কারাঅধিদপ্তরের ২৯/০১/১৯৯৭ তারিখের পিডি/জিএল-১৩/৯৭/১৪৬ (৮২)নং পত্র।
৫। কারাঅধিদপ্তরের ৩/৫/২০০১ তারিখের পিডি/এমডি-৪(২)/২০০১/৮৪৯(৬৪) নং পত্র।
৬। জনতা, দৈনিক, তারিখ- ২৭/২/১৯৯০।
৭। জনকণ্ঠ, দৈনিক, তারিখ নিম্নবর্ণিত ঃ-

১৯/১২/৯০	২৩/১২/৯৬	২৫/০৭/৯৭	২৮/০২/২০০০	
০৯/০১/৯২	২৪/১২/৯৬	২৭/০৭/৯৭	১৮/০৪/২০০১	২৬/১২/৯৩
২৬/১২/৯৬	০৯/০১/৯৮			
২২/০১/৯৬	০৭/০১/৯৭	০২/১১/৯৮		
২০/০৭/৯৬	১৫/০১/৯৭	২২/১১/৯৮		
১৬/১০/৯৬	০১/০৫/৯৭	২৮/১২/৯৮		
২২/১২/৯৬	০১/০৭/৯৭	৩০/১২/৯৮		

৮। প্রথম আলো, দৈনিক, তারিখ নিম্নবর্ণিত ঃ-

০৬/০৪/৯৯	০৪/১০/২০০০	১৬/০১/২০০১
২৭/০২/২০০০	১৭/১০/২০০০	

৯। মানবজমিন, দৈনিক, তারিখ নিম্নবর্ণিতঃ-

৩০/০১/৯৯	২৭/০২/২০০০	১৪/০৯/২০০০	২২/০৪/২০০১
০৪/০৪/৯৯	১১/০৯/২০০০	০১/০৩/২০০১	

১০। যায়যায় দিন, সাপ্তাহিক, তারিখ- ২৬/৫/৯৪ ও ০৭/০১/৯৭।
১১। যুগান্তর, দৈনিক, তারিখ- ৩১/০১/২০০১ ও ০৩/০২/২০০১।
১২। সোনার দেশ, দৈনিক, তারিখ- ১৮/১০/২০০০।

১৩। সংবাদ, দৈনিক, তারিখ নিম্নবর্ণিতঃ-

১১/০৩/৯০	৩১/১২/৯২	২২/১২/৯৬	০২/১০/৯৭
১৪/০৭/৯০	০১/০৪/৯৩	২৩/১২/৯৬	০৪/০২/৯৮
০২/০৪/৯১	০৭/০৬/৯৫	২৮/১২/৯৬	
০৬/০৪/৯১	২২/০৫/৯৬	০৬/০২/৯৭	
১১/১২/৯২	০৩/০৮/৯৬	০৭/০৪/৯৭	

১৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি নাম্বার ও তারিখ নিম্নবর্ণিতঃ-
নং ৩৪৭-এইচ,জি তারিখ ১৫/১০/৬২।
নং ১ ই-৮/৮৭-জেল-১/৩৭৭ তারিখ ১/৯/৯২।
নং ১ সি-৩/৯২-জেল-১/৫২২ তারিখ ২১/১১/৯২।
নং ১ ই-১৬/৮৮-জেল-১/৬৬৮ তারিখ ১৩/১১/৯৩।
নং ১ ই-১/৮৫-জেল-১(অংশ-১)/২১৫ তারিখ ১/৪/৯৫।

English Books

1. Ahmad Siddique, Criminology, 4th Edition, 1994.
2. American Library Association, Library Standards for Adult Correctional Institutions, 1992.
3. Bengal Jail Code, Vol-I
4. Bengal Jail Code, Vol-II
5. Council of Europe, Legal Affairs, Division of Crime Problems, Publications:-

- Committee of Ministers, Resolution (73)5.
- Collected Studies in Criminological Research, Vol-I, 1967.
- Custody and treatment of dangerous Prisoners, 1983.
- Education in Prison, R(89)12, 1990.
- European rules on Community Sanction's and measures, 1994.
- Historical research on crime and criminal Justice, Vol-XXII, 1985.
- K.J. Neal, Work in Penal Institutions, 1976.

- New social strategies and the criminal Justice system,Vol-XXIX, 1994
- Psychosocial interventions in the criminal justice system, Vol-XXXI, 1995.
- Prison management, 1983.
- Prison Leave, 1983.
- Prison Information Bulletin, No-1, June, 1983.
- Prison Information Bulletin, No-8, December, 1986.
- Prison Information Bulletin, No-10, December, 1987.
- Prison Information Bulletin, No-16, June, 1992.
- Report of the European Committee on Crime Problems, 1970.
- Suspended sentence, Probation and other alternatives to Prison sentence, 1966.
- The status, Selection and Training of Governing Grads of Staff of Penal Establishment, Third report of Sub-Committee, No-VI.
- The European Prison rules, 1996.
- The Criminal record and rehabilitation of Convicted persons, 1984.

5. Correctional service of Canada on Correction Research Publications:
    - FORUM, Vol-7, No-2, 1995.
    - FORUM, Vol-8, No-1, 1996.
    - FORUM, Vol-9, No-3, 1997.
    - FORUM, Vol-10, No-1, 1998.
    - FORUM, Vol-10, No-2, 1998.
6. Good Prison Management, A Workshop Report, 2000.
7. Jeffri G. Murphy, Punishment and Rehabilitation, USA.
8. N.J. Demerath III and Gerald Marwell, Sociology, 1975.
9. New Standard Encyclopedia, Vol-II, Chicago, USA.
10. Prof. N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 10th Edition, 1998.
11. Report of the Bangladesh Jails Reforms Commission, Vol-I, 1980
12. Report of the Bangladesh Jails Reforms Commission, Vol-II, 1980.
13. Report of the Administration of Jails, 1961.
14. The New Encyclopedia Britannica, Vol-9, 15th Edition.
15. The Joy of Knowledge, Vol-II, USA.
16. Training Guide, Good Prison Management for Prison Personnel of Bangladesh, 2000.

17. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice Publications:-
    - Guidelines for Developing, Implementing and Revising on Objective Prison Classification System, 1987, NCJ-108408.
    - The Private Sector and Prison Industries, 1985.
    - Work in American Prisons, The Private Sector Gets Involved, May, 1988.

18. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, Publications:-
    - Characteristics of Adults on Probation-1995, NCJ-164267.
    - Federal offenders Under Community Supervision, 1987-96, NCJ-168636.
    - Prior Abuse Reported by Inmates and Probationers, 1999, NCJ-172879.
    - State Prison Expenditure, 1996, NCJ-172211.

19. Walter A. Friedlander and Robert Z. Aple, Introduction to Social Welfares, 5th Edition, 1982.